জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাজার জিজ্ঞাসা

বিশ্ববসু

জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাজার জিজ্ঞাসা

বিশ্ব বসু

যে-সব বিষয়ের জিজ্ঞাসার জবাব আছে :

এই দুনিয়া
আবিষ্কার
মানবদেহ
অন্যান্যপ্রাণী
বাংলা ও বাঙালী
পুরাণ, বেদ, বেদান্ত
গান বাজনা
বিবিধ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট | কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
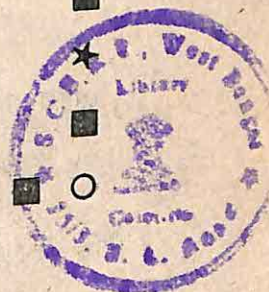
ভূমিকা

তিনশ'র কাছাকাছি জিজ্ঞাসার জবাব রইল এই গ্রন্থে—এমন সব জিজ্ঞাসা যা ধীমান ছেলেমেয়েরা হামেশা জিজ্ঞেস করে। সব রকমের কৌতূহলের যাতে মীমাংসা ঘটে, সেই দিকেই নজর রেখে জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রকে ছড়িয়ে দেওয়া হল বহু বিষয়ের ওপর—যতদূর সম্ভব।

এ-গ্রন্থের উদ্দেশ্য নিছক জ্ঞান বিতরণ নয়—জ্ঞানস্পৃহাকে জাগিয়ে দেওয়া—জিজ্ঞাসু মনকে উদ্দীপ্ত করা—যাতে আরো জ্ঞানের আকণ্ঠ পিপাসা জাগে মনের মধ্যে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানই একমাত্র বস্তু—যা নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া যায় ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে দেশ-ক্ষেত্র-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে। এই গ্রন্থই তাই রচিত হল সব বয়েসের সব মানুষের জন্যে।

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : অজয় বর্ধন
দীপ্তি প্রিন্টার্স, ৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলিকাতা ৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

দাম : কুড়ি টাকা

সূচীপত্র

আবিষ্কার

পৃষ্ঠা সংখ্যা

মানব দেহ

পৃষ্ঠা সংখ্যা

অন্যান্য প্রাণী

বাঙলা ও বাঙালী

পুরাণ, বেদ, বেদান্ত

গানবাজনা

বিবিধ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাজার জিজ্ঞাসা

ব্রহ্মাণ্ডটা কত বড় ?

ব্রহ্মাণ্ডের সঠিক আয়তন কল্পনায় আনা মানুষের মন দিয়ে সম্ভব নয়। ব্রহ্মাণ্ডটা কত বড়, আমরা তো তা জানিই নি—কত বড় হতে পারে, সে ধারণা করাও কঠিন।

পৃথিবী থেকে শুরু করে বাইরের দিকে এগোলেই বোঝা যাবে ধারণা করা কেন সম্ভব নয়। পৃথিবী সৌরজগতের একটা অংশ—অতি ক্ষুদ্র অংশ—নেহাতই পুঁচকে বলা যায়। সৌর জগতে রয়েছে সূর্য, সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে গ্রহরা, গ্রহাণুরা এবং উল্কারা। গ্রহাণুরা কিন্তু পুঁচকে গ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সব মিলিয়ে এই যে সৌরজগৎ, এটাই কিন্তু আর একটা আরও বড় জগ-তের অতি পুচঁকে একটা অংশ। এই বড় জগৎটার নাম গ্যালাক্সি। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে এই গ্যালক্সি। এদের মধ্যে অনেক নক্ষত্র আমাদের এই সূর্যের চাইতেও অনেক বড় হলেও হতে পারে এবং তাদের নিজেদের সৌরজগৎও থাকতে পারে।

কাজেই গ্যালাক্সির মধ্যে যে সব নক্ষত্র আমরা দেখি, যাদের বলা হয় 'ছায়াপথ', তারা প্রত্যেকেই এক একটা সূর্য। এরা এতদূরে যে মাঝের দূরত্ব মাইলের বদলে আলোকবর্ষ দিয়ে মাপা হয়। এক বছরে আলো ৬,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল পথ যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের ঝকঝকে নক্ষত্রের নাম আলফা সেন্টরী। দূরত্ব কত ভাবতে পারো? ২৫,০০০,০০০, ০০০,০০০ মাইল!

এখন পর্যন্ত কিন্তু কেবল নিজেদের গ্যালাক্সি নিয়ে বড়াই করে মরছি। এই গ্যালাক্সি চওড়ায় ১,০০,০০০ আলোকবর্ষ। এই রকম একটা হিসেব করে নেওয়া হয়েছে। এর মানে হল ৬,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইলের ১,০০,০০০ গুণ! মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত এই বিশালতা সত্ত্বেও এই গ্যালাক্সি এর চাইতেও বড় আরও একটা জগতের অতি পুঁচকে অংশ মাত্র।

খুব সম্ভব এরকম লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সি রয়েছে ছায়াপথের বাইরে। হয়তো এই সব গ্যালাক্সি এক করলেও তা তার চাইতেও বড় আর একটা জগতের ছোট্ট একটা অংশ ছাড়া কিছুই নয়।

এখন বুঝলে তো ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন আন্দাজ করাটাও কেন অসম্ভব? এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা যাক। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, এই ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ আরো ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। এর মানেটা কি জানো? কয়েক কোটি বছর অন্তর অন্তর দেখা যাবে, দুটো গ্যালাক্সির মধ্যেকার ব্যবধান আগের ব্যবধানের ঠিক ডবল হয়ে গেছে।

সূর্যকে কে জ্বলজ্বলে রেখেছে?

বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে বুঝি, তবুও বিশ্বাস করো, দিনের আলোয় যে জ্বলজ্বলে সূর্য ছাখো আর রাতের অন্ধকারে যে ঝলমল তারাদের ছাখো— এরা সবাই কিন্তু একই জিনিস। একই জিনিসকে দেখছো দিনের আলোয় আর রাতের আঁধারে বিভিন্ন চেহারায়!

সূর্য তো আসলে একটা তারা। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারা। প্রাণ বলতে আমরা যা বুঝি, তা নির্ভর করছে এই সূর্যের ওপরেই। সূর্যের তাপ না পেলে পৃথিবীর ওপরে প্রাণের সৃষ্টি হত না। সবুজ গাছপালা, পশুপাখী কীটপতঙ্গ, এমন কি মানুষ পর্যন্ত থাকবে না সূর্য না থাকলে।

সূর্য পৃথিবীর কাছ থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে। পৃথিবীর যা আয়তন তার ১৩ লক্ষ গুণ বড় আয়তন এই সূর্যের! তা সত্ত্বেও সূর্য সম্বন্ধে একটা কৌতূহল জাগানো খবর এই যে, সূর্যের দেহটা কিন্তু পৃথিবীর মত নিরেট নয়।

খবরটা জানা গেছে এই ভাবে: সূর্যের ওপরকার তাপমাত্রা প্রায় ১১ হাজার ফারেনহিট। প্রচণ্ড এই তাপে যে কোন ধাতু বা পাথর গ্যাস হয়ে যায়, সূর্যও তাহলে নিশ্চয় একটা গ্যাসের গোলক!

অনেক বছর আগে বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করতেন, সূর্য নিশ্চয় পুড়ছে বলেই

আলো আর তাপ বিলোচ্ছে এবং সেই জন্যেই সূর্য জলজল করছে। কিন্তু সূর্য তো গরম রয়েছে লক্ষকোটি বছর ধরে। এত বছরে পুড়তে পুড়তে সূর্যের নিভে যাওয়ার কথা—এত দীর্ঘ সময় ধরে কোনো জিনিস সমানে পুড়তে পারে না।

আজকের বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করেন, পারমাণবিক বোমার ভেতরে ঠিক যে ক্রিয়াকাণ্ড চলে, হুবহু সেই ক্রিয়াকাণ্ড সূর্যের মধ্যেও চলছে। তারই ফলে, সূর্য গরম হয়ে রয়েছে। বস্তুকে শক্তিতে পরিণত করছে।

পুড়ে যাওয়া কিন্তু তা নয়। পোড়ার পরে এক বস্তু পালটে গিয়ে আরেক বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বস্তু যখন শক্তি হয়ে যায়, তখন বিপুল শক্তি উৎপাদন করতে দরকার হয় খুবই কম পরিমাণ বস্তুর। এক আউন্স বস্তু থেকে যে শক্তি বেরোয়, তা দিয়ে দশ লক্ষ টনেরও বেশী পাথর গলিয়ে দেওয়া যায়!

কাজেই, বিজ্ঞান যদি ভুল না করে থাকে, তাহলে সূর্য জলজলে রয়েছে, শুধু একটি কারণে—বিরামবিহীনভাবে সেখানে বস্তু পালটে গিয়ে শক্তি হয়ে যাচ্ছে। সূর্যের যা ভর (Mass), তার একশ ভাগের মাত্র এক ভাগ থেকেও যে শক্তি বেরোবে—তা দিয়ে সূর্যকে জলন্ত রাখা যাবে পনেরো লক্ষ বছর।

পৃথিবীটা কি দিয়ে তৈরী ?

চাঁদ আর অন্যান্য গ্রহে কি আছে, তা আবিষ্কার করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে মানুষ। কিন্তু হায় রে! মানুষ এখনো সঠিক জানে না তার নিজের গ্রহ পৃথিবীটা আসলে কি দিয়ে তৈরি!

এ প্রশ্নের ভাসাভাসা উত্তর হিসেবে বলা যায়, পৃথিবীটা বেশীর ভাগই পাথর দিয়ে তৈরি একটা মস্ত গোলক, পৃথিবীপৃষ্ঠের তিন ভাগের এক ভাগের-ও কম অঞ্চল ডাঙা, আর তিনভাগের দুভাগেরও বেশী অঞ্চল হল জল।

এবার এসো এই তথ্যটা নিয়েই একটু তলিয়ে আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর বাইরের দিকটা দশ থেকে তিরিশ মাইল পুরু একটা পাথরের খোসা দিয়ে মোড়া। কখনো-সখনো এই খোসাকে বলা হয় 'লিথোসফিয়ার'। খোসার উঁচু অংশগুলো মহাদেশ, নীচু অংশগুলো ধরে রেখেছে মহাসমুদ্র, ডাঙার মধ্যে বদ্ধ সমুদ্র এবং হ্রদ। মহাসমুদ্র, হ্রদ এবং ছোটখাট সমস্ত রকমের নদনদী সমেত পৃথিবীর ওপরকার এই সব জলকে বলা হয় 'হাইড্রোসফিয়ার'।

পৃথিবীর বাইরেটা যে পাথরের খোসা দিয়ে মোড়া, মানুষ শুধু সেইটুকুই

পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছে। তাই পৃথিবীর ভেতরে কি আছে জানা এত কঠিন। খনি খোঁড়ার সময়ে আর কুয়ো তৈরীর সময়ে ভূস্তর ফুটো করতে গিয়ে দেখা গেছে, যতই নিচে নামা যায়, তাপমাত্রা ততই বাড়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে দু'মাইল নিচে নামলে দেখা যাবে তাপমাত্রা এত বেশী যে দিব্বি জল ফুটিয়ে ভাত ফুটিয়ে খাওয়া যাচ্ছে।

ভূমিকম্প সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু পৃথিবীর জঠর সম্পর্কে বেশ কিছু খবর জেনে ফেলেছেন। ওঁদের বিশ্বাস, পৃথিবীর খোসা ভেদ করে নিচে নামার সময়ে যে হারে তাপমাত্রা বাড়ে, সে হারে কিন্তু বাড়ছে না আরো ভেতর দিকে। এই কারণেই ওঁদের ধারণা, পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রের তাপমাত্রা দশহাজার ডিগ্রী ফারেনহিটের বেশী নাও হতে পারে। দশ হাজার ডিগ্রীও নেহাৎ কম গরম নয়—বাইশ'শো ডিগ্রীতেই তো পাথর গলে যায়!

পৃথিবীর বাইরের খোসার দুটো স্তর। ওপরের স্তরটা গ্র্যানাইট দিয়ে তৈরি—এখানে রয়েছে মহাদেশ। গ্র্যানাইটের নিচে ব্যাসাল্ট দিয়ে তৈরি একটা পুরু স্তর। ব্যাসাল্ট এক রকমের দারুণ শক্ত পাথর। বৈজ্ঞানিক-দের বিশ্বাস, পৃথিবীর কেন্দ্রে রয়েছে তরল লোহার একটা বিরাট বল—যার ব্যাস প্রায় চার হাজার মাইল। মাঝের এই বল আর বাইরের পাথুরে খোসার মধ্যে রয়েছে প্রায় দু'মাইল পুরু একটা ছাল—যার নাম 'ম্যান্টল'। খুব সম্ভব 'অলিভিন' নামে এক রকমের পাথর দিয়ে তৈরী এই 'ম্যান্টল'।

'জঙ্গলের মানুষ' কাকে বলে ?

'জঙ্গলের মানুষ' কথাটার অর্থ ওরাং উটান। বনমানুষ বা মানবাকৃতি বানর চার রকমের হয়। 'গিবন', 'গরিলা' 'শিম্পাঞ্জি' আর 'ওরাং উটান'। এদের কাছাকাছি সম্পর্কের এক জন্তু আছে, তাদের নাম 'লেমুর'।

মানুষের মত সোজাভাবে না হলেও অনেকটা সেই ভাবে ওরা দাঁড়াতে পারে, চলাফেরা করতে পারে আর মাথা খাটিয়ে অনেক কাজ করতে পারে।

ওরাং উটানের জন্মস্থান বোর্নিও আর সুমাত্রা দ্বীপে। নামটা ওদেশের লোকেরাই দিয়েছে ওখানকার বন মানুষদের। গরিলা আর শিম্পাঞ্জির চেয়ে আকারে ওরাং উটান অনেক ছোট হয়। খুব বড় সাইজের ওরাংও কখনো মাথায় তিন হাতের ওপর যায় না।

ওরাং উটান লাফ দিতে সেরকম পোক্ত নয়। মাটির ওপর দিয়েও

হন্ হন্ করে হাঁটাহাটিতে পোক্ত নয়। কিন্তু গাছের ডালপালার ওপর চার হাত পায়ে এমন শন্ শন্ করে ছোটে যে পাকড়ানো মুস্কিল।

গরিলা বা শিম্পাঞ্জির মত ওরাং উটান বাচ্চাকাচ্চার ফ্যামিলি নিয়ে থাকে—তবে গরিলা বা শিম্পাঞ্জিদের মত দলভারী হয়ে ঘোরে না। রাত্রে থাকে গাছের ডালে বাসা বেঁধে। খায় বনের ফল, বাঁশের কোঁড় আর কচি ডালপাতা। দারুণ শক্তিমান। খেপে গেলে কামড়ে দেয়—নইলে শান্ত শিষ্ট। খামোকা কাউকে আক্রমণ করা এদের স্বভাব নয়। জঙ্গলের মানুষ তো!

বনমানুষ আর অন্য বানরে তফাৎ কী ?

অন্যান্য বানরের ল্যাজ থাকে। মুখের ভেতর থলি থাকে খাবার জমিয়ে রাখার জন্যে। কিন্তু বনমানুষের ল্যাজও নেই, মুখের ভেতরে থলিও নেই পেটুক দামোদরের মত খাবার পেলেই কেড়ে কুড়ে নিয়ে জমিয়ে রাখার জন্যে!

উল্লুক কাকে বলে ?

উল্লুক বলে এক শ্রেণীর গিবনকে ভারতবর্ষের মণিপুর, আসাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে আর ব্রহ্মদেশে যারা থাকে। বোর্নিও, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপেও গিবন আছে।

গিবন এক শ্রেণীর বনমানুষ। বাংলায় যাদের উল্লুক বলি, তাদের ছেলেদের গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, ভুরুর ওপরে কপালে সাদা দাগ থাকে। মেয়েদের গায়ের রঙ আহামরি কিছু নয়—কালচে পাটকিলে। খুব সুন্দরী হলে সাদাটে পাটকিলে।

বনমানুষদের মধ্যে রূপবান বলতে কিন্তু এই গিবনরাই। এরা চার পাঁচ রকমের হয়। লম্বায় দু' হাতের বেশী কখনো হয় না। অনেকটা মানুষের মত সিধে হয়ে হাঁটতে চায়, দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে মাতালের মত টলে টলে চলে। কিন্তু গাছে গাছে বিদ্যুৎ বেগে লাফিয়ে চলে যায় ২৫।৩০ হাত দূরের গাছেও। সেই সময়ে ছোট পাখী পেলে মুখে ভরতেও দ্বিধা করে না।

এরা থাকে ৪০/৫০ জন মিলে দল বেঁধে। ভোর বেলা আর সন্ধ্যে-বেলাতেই এরা সবচেয়ে বেশী ডাকাডাকি করে। বিচ্ছিরি সেই হুকু-হুকু ডাক এক মাইল দূর থেকেও শোনা যায়।

বুদ্ধিতে এরা ওরাং উটানের ঠিক পরেই। বাঁদর আর হনুমানদের মত গবেট নয়। খুব নিচু স্তরের মানুষের সঙ্গে উঁচু শ্রেণীর এই বাঁদরদের দেহের গঠনে পার্থক্য এত কম যে ভাবলেও তাজ্জব হতে হয়।

এই কারণেই উল্লুক গালাগালে খুব বেশী মন খারাপ করার আছে কী? বাঁদর বা হনুমান বললে না হয় রাগ হতে পারে!

জল বরফ হয় কিভাবে?

শীতের দেশে নদী, সরোবর। পুকুরের জল জমে বরফ হয়ে যায়। বরফের পাতলা চাদরে জলের ওপরটা ঢেকে যায়।

তার মানে ঠাণ্ডায় জল বরফ হয়ে যাচ্ছে ওপর থেকে নিচের দিকে। কিন্তু যদি ঠিক এর উল্টোটা হত, অর্থাৎ ওপর থেকে জল বরফে পরিণত হতে শুরু না করে যদি তলদেশে থেকে হতে আরম্ভ করত, তাহলে কিন্তু আমাদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই দাঁড়াত অন্যরকম। তাই নয় কী? পৃথিবীর জলবায়ুই যে শুধু পালটে যেত তা নয়, জলের মধ্যে যে প্রাণীদের নিবাস, তারাও অদৃশ্য হয়ে যেত চিরতরে।

এবার দেখা যাক, বেজায় ঠাণ্ডায় পুকুরের জল বরফ হয় কি করে। পুকুরের ঠিক ওপরকার বাতাস কন্‌কনে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই সেই ঠাণ্ডায় জলের ওপরকার স্তরও হিমঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঠাণ্ডার চোটে জলটা ভারী হয়ে যায় ঠিক নিচের স্তরের জলের চেয়ে, তখন তা ডুবে যায় নিচে—নিচের উষ্ণ জল উঠে আসে ওপরে। এই ভাবেই:চলতে থাকে যতক্ষণ না পুকুরের সমস্ত জলের তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রী ফারেনহিটে এসে দাঁড়াচ্ছে।

কিন্তু বাইরের বাতাসের তাপমাত্রা যে তখনো কমে চলেছে! হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে ছাড়ছে। তখন জলের সবচেয়ে ওপরের স্তরের জল আরো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েও ওপরেই থেকে যায়, নিচে আর নামে না। ৩৯ ডিগ্রীর চেয়েও তাপমাত্রা কমে গেলেও ওপরেই থেকে যায়! কেন থেকে যায়? না, ৩৯ ডিগ্রীর নিচে জলের তাপমাত্রা নেমে গেলে সে জল তখন আসলে হাল্কা হয়ে যায়!

তাহলে আমরা এখন দেখছি জলের সবচেয়ে ওপরের স্তর এমন হিম ঠাণ্ডা অবস্থায় পৌঁছেছে যে জমে যাওয়ার মত অবস্থা এসে গেছে। কাজেই তাপমাত্রা যখন ৩২ ডিগ্রীতে এসে দাঁড়ায়—যে তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হয়ে যায়—অথবা, আরও নিচে তাপমাত্রা নামতে থাকে, তখন ক্ষুদে ক্ষুদে ক্রিস্ট্যাল আকার গ্রহণ করতে শুরু করে।

প্রত্যেকটা ক্রিস্ট্যালের ছটা রশ্মি রেখার মত পয়েন্ট আছে। এরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে গেলেই বরফের আকার নেয়। দেখতে দেখতে জলের ওপরটা বরফের চাদরে ছেয়ে যায়। কখনো কখনো এই বরফ হয় স্বচ্ছ, কখনো

ঘোলাটে। কেন? না প্রত্যেকটা জলের ফোঁটা জমে বরফ হওয়ার সময়ে একটা করে ক্ষুদে বাতাসের বুদবুদকে মুক্তি দেয় নিজের মধ্যে থেকে। এই বুদবুদটাই কৃস্ট্যালের বাহুতে সেঁটে থাকে। যত বেশী কৃস্ট্যাল তৈরী হতে থাকে তত বেশী বুদবুদ ধরা পড়ে কৃস্ট্যালদের গায়ে। ফলে ঘোলাটে হয়ে যায় বরফ।

তাহলে বরফ স্বচ্ছ হয় কি করে? এরও জবাব আছে। বরফের চাদরের তলায় যদি জল সঞ্চরমান থাকে, তাহলে পুঁচকে পুঁচকে বাতাসের বুদবুদরা একজায়গায় দল পাকিয়ে আটকে থাকে—বরফ এক্ষেত্রে টলটলে পরিষ্কার হয়।

তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার সময়ে যে কটা বস্তু সঙ্কুচিত হয় না—জল তাদের অন্যতম। জল জমে বরফ হলে এক নবমাংশ প্রসারিত হয়। তার মানে ন'বোতল জল জমিয়ে বরফ করলে পাওয়া যাবে দশ বোতল বরফ! মজা মন্দ নয়, তাই না? কিন্তু মজা মাঠে মারা যায় শীতের দেশে যখন বরফ জমানো ঠাণ্ডায় মোটর গাড়ীর র‍্যাডিয়েটর আর জলের পাইপে ফাট ধরে, জল জমে বরফ হয়ে গেলেই তো তার বেশী জায়গা চাই; যেহেতু বাড়তি বরফের জায়গা নেই—ফাট ধরে জলের পাইপে আর মোটরের র‍্যাডিয়েটরে!

ক্যাকটাসের পাতা থাকে না কেন?

জল ছাড়া দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্যে। কিভাবে? সেই তথ্যেই আসা যাক এবার।

মরুভূমিতে যাদের নিবাস, অতি সামান্য জলের সাহায্যে টিঁকে থাকার সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় তাদের প্রত্যেককেই। সমস্যার সমাধান না করতে পারলে টিঁকেও থাকতে পারবে না—অকালাভ অনিবার্য!

জল ছাড়া ক্যাকটাস বাঁচে না। কিন্তু অনেকদিন ধরে যখন মরু অঞ্চলে বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই, তখন ক্যাকটাস টিঁকে থাকে বড় আশ্চর্য রকম ভাবে। সাধারণ পরিবেশে যে সব গাছপালা বেড়ে ওঠে, তারা জল অপচয় করে বড্ড বেশী। গাছের রস থেকে জল টেনে নিয়ে সেই জলকে পাতার মধ্যে দিয়ে বার করে দেয় বাতাসে!

কিন্তু ক্যাকটাস পাতা রাখে নি নিজের গায়ে, ফলে জল অপচয়ের প্রশ্নই ওঠে না। ক্যাকটাসের গুঁড়ি এমন ভাবে তৈরী যে সরাসরি সূর্যকিরণ লাগে খুব কম জায়গায়। মানে, যতখানি কম দিক সূর্যের দিকে ফিরিয়ে থাকা যায়

আর কি ! এই ভাবেই বলতে গেলে কোনো আর্দ্রতাই গা থেকে বেরোতে দেয় না ক্যাকটাস কিপটেরা ! কিপটে ক্যাকটাসরা এ ছাড়াও গুঁড়িগুলো এমন পুরু করে রেখেছে যে জল জমিয়ে রাখতে পারে তার ভেতরে এবং গুঁড়ির গা-ও এত মোটা যে সেই জল সুরক্ষিত থাকে বেশ ভাল ভাবেই। ক্যাকটাসের গায়ের কাঁটা অথবা আঁশ-রাও আগলায় জলাধার—তেষ্টায় টা-টা করছে এমনি সব জন্তু জানোয়ারেরা ঐ বিকট কাঁটা আর আঁশ দেখেই মুষড়ে পড়ে —ক্যাকটাস চিবিয়ে খেতে চায় না। এই ভাবে বড় বড় কিছু ক্যাকটাস গাছ দু-বছর পর্যন্ত এমন কি তারও বেশী বছর পর্যন্ত জল ছাড়াই বহাল তবিয়তে টিঁকে থাকতে পারে।

ক্যাকটাস হল সেই জাতের গাছ যাদের ফুল হয়, সেই ফুল ফোটে এবং তা থেকে বীজ বহনকারী ফলও আসে। ক্যাকটাসের ফুল কিন্তু বড় সুন্দর। ফুল ফোটার মরশুমে ঝকঝকে লাল, হলুদ, বেগুনী ফুলে ঝলমল করতে থাকে মরুভূমির বিজন প্রান্তর—ক্যাকটাসের পালিশ করা গুঁড়ি থেকেই বেরোয় এই সব বিচিত্র ফুল।

এক হাজারেরও বেশী রকমের ক্যাকটাস আছে এই পৃথিবীতে। এদের আদিবাস দক্ষিণ আর মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো, আর যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে। রকমফেরেরও যেন সীমা নেই। কেউ ছোট পিনকুশনের মত, মাটি লেপটে রয়েছে যেন—বিনয়ের অবতার ! আবার কেউ ৩০ থেকে ৭০ ফুট পর্যন্ত উঁচু মহাদাম্ভিক—যেন মাথা নুইয়ে দাঁড়াতে শেখেনি জন্ম থেকে। দানবিক এই ক্যাকটাসের নাম দৈত্য সাগুয়ারো। আরিজোনা দেশটা এত গর্বিত এই ক্যাকটাসের জন্যে যে দেশ-পুষ্পের সম্মান দিয়েছে সাগুয়ারো-কে। পিনকুশন আর দৈত্য—এদের মাঝেও আছে হাজার এবং তারও বেশী রকমের হরেকরকম চেহারার ক্যাকটাস—যাদের মিছিল যে কোনো কল্পনাবিলাসী মানুষেরও মুণ্ড ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

ক্যাকটাস কি নিছক কর্কশদর্শন উদ্ভিদ ? এদের দিয়ে মানবসমাজের কোনো উপকারই কি হয় না ? হয়, হয় ! ক্যাকটাসের গুঁড়ির নির্যাস থেকে ওষুধপত্র তৈরী হয়—অনেকে আবার সেই রস গাঁজিয়ে মদ বানিয়েও নেয়। দৃঢ় ক্যাকটাসের ফল আর গুঁড়ি থেকে মুখরোচক মিষ্টিও তৈরী হয়। খাবারদাবার অনেকদিন যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, এমনি বস্তুও বার করে আনা যায় এই ফল আর গুঁড়ির ভেতর থেকে। কিছু কিছু ক্ষুদে ক্যাকটাসকে বসত বাড়ির চারপাশেই বাড়তে দেওয়া যায়। টবে রাখলে জল বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা ভাল ভাবে রাখা দরকার। গরমকালে চারদিন অন্তর আর

শীতকালে দু-হপ্তা অন্তর ক্যাকটাসে জল দিতে হয়।

বিচিত্র ক্যাকটাস, তোমাকে নমস্কার!

মানসিক আঘাতে চুল পাকে কী ?

পাকে বই কী। কিন্তু মানসিক আঘাত আর স্নায়ুঘটিত বিপর্যয়ের ফলে চুল পাকে কিভাবে, সে রহস্য কিন্তু আজও রহস্যই রয়ে গেছে বিজ্ঞানীমহলে। ব্যাপারটা সঠিক কেউ বুঝিয়ে উঠতে পারে না। বেশী কথা কি, বুড়ো হলে চুল পাকতে শুরু করে কেন, এই রহস্যেরই পূর্ণ ব্যাখ্যা কি আজও আমরা পেয়েছি? কিন্তু কারণটা কি-কি হতে পারে, সে সম্বন্ধে খানিকটা আঁচ করা গেছে। দেখা যাক, তা কী।

চুল জিনিসটা আসলে চামড়ারই একটা অংশ। চামড়াতেই শেকড় গেঁথে বেড়ে ওঠে ওপর দিকে। চামড়া থেকে বাইরে আর দূরে যেতে যেতে চুলের কোষের উপাদান পালটে গিয়ে আসে শিংয়ের মত বস্তু। চুলের বাইরের দিকটায় কোষগুলো চ্যাপ্টা হয়ে যায়; ঘরে চালের টালি যে ভাবে থাকে থাকে সাজানো থাকে, সেই ভাবে এই চ্যাপ্টা কোষগুলো একটার ওপর একটা সাজানো থাকে বলেই চুলের বাইরের দিকটা ঐ রকম 'ধাতব' দেখায়।

চুলের শেকড়ে যে-সব কোষ থাকে, তাদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটা কোষের মধ্যে থাকে রঞ্জক পদার্থ, বা রঙ করার উপাদান। অন্যান্য কোষের মত এই কোষেরাও নিজেরা এক থেকে বহু হয় এবং অন্যান্য কোষেদের সঙ্গেই ঠেলে ঠুলে ওপর দিকে উঠতে থাকে। চুলের সুরঙ্গ পথ বেয়ে উঠতে উঠতেই কিন্তু এদের আয়ু শেষ হয়ে যায়। ভেতরকার রঞ্জক পদার্থগুলো চুলের মধ্যেই থেকে যায়।

চুলের শিংয়ের মত উপাদানটা নিজে কিন্তু হলুদ রঙের। রঞ্জক পদার্থের দানাগুলো বিভিন্ন রঙের—মানে, বাদামী রঙটাই ঘন আর ফিকে হওয়ার ফলে নানান রঙ হয়ে দাঁড়িয়েছে, লালচে বাদামী থেকে আরম্ভ করে গাঢ় কালচে বাদামী পর্যন্ত সবই আছে। শিংয়ের মত উপাদানের হলুদ রঙের সাথে রঞ্জক পদার্থের দানার মিশ্রণ ঘটলেই হরেকরকম চুল আমরা দেখতে পাই বাইরে থেকে; উজ্জ্বল সোনালী থেকে কুচকুচে কালো—সবই এই দুই রঙের মিশেলের ম্যাজিক। রঞ্জক পদার্থের দানাগুলো ব্যক্তি বিশেষে কি রকম হবে, তা অবশ্য নির্ভর করে বংশগতির ওপর। বাপ মায়ের কাছ থেকে যে রকম 'জিন' পাবে কোষের মধ্যে—তার ওপর।

এখন আসা যাক চুল সাদা হওয়ার ব্যাখ্যায়। বয়স বাড়লে বা অসুখ

বিসুখ হলে (অথবা আচমকা প্রবল মানসিক আঘাত কিম্বা উদ্বেগ দুশ্চিন্তায়) চুল সাদা হয়ে যাওয়ার কারণ একটাই : এরাই চুলের মধ্যে রঞ্জক পদার্থ বেশী পরিমাণে জমতে দেয় না। সঞ্চয় কমে যাওয়ার ফলে চুল সাদা হয়ে যায়। চুল পাকার আরও একটা ব্যাখ্যা আছে। বাতাসের ফোকর বা বুদবুদ সৃষ্টি হতে থাকে চুলের মধ্যে এবং এরাই রঞ্জক পদার্থকে হটিয়ে দিয়ে জবর দখল করে তাদের জায়গা। স্নায়বিক উত্তেজনা, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর দুঃখ বিষাদ চুলের কোষের মধ্যে যে বাতাসের বুদবুদকে আসতে দেয়, এ তথ্য আমরা জানি। চুলকে পাকিয়ে দেয় এই ভাবেই। কিন্তু আসল রহস্যটা রহস্যই রয়ে গিয়েছে। কিভাবে এবং কেন যে এই কাণ্ডটা ঘটে, তা তো এখনো আমরা জানি না!

প্যারাসুট কে আবিষ্কার করেছিলেন ?

শূন্যে উঠে গেলাম মাইল তিনেক উঁচুতে। তারপর বিমানপোত থেকে লাভ দিলাম শূন্যে এবং মাটিতে এসে যখন ঠেকলাম তখন মনে হল যেন তিন মাইল উঁচু থেকে নয়—মাত্র বারো ফুট উঁচু পাঁচিল থেকে লাফিয়ে নামলাম পৃথিবী মা'য়ের বুকে!

অসম্ভব? মোটেই না। প্যারাসুট পিঠে বেঁধে নিয়ে অসম্ভবকে তুমিও সম্ভব করতে পারবে। প্যারাসুট মানে হাতিঘোড়া কিছু তো নয়—বিরাট একটা ছাতা। বাতাস আটকে বাধার সৃষ্টি করাই তার একমাত্র কাজ। প্যারাসুটের তলায় ঝুলতে ঝুলতে বাতাসের মধ্যে দিয়ে ভেসে ভেসে প্যারাসুটধারী যখন মাটিতে এসে পা দেয়, গোড়ালি পর্যন্ত মচকে যায় না—ছাতু হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। আঘাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে মেঘলোক থেকে মর্ত্যে নিরাপদে নামিয়ে আনার জন্যেই প্যারাসুট নামক বিশাল ছাতার উদ্ভব।

মানুষকে নিয়ে বিমানপোত উড়বে, এই যে স্বপ্ন মানুষ দেখে এসেছে বহু বছর ধরে, তার প্রথম রূপায়ণ বোধ হয় প্যারাসুট। প্যারাসুটই সম্ভবতঃ মানুষবহনকারী বায়ুযানের সবচেয়ে পুরোনো আইডিয়া। ১৫১৪ সালে প্যারাসুটের নক্সা এঁকেছিলেন লাওনার্দো দ্য ভিন্সি তাঁর নোট বইতে। কাজ চলা গোছের প্যারাসুটের বর্ণনা ছেপে বার করলেন ফস্টো ভেরানজিও ১৫৯৫ সালে। প্যারাসুটকে প্রথম কাজে লাগান নাকি একজন ফরাসী। ভদ্রলোকের নাম জে পি ব্ল্যান্চার্ড। ১৭৮৫ সালে ঘটনাটা ঘটে। বেলুন থেকে একটা ঝুড়ি ফেলে দেন তিনি প্যারাসুটের তলায় বেঁধে। ঝুড়িতে ছিল একটা কুকুর। ব্ল্যানচার্ড দাবী করেছেন। প্যারাসুটে ঝুলে তিনি নিজেও নেমে-

ছেন বেলুন থেকে—নামতে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন।

প্যারাসুটকে নিয়মিত ব্যবহার করার কৃতিত্ব রাখেন আরো একজন ফরাসী ভদ্রলোক। এঁর নাম জে গারনেরিন। সবার সামনে প্যারী শহরে উনিই সর্ব প্রথম প্যারাসুট ধরে লাফ দেন ১৭৯৭ সালের ২২শে অক্টোবর। নির্বিঘ্নে নেমে আসেন মাটিতে। দেখতে ছাতার মত ছিল ওঁর প্যারাসুট। সাদা ক্যানভাস দিয়ে তৈরী। ব্যাস প্রায় তেইশ ফুট। ছাতার মাঝখানে ছিল দশ ইঞ্চি ব্যাসের কাঠের চাকতি—মাঝে একটা ফুটো—ছাতার মধ্যে হাওয়াকে বার করে দেওয়ার জন্যে। ছোট ছোট বিস্তর ফিতে দিয়ে ক্যানভাসের ছাতার সঙ্গে আটকানো ছিল এই কাঠের চাকতি।

উড়ন্ত উড়োজাহাজ থেকে সর্বপ্রথম প্যারাসুট ধরে ঝাঁপ দিয়ে নির্বিঘ্নে মাটিতে নেমে আসেন ক্যাপ্টেন বেরী ১৯১২ সালে। মিসৌরীর সেন্ট লুইতে এই ডান পিটেমি দেখিয়ে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যান। এর পরেই ১৯১৩ আর ১৯১৪ সালে বিস্তর জল্পনাকল্পনা চলল এরোপ্লেন থেকে প্যারাসুট ধরে মাটিতে নেমে আসার বাস্তব সম্ভাবনা নিয়ে। যে এরোপ্লেন ধ্বংস হতে চলেছে, তার জঠর থেকে এইভাবে বেরুতে পারলে মানুষগুলো তো বেঁচে যায়! ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়েও সমস্যাটার সমাধান হয়নি। তখনো সবাই ভাবছেন প্যারাসুটের সাইজ কি রকম হওয়া উচিত, অথবা এরোপ্লেন থেকে পাইলট ঠিক বেরিয়ে আসতে পারবে তো? প্যারাসুট যদি না খোলে?

সৌরজগৎটা ঠিক এইভাবে সাজানো কেন?

ঠিক এই ভাবেই সূর্যদেব তাঁর ছানাপোনা সাজিয়ে বসে আছেন কেন, কেন অন্য ভাবে সৌরজগৎ সাজানো হয়নি—তার সঠিক কোনো কারণ পাওয়া যায়নি—অন্ততঃ আমরা আজ পর্যন্ত তাই জানি। ব্রহ্মাণ্ডে আরো কত সৌরজগৎ রয়েছে, হরেক রকমভাবে তারা সাজানো রয়েছে, তাদের কোনো একটার মত সাজানো হলেও হতে পারত আমাদের এই সৌরজগৎ। কিন্তু সেটাও নির্ভর করতো সৌরজগতের উৎপত্তি যে ভাবে হয়েছে, তার ওপর। প্রকৃতির এমন কতকগুলো আইনকানুন মানুষ আবিষ্কার করেছে যার ভিত্তিতে মনে হয় আমাদের এই সৌরজগৎ এইভাবেই সাজানো হয়েছে জন্মের সময় থেকেই। এই নিয়মগুলোই মনে হয় সৌরজগৎকে রেখে দিয়েছে এখনকার এই প্যাটার্নে।

অন্যান্য গ্রহের মত পৃথিবীও নিজের রাস্তায়, মানে নিজের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে সূর্যদেবকে। একপাক ঘুরে আসতে যে সময়টা লাগে, তার নাম এক বছর। অন্যান্য গ্রহদেরও নিজের নিজের কক্ষপথ আছে। পৃথিবীর কক্ষ-

পথের চাইতে কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুলে বলতে পারেন না কিভাবে আমাদের এই সৌর-জগৎ এরকম চেহারা নিয়েছে, কেন গ্রহদের আকার অবস্থান আর কক্ষপথ ঠিক এই অবস্থায় এসেছে। খোলাখুলি ব্যাখ্যা না করতে পারলেও দুটো অনুমিতি বা থিওরী তারা নিয়েছেন। একটা থিওরী অনুসারে উত্তপ্ত গ্যাসের পিণ্ড চর্কিপাক দিতে দিতে আস্তে আস্তে ঝকঝকে সূর্য হয়ে গিয়েছিল। গ্রহ-গুলো এই পরিবর্তনের মধ্যেই জন্ম নিয়েছে, দানবিক গ্যাস আর ধুলোর মেঘ পাক খেতে খেতে ছোট গ্যাস আর ধুলোর ঘূর্ণিপিণ্ডতে ছিটকে ছিটকে যায়— এরাই এখনকার গ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরেকটা মতবাদ অনুসারে, কোনো এক সময়ে অন্য একটা নক্ষত্র সূর্যের সঙ্গে ধাক্কা লাগো-লাগো অবস্থায় এসেও সাঁৎ করে গা ঘেঁসে বেরিয়ে চলে চলে যায়। নক্ষত্রের বিপুল আকর্ষণে সূর্যের গা থেকে বড় বড় চাঁই ছিটকে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন দূরত্বে সূর্যকে ঘিরে প্রদক্ষিণ শুরু করে দেয়। এরাই এখানকার গ্রহ।

কোন মতবাদটা সঠিক, তা জানা না গেলেও এটুকু বোঝা গেছে যে সৌর-জগতের সৃষ্টি হয়েছে মোটামুটিভাবে অকস্মাৎ—দৈবাৎ।—তা না হয় হল। কিন্তু সৌরজগৎটা ঠিক এই ভাবেই কোটি কোটি বছর ধরে রয়েছে কেন?

গ্রহদের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে কেপলার সাহেব কতকগুলো আইন বাৎ-লেছিলেন, এই আইন অনুসারে, সব গ্রহই ডিমের মত উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খায়, সূর্যের যত কাছে আসে, ততই গতিবেগ বাড়ে গ্রহ-দের; কক্ষপথে ঘুরতে যে সময় লাগে তার সঙ্গে গ্রহের দূরত্বের একটা সম্পর্ক আছে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল কেপলারের তিনটে আইন। মাধ্যাকর্ষণ আইন অনুসারে দুটো বস্তু পরস্পরকে টানছে। সূর্য আর গ্রহদের মধ্যে এই সব সম্পর্ক রয়েছে বলেই, প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের অধীন হয়ে সৌরজগৎ এই ভাবেই রয়েছে মহাশূন্যে।

পুরাণ কী?

বিশ্বজগৎটা ঠিক এই রকম কেন, এই নিয়ে পৃথিবীর মানুষ সেই অনাদি-কাল থেকে কত রকম জল্পনাকল্পনাই না করে এসেছে। দুনিয়ার হরেকরকম কাণ্ডকারখানার মনগড়া ব্যাখ্যা সব সময়েই তৈরি করেছে। আজ অবিশ্যি বিশ্বরহস্যের অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি। কিন্তু পুরাকালে মানুষ এ-সব ব্যাখ্যা নিজে নিজেই বানিয়ে নিত।

বিশ্বরহস্য কি একটা! সূর্য কেন রোজ নিয়ম করে আকাশে ওঠে, আবার সারাদিন আকাশে টহল দিয়ে ঝুপ করে আকাশ থেকে পালায়? বারো মাসে ছয় ঋতুর এমন চমৎকার আনাগোনা কেন হয়? নক্ষত্ররা কী? কেন তারা নড়ে নড়ে সরে সরে যায়? এমন অনেক অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপারের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারত না পুরাকালের মানুষ।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও কি রহস্যের শেষ আছে? যে সব ঘটনার ভবিষ্যদবাণী করাও সম্ভব নয়, কেন তারা ঘটে যায়? কেন মানুষ স্বপ্ন দেখে? কেন লোকে অসুখে ভোগে? মানুষ আসে কোথা থেকে, মৃত্যুর পর যায়ই বা কোথায়? বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজগতের সব কিছু সৃষ্টি হয়েছিল কিভাবে?

সব আদিম মানুষরাই এই ধরনের গণ্ডা গণ্ডা প্রশ্ন করেছে নিজেদেরকে। জবাব দেয়ারও চেষ্টা করে গেছে। পৃথিবীর নানান অঞ্চলের নানান জাতের মানুষ নানান ধরনের ব্যাখা সৃষ্টি করেছে আকাশ পাতাল ভেবে ভেবে। বিচিত্র সেই সব ব্যাখ্যায় বিশ্বজগতের বহু বিচিত্র ঘটনাবলীর হরেক রকম কারণ দেখানোও হয়েছে। মনগড়া চমকপ্রদ কল্পনারঙীন গল্পের পর গল্পে এই যে-সব ব্যাখ্যা তারা করার চেষ্টা করেছে, তাদেরই নাম 'পৌরাণিকী কথা'। এক একটা জাতের সব রকমের পৌরাণিকী কথার সমষ্টির নাম পুরাণ।

পৌরাণিকী কথা দিয়ে পুরাকালের মানুষ দুনিয়াটাকে 'মনুষ্যত্ব' বা ব্যক্তিত্ব দানের একটা চেষ্টা চালিয়ে গেছে। আশ পাশের সব বস্তুর মধ্যেই নিজেদের মতই মানুষের চেহারা দেখেছে—এমন সব মহামানুষ বা অতিমানুষ যারা সুগভীর চিন্তার অধিকারী এবং অসামান্য ক্ষমতা রাখে। জাদুকরী শক্তি রাখে সূর্য, চন্দ্র, নদী, তারকা, বৃক্ষ, পশুপক্ষী—অতএব তারা দেবতা। কোনো দেবতা শুভশক্তির অধিকারী—তারা মানুষের কেবল মঙ্গল করে। আবার কেউ কেউ অনিষ্টকারী দেবতা—অশুভ শক্তি—মানুষের যন্ত্রণা, মানুষের খিদে, মানুষের মৃত্যুর জন্যে দায়ী নাকি এরাই।

পুরাকালের মানুষদের কল্পনারঙীন উদ্ভট এই প্রত্যয়ের ফলেই তাদের ধারণা হয়ে গিয়েছিল, ভালো বা মন্দ দেবতারা প্রত্যেকেই ধীশক্তির অধিকারী। সুতরাং তাদের কাছে আবেদন নিবেদন রাখা যেতে পারে। সূর্যের মন আছে, কাজেই রোদ্দুর ঢেলে গাছপালা বৃদ্ধির জন্যে তাকে খোশামুদ করা যেতে পারে। বৃষ্টির দেবতার কাছে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা জানালেও নিশ্চয় সেই বৃষ্টির দেবতা সদয় হয়ে বৃষ্টি নামিয়ে ফসল দিয়ে ভরিয়ে দেবে ক্ষেতের পর ক্ষেত।

এই বিশ্বাস থেকেই এল হরেকরকম পূজা উপচার অনুষ্ঠান যজ্ঞ ইত্যাদির রীতি। দেবতাকে তুষ্ট করার বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি আছে—সেইভাবে প্রার্থনা না জানালে ক্ষেপে যেতে পারে মহাশক্তিধর সেই দেবতাটি। এই সব যজ্ঞানুষ্ঠান, পূজা ইত্যাদির একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল দেবতাদের সঙ্গে সদ্‌ভাব বজায় রাখা যাতে মানুষই বিশ্বজগতের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে।

স্বপ্ন দেখি কেন ?

স্বপ্ন জিনিসটা কিন্তু 'অন্য লোক' থেকে আমদানী নয় মোটেই। ইহ-লোকের বাইরের কোনো লোক থেকে কেউ এসে স্বপ্নের মাধ্যমে বার্তা রেখে যায়, এ ধারণাও ভ্রান্ত। স্বপ্ন কখনোই ভবিষ্যতের খবর দেয় না, ভবিষ্যদ্‌-বাণী করে না, ভবিষ্যতের গর্ভে তাকিয়ে দেখবার ক্ষমতা রাখে না।

আমাদেরই আবেগ আতঙ্ক, কামনা বাসনা, ইচ্ছে, প্রয়োজন, স্মৃতি থেকেই সব স্বপ্নের সৃষ্টি। এদের প্রতিটির সঙ্গে স্বপ্নের কোথাও না কোথাও একটা যোগসূত্র আছে। তবে হ্যাঁ, 'বাইরের' কোনো বস্তুর প্রভাবও পড়ে স্বপ্নের ওপর। কেউ যদি ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, বা শীতার্ত হয়, স্বপ্নের মধ্যে সেই অনুভূতির প্রকাশ ঘটবে। গা থেকে লেপটা যদি খসে যায়, মনে হবে ভাসমান হিম-শৈলর ওপর বসে ভেসে চলেছে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে। আজকের রাতে যে স্বপ্ন দেখবে, তার উপাদান খুবই সম্ভব যে আজকের সারাদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই আসবে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, স্বপ্নের 'বিষয়বস্তু' এমনই কিছু যা ঘুমের সময়ে শরীর মনকে প্রভাবান্বিত করে (শীতে কাঁপা, আওয়াজে চমকে ওঠা, আরামের অভাবে অস্বস্তি ভোগ ইত্যাদি); এ ছাড়াও পূর্ব অভিজ্ঞতা, মনের কামনা বাসনা আর আগ্রহ—এরা সবাই মিলে স্বপ্নের 'বিষয়বস্তু' রচনা করে। এই কারণেই বাচ্চা ছেলেরা ঘুড়ি ওড়ানো বা ডাইনী বা পরীদের স্বপ্ন দেখে, একটু বড় ছেলেরা স্কুলে পরীক্ষার স্বপ্ন দেখে, ক্ষুধায় কাতর মানুষরা মাংস পোলাও মণ্ডা মিঠাইয়ের স্বপ্ন দেখে, বাড়ীর জন্যে মন কেমন করে বলে যুদ্ধ-ক্লান্ত সৈনিক সুখী গৃহকোণের স্বপ্ন দেখে এবং কয়েদীরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। সবই মনের অবদমিত ইচ্ছের প্রতিফলন—এরই নাম স্বপ্ন।

একটা এক্সপেরিমেন্টের গল্প শোনানো যাক। তাহলেই বুঝবে ঘুমের সময়ে কি ঘটে, আর তোমার ইচ্ছে আর চাহিদাগুলো কি ভাবে মিলে মিশে যায় স্বপ্নের মধ্যে। একটি লোক যখন ঘুমিয়ে কাদা, তখন তুলো দিয়ে

হাতের পেছন দিকটা আলতো করে ঘসে দেওয়া হয়েছিল। লোকটা ঠিক তখনি কি স্বপ্ন দেখল জানো? সে যেন হাসপাতাল শয্যাগত এবং তার অত্যন্ত প্রিয়তম একজন এসে আলতো করে চাপড়াচ্ছে তার হাত!

মনঃসমীক্ষক যাঁদের বলা হয়, তাঁরা কিন্তু এই স্বপ্ন নিয়ে রীতিমত চর্চা করেছেন; কেন আমরা স্বপ্ন দেখি, কি স্বপ্ন দেখি, এবং সে-সব স্বপ্নের মানে কী—এই নিয়ে তাঁরা অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁরা স্বপ্নদেখার যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা অনেকেই মেনে নেয়নি ঠিকই—কিন্তু সমস্যা সমাধানে তাঁদের এই প্রয়াস রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক। এঁদের বিশ্বাস, স্বপ্নমাত্রই হল সেইসব ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ যা অপূর্ণ থেকে গিয়েছে। অথবা যে সব আকাঙ্খা অপূর্ণ থাকার ফলে মনে তিক্ততা জমা হয়েছে। ঘুরিয়ে বললে, স্বপ্ন হল সেই জিনিস যা তোমার ইচ্ছা আকাঙ্খাকে পূরণ করতে চায়।

এঁদের এই তত্ত্ব অনুসারে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনুভূতিপ্রকাশে যে-সব বাধা আরোপিত হয়, ঘুমের সময়ে এরাও ঘুমিয়ে পড়ে। তখন আমরা সত্যিই যা করতে চাই, তা প্রকাশ করি, অনুভবও করি। স্বপ্নের মধ্যেই করি এইসব এবং চাপা ইচ্ছে-আকাঙ্খার প্রকাশের পথ করে দিই—এমন সব ইচ্ছে বা আকাঙ্খা যা আমাদের মনের মধ্যে আছে বলেই হয়ত আমাদের জানা নেই!

২৪ ঘণ্টায় হৃদ্‌পিণ্ড ক'বার স্পন্দিত হয়?

প্রায় একলক্ষবার! তার মানে, একলক্ষবার হৃৎপিণ্ড নামক আশ্চর্য 'পাম্প'টা সঙ্কুচিত আর প্রসারিত হয় একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মানুষের শরীরে ৩৬০০ গ্যালন রক্ত পাম্প করার জন্যে! ভাবতেও অদ্ভুত লাগে, তাই না?

পা থেকে মাথা পর্যন্ত এই গোটা শরীরটার মধ্যে রক্ত চলাচল অব্যাহত রয়েছে শুধু এই হার্ট নামক পাম্পের দৌলতে; শিরা আর ধমনী নামক 'নল' দের মধ্যে দিয়ে এই রক্ত যাচ্ছে আর আসছে হরবখৎ। ফুসফুস থেকে অক্সিজেন আর হজম করার দেহ যন্ত্রদের কাছ থেকে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে শরীরের সব জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে রক্ত; আবার টিশুদের মধ্যে সঞ্চিত আবর্জনাকেও সরিয়ে নিয়ে আসছে এই রক্ত।

নলগুলো দু-ধরনের ফাঁপা টিউব, একটা বড় আর একটা ছোট। দুটো নলই হৃৎপিণ্ড নামক 'পাম্পে'র সঙ্গে যুক্ত—কিন্তু নিজেরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয়। ছোট রক্তবাহগুলো হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে গিয়ে আবার ফিরে

এসেছে। বড়গুলো গিয়েছে হৃৎপিণ্ড থেকে শরীরের নানান জায়গায়। এই টিউবগুলোকেই বলা হয় ধমনী, শিরা, আর জালক। ধমনীদের কাজ হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তকে বয়ে নিয়ে যাওয়া। শিরাদের কাজ রক্তকে ফের হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়ে আনা। জালক হল ক্ষুদে ক্ষুদে রক্তবাহ—এরা ধমনী থেকে শিরার মধ্যে রক্ত পাচার করে।

এবার হৃৎপিণ্ড নামক 'পাম্প' নিয়ে দু'চার কথা বলা যাক। দুটো দোতলা বাড়ী যেন গায়ে গায়ে লাগানো—প্রত্যেক বাড়ীর একতলায় একটা ঘর, দোতলায় একটা ঘর। ওপরতলার ঘর দুটোর নাম দক্ষিণ 'অরিক্‌ল্' আর বাম 'অরিক্‌ল'। নিচের তলায় ঘর দুটোর নাম দক্ষিণ 'ভেন্‌ট্রিক্‌ল্ আর বাম 'ভেন্‌ট্রিক্‌ল্'।

সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে এক ফোঁটা রক্ত কোন্ কোন্ পথ দিয়ে যায়, দেখা যাক। অক্সিজেন সহ রক্ত ফুসফুস থেকে যাবে ওপরতলার বাম 'অরিক্‌ল্'য়ে, তারপর নিচের তলার বাম 'ভেনট্রিক্‌ল্'য়ে, তারপরে 'অ্যাওর্‌টা'তে। বৃহৎ ধমনীকে বলা হয় 'অ্যাওরটা' অ্যাওরটা আর তার শাখা প্রশাখারা রক্ত পৌঁছে দিচ্ছে শরীরের বিভিন্ন অংশে।

সবচেয়ে ছোট্ট ধমনীতে সেই রক্ত পৌঁছোনোর পর জালকের মধ্যে দিয়ে চলে আসে সবচেয়ে ছোট্ট শিরার মধ্যে। ছোট শিরার মধ্যে থেকে বড় শিরা, তার চেয়েও বড় শিরার মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে এই রক্ত। সবশেষে পৌঁছোয় হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ 'অরিক্‌ল্‌য়ে। সেখান থেকে দক্ষিণ 'ভেনট্রিক্‌ল্'য়ে এবং সেখান থেকে ধমনীর মধ্যে দিয়ে চলে যায় ফুসফুসের মধ্যে। এখানে পৌঁছে কার্বনডায়অক্সাইড আর কিছু জল বিসর্জন দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে রক্ত। ফিরে আসে হৃৎপিণ্ডের বাম 'অরিক্‌ল্'য়ে। নতুন করে শুরু হয় দেহ পরিক্রমা!

বারুদ অক্সিজেন ছাড়াই জ্বলে কেন?

বারুদ তৈরি হয় প্রধানতঃ কাঠকয়লা, গন্ধক আর পটাসিয়াম নাইট্রেটের মিশ্রণে, এই পটাশিয়াম নাইট্রেট তাপ পেলে তা ভেঙে বেরিয়ে আসে পটাসিয়াম নাইট্রাইট আর অক্সিজেন। বারুদ নিজের জ্বলে ওঠার কাজে এই অক্সিজেনকেই কাজে লাগায়, আর সেই কারণে তার বাইরের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না।

শূন্যপথে জিনিস পড়ে কিভাবে ?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব জিনিসই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব জিনিসকে আকর্ষণ করছে। এরই নাম মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ। যে নামই দেওয়া হোক না কেন, রহস্যময় এই আকর্ষণী শক্তির প্রত্যেকেরই মনে ধরার মত বা খা আজও কেউ হাজির করতে পারে নি ; গ্যালিলিও, নিউটন আর আইনস্টাইন এই তিনজনের গল্পটা শুনলেই তা বোঝা যাবে।

এই মহাকর্ষের দরুনই যে কোনো জিনিস শূন্যের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়ে।

গ্যালিলিওর জন্ম ১৫৬৪ সালে, মৃত্যু ১৬৪২ সালে। তিনিই প্রথম মহাকর্ষকে মাপবার প্রয়াস পান—তাঁর আগে এ চেষ্টা কেউ করেনি।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অথবা ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি আর অভিকর্ষণ শক্তি অথবা ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশনের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। যে আকর্ষণ শক্তি দিয়ে পৃথিবী অবিরত সব বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে টানছে, তার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব বস্তুই পরস্পর পরস্পরকে টানছে, একে বলা হয় অভিকর্ষণ শক্তি।

গ্যালিলিও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিয়ে গবেষণা করার আগে পর্যন্ত সবার বিশ্বাস ছিল, উঁচু থেকে যখন কোনো জিনিস এসে মাটিতে পড়ে, তখন সেই পড়ার গতিবেগটা নির্ভর করে জিনিসটার ও্রনের ওপর।

পিসা বলে একটা জায়গায় যে হেলে পড়া মিনারটি আছে, তার মাথা থেকে একটার পর একটা বস্তু ধরণীর উদ্দেশে নিক্ষেপ করে গ্যালি-লিওই প্রথম হাতেনাতে দেখিয়ে দিলেন যে ভারী জিনিস আর হাল্কা জিনিস একসঙ্গে উঁচু থেকে ছেড়ে দিলেও মাটিতে পৌঁছোচ্ছে একই সময়ে এবং এরা পড়ছে যে শক্তির টানে, তারই নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

আরও একটা মজার এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন গ্যালিলিও। ঢালু জায়গা দয়ে খুব আস্তে একটা বল গড়িয়ে দিয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে বলটার অবস্থান নির্ণয় করার জন্যে। উনি দেখলেন, যে সময় ধরে বলটা গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে, সেই সময়ের সমানুপাতে বলের গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ, গড়িয়ে নামার প্রথম সেকেণ্ডে বলটার গতিবেগ যা ছিল, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে গতিবেগ হয়েছে তার দ্বিগুণ, তৃতীয় সেকেণ্ডে তিনগুণ, এইভাবে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে গতিবেগ বেড়ে গিয়েছে আনুপাতিক হারে।

উনি আরও দেখলেন, যতটা সময় ধরে বলটা পরিভ্রমণ করছে, দূরত্বটা বাড়ছে সেই সময়ের বর্গফল অনুসারে। (বর্গফল মানে একই সংখ্যাকে সেই

সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যা হয়, তাই ; অর্থাৎ ২×২=৪ ; ২য়ের বর্গফল ৪। এই হিসেবে ছ'সেকেণ্ড পরে বলটার ভ্রমণপথ দেখা গেল প্রথম সেকেণ্ডের অন্তে যা ছিল ঠিক তার দু-গুণ ; তিন সেকেণ্ড পরে তিনগুণ, এই ভাবে বাড়তে থাকে ভ্রমণ পথ।

অভিকর্ষণ শক্তির ওপরে এর পরেই বিরাট আবিষ্কার করলেন স্যার আইজাক নিউটন। নিউটন ধরে নিলেন, যে-শক্তি সব জিনিসকেই পৃথিবীর দিকে টানছে, তা কমে যাচ্ছে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ইনি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা যা দেখলেন, তা থেকেই পাওয়া গেল নিউটন্‌স্‌ল অফ গ্র্যাভিটেসান—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিকর্ষ শক্তি কি আইনে চলছে, তা আবিষ্কার করলেন নিউটন সাহেব। এই আইনের মোদ্দা ধারণাটা হল এই: পরস্পরকে টানছে এমনি দুটো বস্তুর একটার মাস্‌ অথবা ভর (কতখানি বস্তু আছে, সেই পরিমাণ) যদি দু-গুণ করা যায়, অভিকর্ষ শক্তিও তাহলে দু-গুণ বেড়ে যাবে ; কিন্তু এই দুই বস্তুর মাঝের দূরত্ব যদি দু-গুণ করা যায়, তাহলে শক্তিটা যা ছিল তার চারভাগের একভাগ হয়ে যাবে।

'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কী ?'—এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন দেশ-কালের (স্পেস টাইম) চতুর্মাত্রিক আকারের (ফোর ডাইমেনশনাল শেপ) পরিপ্রেক্ষিতে ; গ্র্যাভিটি শক্তিটা এই দেশ-কালের চতুর্মাত্রিক আকারের জন্যেই হচ্ছে। তত্ত্বটা অতিশয় জটিল এবং এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হলে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক অনুশীলন দরকার। ওঁর সর্বশেষ তত্ত্ব অনুসারে অভিকর্ষের এই 'ফিল্ড' (ক্ষেত্র) ইলেকট্রিক, ম্যাগ-নেটিক আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু মহাকর্ষ শক্তিটা যে আসলে কী, এই প্রশ্নের প্রত্যেকেরই সন্তোষ উৎপাদান করার মত ব্যাখ্যা আজও যে কেউ এগিয়ে দিতে পারেন নি, এ কথা বলা যায়। আইনস্টাইনের এই সর্বশেষ তত্ত্ব নিয়ে অনেক কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচিত হয়েছে এই কারণেই। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে অব্যাখ্যাত হেরফের ঘটলেই নাকি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উধাও হতে পারে। জীবজন্তুর বুদ্ধিবৃত্তিও অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যেতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাধ্যাকর্ষণের সঠিক সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না জানলেও আমরা জেনেছি যে ত্বরণ বা আকসিলারেশন (গতিবেগ বৃদ্ধি) যখন অভিকর্ষের জন্যে ঘটে, তখন তা সেকেণ্ডে ৩২ ফুট। তার মানে, কোনো বস্তু শূন্য দিয়ে পড়বার সময়ে সেকেণ্ড পিছু প্রতি সেকেণ্ডে ৩২ ফুট গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। এক সেকেণ্ড শেষ হলেই দেখা যায় সেকেণ্ডে ৩২ ফুট গতিবেগে পড়ছে ; দু-সেকেণ্ড শেষ হলে

দেখা যায়, সেকেণ্ডে ৬৪ ফুট গতিবেগে পড়ছে; এই ভাবেই সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বাড়তে থাকে গতিবেগ। প্রথম সেকেণ্ডের শেষে পড়ন্ত বস্তু ১৬ ফুট নেমে আসবে; দু-সেকেণ্ডের শেষে ৬৪ ফুট; তিন সেকেণ্ডের শেষে ১৪৪ ফুট।

ছায়াপথ আসলে কী?

আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত যেন মণিমাণিক্য-খচিত বিশাল একটা পটি ঝিলমিল করে প্রতি রাত্রে। এরই নাম ছায়াপথ—ইংরেজিতে মিল্‌কি-ওয়ে। সম্ভবতঃ মিল্‌কি-ওয়ের মত এত রহস্যাবৃত আর আশ্চর্য-দর্শন জিনিস আকাশে বোধ হয় আর কোথাও নেই। একালের মত পুরাকালের মানুষও আকাশের এই বিচিত্র জমকালো ঝিলমিলে দৃশ্যের পানে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত, অভিভূত হত সৌন্দর্য দেখে। কিন্তু মিল্‌কি-ওয়ে বলতে সঠিক কি বোঝায়, তা জানত না বলেই অনেক অদ্ভুত আর সুন্দর ব্যাখ্যা হাজির করেছিল আকাশ-বিস্ময় এই ছায়াপথ সম্পর্কে।

যেমন ধরো, প্রথম দিকের খৃষ্টানরা ভেবে নিয়েছিল, ছায়াপথ হল আসলে পরীদের যাতায়াতের পথ। এই পথের শেষেই রয়েছে স্বর্গ। পরীরা ছায়াপথ বেয়ে উড়ে যায় স্বর্গে। স্বর্গের খোলা দরজা বলা যায় এই ছায়া-পথকে। তাই মর্তো বসে উঁকিঝুঁকি মারলে দেখা যায় স্বর্গের স্বর্গীয় রূপের খানিকটা, অনন্ত বিস্ময়ের যৎ-সামান্য।

একালে কিন্তু ছায়াপথ সম্পর্কে অনেক তথ্যই আমরা জেনে ফেলেছি। বিস্ময়বোধ কি তার ফলে তিরোহিত হয়েছে? মোটেই না। ঠিক আগের মতই মানুষ এখনো বিপুল বিস্ময়বোধে মূক হয়ে যায় ছায়াপথের সীমাহীন সৌন্দর্য দেখে। এক কালে 'মনগড়া' ধারণার পর ধারণা সৃষ্টি করে যে বিস্ময়বোধকে জাগ্রত করা হয়েছিল, আজকের ঘটনার পর ঘটনা দিয়েও সেই বিস্ময়বোধকে বিন্দুমাত্র অপসারিত করা যায় নি। ছায়াপথ এমনই বিস্ময়কর, এমনই রহস্যাবৃত!

আমাদের এই গ্যালাক্সি বা ছায়াপথটা অনেকটা হাতঘড়ির আকারে নির্মিত—একাধারে গোল আর চ্যাপ্‌টা। গ্যালাক্সি বা বিপুল এই জ্যোতিষ্ক-সমাবেশের ঊর্ধ্বে যদি উঠতে পারো, তাহলে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখবে ঠিক যেন অতিকায় ঘড়ি দেখেছো পায়ের নীচে। কিন্তু আমরা রয়েছি গ্যালাক্সির ভেতরে; তাই ওপরের দিকে তাকালে 'ঘড়ি'টার কিনারাই দেখতে

পাই। তাই দেখি কিনারা-টা যেন বেঁকে ঘিরে রয়েছে আমাদের। এবং যেহেতু এর মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি তারকা, ছায়াপথকে ঝিলমিলে রত্ন-খচিত পটির মতই মনে হয় আমাদের চোখে।

তুমি কি জানো, গ্যালাক্সিতে কম করেও ৩,০০০,০০০,০০০ (তিন শ কোটি) তারকা আছে? গ্যালাক্সির সাইজ বা আয়তন সম্বন্ধে একটু ধারণা দেওয়া যাক। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে আট মিনিট। গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থল থেকে সূর্যে আলো পৌঁছোতে লাগে প্রায় ২৭,০০০ বছর!

চাকার মতই কেন্দ্রকে মাঝখানে রেখে পাক খাচ্ছে গ্যালাক্সি। আমরা গ্যালাক্সির যেখানে আছি, সেই অবস্থান থেকে এক পাক দিতে সময় লাগে ২০০,০০০,০০০ বছর, অর্থাৎ বিশ কোটি বছর!

খসে-পড়া তারা আসলে কী?

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ 'খসে-পড়া তারা'দের দেখেছে আর অবাক হয়ে শুধু ভেবেছে তারা কী এবং এসেছে কোত্থেকে। এক সময়ে কিন্তু এমন ধারণাও ছিল যে এরা নাকি আসে অন্য-অন্য জগৎ থেকে।

আজ কিন্তু আমরা জানি, খসে-পড়া তারা-রা আসলে 'তারা' বা নক্ষত্র-ই নয়। আমরা এখন এদের বলি 'উল্কা'। আকারে এরা ছোট, নিরেট শক্ত বস্তু। মহাশূন্যে দিয়ে ছুটে চলে, এবং আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও ঢুকে পড়তে পারে।

আমাদের বায়ুমণ্ডলে উল্কারা ঢুকে পড়লেই ওদের আমরা দেখতে পাই আলোর একটা আগুন-রেখা আকাশের বুকে এঁকে দিয়ে যায় বলে, বাতাসের ওপরের স্তরে ঘসটানি লেগে জ্বলতে থাকে ছুটন্ত উল্কারা।

আশ্চর্যের কথা, পৃথকভাবে প্রতিটা উল্কাকে যদি দেখা যায়, দেখা যাবে তাদের বেশীর ভাগই একেবারেই পুঁচকে—একটা আলপিনের মাথা যতবড় —ততবড়, মাঝে মাঝে অবিশ্যি বিরাট বিরাট উল্কাও খসে পড়ে—ওজন তাদের অনেক টন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে নেমে আসার সময়ে স্রেফ উত্তাপের ফলেই একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায় বেশীর ভাগ উল্কা। খুব বড়সড় উল্কার টুকরোগুলোই কেবল পৌঁছোয় পৃথিবীর জল আর মাটিতে। বেশীর ভাগই পড়ে জলে—কেননা পৃথিবীর ওপর দিকে তিন ভাগই তো জল, বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, রোজ হাজার হাজার এমনি উল্কা খসে পড়ছে পৃথিবীর মাটি আর জলে।

এককভাবে নিঃসঙ্গ উল্কাও আকাশে দেখা দিতে পারে এবং বস্তুতঃ যে কোনো দিকে ধেয়ে যেতে পারে। তবে, সাধারণতঃ উল্কারা আবির্ভূত হয় ঝাঁক বেঁধে—হাজার হাজার উল্কা থাকে সেই সব ঝাঁকে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে পাক দিচ্ছে বলে ঝাঁকবাধা উল্কাদের পরিক্রমণ পথে এসে পড়ে কখনো সখনো—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাদের প্রবেশ ঘটলেই বাতাসের ঘর্ষণে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে উপরিভাগ। আমরা আকাশে দেখি 'উল্কা বর্ষণে'র বিচিত্র দৃশ্য।

উল্কারা আসছে কোত্থেকে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করেন যে মাঝে মাঝে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে এই যে ঝাঁকবাঁধা উল্কারা এসে পড়ে পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমার পথে, এরা আসলে ভাঙা ধূমকেতুর টুকরো। কোনো ধূমকেতু ছুটতে ছুটতে ভেঙে গেলেই কোটি কোটি ভাঙা টুকরোগুলো মহাশূন্যের মধ্যে একই গতিপথে ছুটে চলে উল্কার ঝাঁক বা স্রোতের আকারে। নির্দিষ্ট কক্ষপথে ছুটে চলে এই ঝাঁক বাঁধা উল্কারা—ফিরে ফিরে আসে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। এমন এক ঝাঁক উল্কা ৩৩ বছর অন্তর পৃথিবীর পরিক্রমণ পথ মাড়িয়ে যায়।

উল্কার টুকরো পৃথিবীতে এসে পৌঁছোলে তাকে বলা হয় 'উল্কা পিণ্ড'। মাধ্যাকর্ষণের টানে উল্কা এসে ঠিকরে পড়ে পৃথিবীতে। অনেক বছর আগে, যিশুখৃষ্ট জন্মাবার ৪৬৭ বছর আগে, রোমানদের আমলে এমনি একটা উল্কা পিণ্ড আছড়ে পড়েছিল পৃথিবীতে। ঘটনাটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিল তৎকালীন রোমীয় ঐতিহাসিকরা এবং সাড়ম্বরে সেই কাহিনী লিখে গেছিলেন ইতিহাসে!

ধূমকেতু কী?

এমন একটা সময় গেছে, যখন ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটলেই মানুষের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত। তাদের ধারণা ছিল, ধূমকেতু হল আসন্ন সর্বনাশের সংকেত। অত্যন্ত অশুভ সংকেত। ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটলেই এরপর মহামারী, যুদ্ধ আর মৃত্যু এসে ছারখার করে দেবে দেশটা।

সেদিন আর এখন নেই। ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক খবরই এখন রাখি আমরা—যদিও সবটা নয়--অনেক হেঁয়ালিরই জবাব এখনো পাইনি। ধূমকেতু যখন প্রথম দেখা দেয়, তখন তাকে এক কণা আলোক বিন্দুর মতই দেখতে লাগে—যদিও সেই আলোক বিন্দুটির ব্যাস হাজার হাজার মাইল হলেও হতে পারে।

এক কণা এই আলোক বিন্দুটাই ধূমকেতুর 'মাথা' বা নিউক্লিয়স। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা টুকরো টুকরো নিরেট জিনিসের বিরাট ঝাঁক আর গ্যাসের সংমিশ্রণে সম্ভবতঃ গড়ে উঠেছে এই 'মাথা'। কিন্তু এই বস্তু বা উপাদানগুলো সর্ব প্রথম এল কোথা থেকে, আজও তা রহস্য।

ধূমকেতু যতই সূর্যের দিকে এগোতে থাকে, পেছনে একটা ল্যাজ দেখা যায়। সূর্যের প্রভাবে এলেই ধূমকেতুর নিউক্লিয়স থেকে খুব পাতলা গ্যাস আর অতিশয় মিহি বস্তু বেরিয়ে একটা ল্যাজের আকার নেয় 'মাথার' ঠিক পেছনেই। নিউক্লিয়সকে বেষ্টন করে থাকে ধূমকেতুর তৃতীয় অংশ। একটা প্রদীপ্ত বস্তুর মেঘ—যার ইংরেজী নাম 'কোমা'। দেড়লক্ষ কি তার-ও বেশী মাইল পর্যন্ত ব্যাস হয় এই 'কোমা'র।

ধূমকেতুর ল্যাজদের আকার আর আয়তন হয় অনেক রকমের। কেউ খাটো আর বেঁটে—ধ্যাবড়া চেহারার। কেউ লম্বা আর ছিপছিপে চেহারার। সাধারণতঃ লম্বায় এরা কম করেও দেড়লক্ষ মাইল। কখনো কখনো দশ কোটি মাইল। আবার কোনো কোনো ধূমকেতুর কোনো ল্যাজই নেই!

মাথাটা সূর্যের দিকে ফিরিয়ে যতই এগোতে থাকে ধূমকেতু, ততই গতিবেগ বাড়তে থাকে। তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। সূর্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সময়ে ল্যাজটা এগিয়ে যায় সামনের দিকে—মাথা চলে যায় পেছনে। এটা হয় সূর্যের আলোর চাপে। ধূমকেতুর মাথা থেকে যে অতি মিহি বস্তুকণাগুলো বেরিয়ে ল্যাজসৃষ্টি করেছে, তারা সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা আলোর চাপে, ঠিকরে যায় সামনের দিকে—সূর্য যেদিকে, ঠিক তার উল্টোদিকের গতিপথেই ফিরে যায় ল্যাজটা।

ফলে, সূর্যের কাছ থেকে সরে যাওয়ার সময়ে ধূমকেতুর ল্যাজকে যেতে হয় আগে আগে—যেতেই হয়—সূর্যের আলোর দাপট এমনই। সূর্য থেকে সরে যেতে যেতে একটু একটু করে স্পীড কমে আসে ধূমকেতুর, তারপর একসময়ে হারিয়ে যায় দৃষ্টিপথ থেকে। বহুবছর পর অদৃশ্য থাকে ধূমকেতুরা—অধিকাংশই অবশেষে ফিরেও আসে। সূর্যকে ঘিরে পরিক্রমা চালিয়ে যায় ধূমকেতুরা—কিন্তু একটা পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে লাগে দীর্ঘ সময়। যেমন ধরো, সূর্যকে এক পাক ঘুরে আসতে হ্যালির ধূমকেতু সময় নেয় প্রায় ৭৫ বছর।

বর্তমানে, বৈজ্ঞানিকরা প্রায় ১০০০ টা ধূমকেতুর ফর্দ তৈরী করেছেন।

কিন্তু এই সব নয়। আমাদের এই সৌরজগতেই আরও কয়েক লক্ষ ধূমকেতু নিশ্চয় আছে—দেখাও যায়নি আজ পর্যন্ত!

মঙ্গলগ্রহে প্রাণ থাকলেও থাকতে পারে মনে করেন কেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা?

তোমরা তো জান, বৈজ্ঞানিকরা এখন উঠে পড়ে লেগেছেন। এক্সপেরিমেন্টের পর এক্সপেরিমেন্ট করছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে কিনা জানতেই হবে। আগে খোঁজ নেওয়া দরকার নিজের ঘরের কাছে। এই সৌরজগতেই প্রথম অনুসন্ধান চালানো অনেক সোজা—মহাশূন্যের অন্যত্র খোঁজার চাইতে। সৌরজগতেই এমন একটা গ্রহ আছে, বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন সেখানে প্রাণ থাকলেও থাকতে পারে—সৌরজগতের আর কোথাও প্রাণের আবির্ভাব আছে কিনা, সে কথা পরে। কিন্তু একদম প্রতিবেশী এই গ্রহটির নাম মঙ্গলগ্রহ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত গ্রহ থাকতে এঁদের নজর মঙ্গলগ্রহের ওপরেই বা পড়ল কেন? মঙ্গলগ্রহকে আমাদের এই পৃথিবী গ্রহেরই এক রকম যমজ ভাইয়ের মত ধরে নেওয়া হয়েছে। সূর্যের দিক থেকে এলে পৃথিবীর পরের গ্রহই হল এই মঙ্গলগ্রহ। পৃথিবীর যা ব্যাস, তার প্রায় অর্ধেক ব্যাস মঙ্গলগ্রহের। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে দু'বছরের একটু কম সময়ে। মঙ্গলগ্রহের দিন প্রায় পৃথিবীর দিনের মতই সমান লম্বা।

মঙ্গলগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা এমন কতকগুলো জিনিস লক্ষ্য করেছেন যা কিন্তু মঙ্গলে প্রাণের সম্ভাবনার কথাই মাথার এনে দেয়। সবার আগেই দেখো মঙ্গলের যে সব ঋতু রয়েছে তা পৃথিবীর মতই। বস্তুতঃ, মঙ্গলে ঋতু পরিবর্তন ঘটে। গাঢ় রঙের মঙ্গল পৃষ্ঠেরও যেন পরিবর্তন ঘটে। জায়গাগুলো আরও গাঢ় হয় বসন্ত আর গ্রীষ্মকালে, রঙ পালটে যায় নীলচে সবুজ থেকে হলদেতে। একী উদ্ভিত জীবনের লক্ষণ?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আরও বিশ্বাস, মঙ্গলের আবহমণ্ডলে নিশ্চয় খানিকটা জলীয় বাষ্প আছে—প্রাণকে টিঁকিয়ে রাখতে গেলে যা প্রয়োজনে লাগলেও লাগতে পারে! এ ছাড়াও ১৮৮৭ সালে ইটালির জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিও ভান্নি শিও-পারেল্লি বললেন, তিনি নাকি মঙ্গল পৃষ্ঠে এমন সব দাগ দেখেছেন যা খালের মত দেখতে। শুনে তো বৈজ্ঞানিকরা হতভম্ব! তবে কি মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা মেরু অঞ্চলের বরফ এলাকা থেকে মরু অঞ্চলের ঊষর এলাকায় জল নিয়ে যাওয়ার জন্যে কেটেছে লম্বা লম্বা খাল?

১৯৭৬ সালে আমেরিকার ভাইকিং মহাকাশ অভিযান প্রকল্পের দুটি মহাকাশ যান নেমেছিল মঙ্গলের মাটিতে, মহাকাশযানের মধ্যে যে সব যন্ত্রপাতি ছিল আপনা থেকেই তারা আশপাশের মাটি খুঁজে দেখে প্রাণের চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা—ফলাফল রেডিও মারফৎ পাঠায় পৃথিবীতে। জানা যায়, মঙ্গলের মাটিতে হয় জীবাণু আছে অথবা মাটিটা অতিশয় অস্বাভাবিক রকমের—পৃথিবীর মাটির মত নয় মোটেই। মঙ্গলে যদি প্রাণ আদৌ থাকে তাহলে তা হবে অত্যন্ত সরল ধরণের প্রাণ।

মেঘ এত রকমের কেন?

মেঘ তৈরী হয় কি করে আগে তা জানা যাক, কেমন? গরম বাতাস আর্দ্রতা ভারাক্রান্ত অবস্থায় উঠে যায় আকাশে। বিশেষ একটা উচ্চতায় পৌঁছোলেই গরম বাতাস ঠাণ্ডা মেরে যায়। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জল বাষ্পর আকারে অত আর্দ্রতা আর ধরে রাখতে পারে না। বাড়তি আর্দ্রতা হয়ে যায় ছোট ছোট জলের ফোঁটা অথবা বরফ কণা, এবং সৃষ্টি হয়ে মেঘের।

দুটো পৃথক মেঘ কখনেই হুবহু এক নয় এবং ক্রমাগত তাদের আকার পালটাচ্ছে। বিভিন্ন উচ্চতা আর তাপমাত্রায় মেঘ সৃষ্টি হয় বলেই আমরা পাই এত বিভিন্ন রকমের মেঘ। উচ্চতা আর তাপমাত্রা অনুসারে মেঘের মধ্যেকার বস্তু কণারও রকমফের ঘটে থাকে।

সবচেয়ে উঁচু মেঘদের বলা হয় 'নকটিলুসেন্ট' মেঘ। এরা ৩০ থেকে ৫০ মাইল উঁচুতে পর্যন্তও থাকতে পারে! উচ্চতা হিসেবে এর নিচের থাকে যারা থাকে তাদের নাম 'ন্যাকরিয়াস' অথবা 'মাদার অফ পার্ল' মেঘ। (মাদার অফ পার্ল হল ঝিনুকের ভেতরকার শক্ত চকচকে রামধনু পদার্থ।) এরা থাকে ১২ থেকে ১৮ মাইল উঁচুতে। ভারী পাতলা, অতি সুন্দর, বহুরঙা মেঘ এরা। ধুলো বা জল বাষ্প দিয়ে গড়া। সূর্য অস্ত গেলে, রাত্তির বেলা অথবা সূর্য ওঠার আগেই শুধু এদের দেখা যায়।

এরও নিচের থাকের মেঘেরা থাকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৫ কি তারও বেশী মাইল উঁচুতে। এদের নাম 'সিরাস' মেঘ, 'সিরোসট্রেটাস' মেঘ এবং 'সিরোকিউমুলাস' মেঘ। সিরাস মেঘেরা পালকের মত আর সুতোর মত, সিরোস্ট্রেটাস-রা পাতলা সাদাটে চাদরের মত, আর সিরোকিউমুলাসরা ছোট ছোট গোল আকারের—আকাশে এরা 'ম্যাকারেল' প্যাটার্ণ রচনা করে। (ম্যাকারেল একরকম সামুদ্রিক মাছ। লম্বায় ১২ থেকে ১৮ ইঞ্চি। রঙ

নীলচে সবুজ। ডোরাকাটা পিঠ, রুপোলী পেট।) এই সব কটা মেঘই কিন্তু পুঁচকে পুঁচকে বরফকণা দিয়ে তৈরী।

এর নিচের মেঘরা তৈরী হয় জলকণা দিয়ে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে যারা থাকে তাদের নাম 'অল্টোকিউমুলাস' মেঘ। উচ্চতা—পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে দুই থেকে চার মাইল। সিরোকিউমুলাস মেঘের চাইতে বড় বড় গোল আকারের মেঘ দিয়ে গঠিত। একই উচ্চতায় থাকে অলট্রেসট্রেটাস মেঘ—মাঝে মাঝে এই মেঘ সিসের চাদরের মত ধূসর ঘোমটা দিয়ে সারা আকাশকে এমন ভাবে ছেয়ে দেয় যে বেচারা চাঁদ সূর্যকেও ম্যাড়মেড়ে আলোককণার মত দেখায়।

এরও নিচে প্রায় মাইল খানেক উঁচুতে, থাকে স্ট্র্যাটোকিউমুলাস মেঘ ; আয়তনে বৃহৎ এবং পুঞ্জাকার। একই উচ্চতায় থাকে বৃষ্টির মেঘ নিমবোসট্রেটাস—পুরু, কালো এবং আকারের বালাই নেই। তারও নিচে প্রায় পৃথিবীর ওপরে যে মেঘ ঝুলে থাকে বললেই চলে এদের নাম স্ট্র্যাটাস মেঘ। উচ্চতা মাটি থেকে মাত্র দু'হাজার ফুট, কি তারও কম। এ মেঘ উঁচু অঞ্চলের কুয়াশার চাদর ছাড়া আর কিছুই নয়। এছাড়া অন্য দু'রকমের মেঘদের নাম কিউমুলাস আর কিউমুলোনিম্বাস্ ; এরা হল গিয়ে বৃহৎ, স্থূল, 'কলিফ্লাওয়ার' মেঘ—যারা আনে ঝড় আর বজ্রপাত।

নীহারিকা কাকে বলে ?

বইতে যদি ইস্ক্রুপের মত বিরাট প্যাঁচালো, আর ঘূর্ণিপাক আর মেঘের মত নীহারিকার ছবি কোথাও কখনো দেখে থাকো, ভেবো না আকাশের দিকে তাকালে ঐরকম চেহারার নীহারিকা তুমি দেখতে পাবে। বেশীর ভাগ নীহারিকা এত অস্পষ্ট যে টেলিস্কোপ ছাড়া শুধু চোখে দেখাই যায় না। নীহারিকাকে ইংরেজীতে বলে নেবুলা। নেবুলা শব্দটা কিন্তু ল্যাটিন শব্দ, মানে—কুয়াশা। প্রথম যখন ছোট টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে নীহারিকাদের দেখা গিয়েছিল, তখন তাদের মনে হয়েছিল কুয়াশার মতই।

মূলতঃ দু'রকমের নীহারিকা আছে, ছায়াপথের মধ্যে আর ছায়াপথের বাইরে। আমাদের নিজেদের এই ছায়াপথের মধ্যে যে সব নীহারিকা রয়েছে, ইংরেজীতে তাদের বলা হয় গ্যালাকটিক নেবুলা। এরা ধুলো আর গ্যাস দিয়ে গড়া। এই ছায়াপথের বাইরের নীহারিকাদের ইংরেজীতে বলে এক্সট্রা গ্যালাকটিক নেবুলা (এক্সট্রা মানে এখানে বাইরে)। এদের বেশীর ভাগ অঞ্চলই তারকায় গড়া।

গ্যালাকটিক নেবুলারা সংখ্যায় দু-হাজারেরও কম। তার মানে দাঁড়াল এই : মানুষ আজ পর্যন্ত যত নীহারিকার খবর পেয়েছে, তাদের বেশীর ভাগ আমাদের এই গ্যালাক্সির (ছায়াপথ) বাইরে। সংখ্যায় তারা কত ? যদ্দুর জানা গেছে, ছায়াপথের বাইরে অসীম অনন্ত মহাশূন্যে এরা ছড়িয়ে আছে লাখে লাখে।

আমাদের ছায়াপথের বাইরের এই এক্সট্রা-গ্যালাকটিক নেবুলাদের অনেক সময়ে বলা হয়, দ্বীপময় ব্রহ্মাণ্ড (আয়ল্যাণ্ড ইউনিভার্স) অথবা 'গ্যালাক্সিস্' অথবা ছায়াপথ সমূহ। তার মানে এই যে কেউ যদি সেখান থেকে আমাদের নিজেদের এই ছায়াপথের দিকে তাকিয়ে থাকত, তাহলে এই ছায়াপথকেও দেখত নীহারিকার আকারে।

এক্সট্রা-গ্যালাকটিক নীহারিকাদের চেহারা অনেক রকমের। কেউ এলোমেলো আকারের, কেউ উপবৃত্ত আকারের। সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় যে আকারটা দেখা যায়, তা ইস্ক্রুপের মত পেঁচালো আকার। আমাদের নিজেদের এই ছায়াপথের মতই পেঁচালো নীহারিকাদের কেন্দ্রস্থলে একটা নিউক্লিয়স (কেন্দ্রীন) থাকে। এই কেন্দ্রীন থেকেই ইস্ক্রুপের মত পেঁচালো আকারে বেরিয়ে যায় নীহারিকার বাহু। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে রয়েছে পেঁচালো নীহারিকা অ্যানড্রোমেডা। আজ পর্যন্ত যত নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল। সূর্য যত আলো দেয়, তার প্রায় দেড়শ কোটি গুণ বেশী আলো দেয় একা অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা।

সমুদ্র নোনতা কেন ?

এই পৃথিবীর এক একটা রহস্য মাঝে মাঝে এমন মাথা গুলিয়ে দেয় যে মহাধাঁধায় পড়তে হয়। এই সব রহস্যের কোনো মীমাংসা আজও হয় নি। যেমন ধরো, সমুদ্রে নুনের অস্তিত্ব। নুন সমুদ্রে গেল কি ভাবে ?

সোজা কথায় এর জবাব এই—আমরা জানিনা সমুদ্রে নুন গেল কিভাবে। এইটুকুই শুধু জানি যে যেহেতু নুন জলে গুলে যায়। তাই বৃষ্টির জলের সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের নুন ক্রমাগত জলে গুলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে।

কিন্তু মহাসমুদ্রে বিপুল পরিমাণ নুনের হিসেব এ থেকে পাওয়া যায় বলে আমাদের জানা নেই। সবক'টা মহাসমুদ্র শুকিয়ে গেলে যত নুন পাওয়া যাবে তা দিয়ে ১৮০ মাইল উঁচু আর একশ মাইল চওড়া একটা পাঁচিল তৈরি করা যাবে এবং সেই পাঁচিল নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীটাকে একটা বেড় দিয়ে

আনতে পারবে! অন্যভাবে যদি বলা যায়, সবক'টা মহাসমুদ্র শুকিয়ে গেলে যতটা পাথুরে নুন পাওয়া যাবে, তা দিয়ে আজকের ইউরোপ মহাদেশের সমান ১৫টা মহাদেশ সৃষ্টি হবে।

আমরা রোজ যে নুন ব্যবহার করি, তা আসে সমুদ্রের জল, অথবা পাথুরে নুন থেকে। সাগরের জলে নুনের পরিমাণ একশ ভাগে তিন থেকে সাড়ে তিন ভাগ। ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগরের মত বদ্ধ সাগরে খোলা সমুদ্রের চেয়ে বেশী নুন থাকে। ৩৪০ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত মৃত সমুদ্র (ডেড সী) তে নুন আছে ১১৬০ কোটি টন!

গড়ে, এক গ্যালন সমুদ্রর জলে নুন থাকে প্রায় সিকি পাউণ্ড। লক্ষ লক্ষ বছর আগে সমুদ্রের জল উবে যাওয়ার ফলেই পাথুরে নুনের স্তর পাওয়া যায় পৃথিবীর নানান অঞ্চলে। যেহেতু পাথুরে নুন তৈরী হতে গেলে সমুদ্রের জলের দশ ভাগকেই উবে যেতে হবে, এই হিসেবে অনুমান করে নেওয়া হয় আংশিকভাবে বদ্ধ সমুদ্র উবে যাওয়ার ফলেই পাথুরে পুরু স্তর গুলোর সৃষ্টি হয়েছে। এই সব সমুদ্রে টাটকা জল যে পরিমাণে ঢুকেছে, তার চেয়ে বেশী পরিমাণে সমুদ্রের জল উবে গেছে—ফলে পড়ে থেকেছে পাথুরে নুনের স্তর।

বেশীর ভাগ বাজারের নুন আসে পাথুরে নুন থেকে। নুনের স্তরের মধ্যে কূপ খুঁড়ে নিয়ে তার মধ্যে হু-উ-উ-স্ করে নল দিয়ে জল পাম্প করে দেওয়া হয়, জলে গুলে যায় নুন এবং সেই নুন গোলা জল অন্য একটা পাইপ দিয়ে টেনে তোলা হয় ওপরে। চালু পদ্ধতি এইটাই।

কোন্ সমুদ্র সব চেয়ে গভীর?

অনেক দিক দিয়েই সমুদ্র আজও বিশ্ববাসীর কাছে একটা মস্ত প্রহেলিকা। সমুদ্রগুলোর বয়স কত, তা কেউ জানি না। তবে এটা নিশ্চিত মনে হয় যে পৃথিবী যখন গড়ে উঠেছে তখন সমুদ্ররা ছিল না।

আজ কিন্তু মানুষ সমুদ্রের তলায় গিয়ে অভিযান চালাচ্ছে সমুদ্র সম্বন্ধে সব কিছু জানবার জন্যে। ১২,০০০ ফুট নিচে সমুদ্রের মেঝে ঢেকে রয়েছে একটা নরম চোঁয়ানো কাদা। ক্ষুদে ক্ষুদে সামুদ্রিক প্রাণীদের চুনযুক্ত কংকাল দিয়ে তৈরী এই সমুদ্র-তলদেশ। সমুদ্র যেখানে চার মাইলেরও বেশী গভীর, রীতিমত গভীর এবং ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরা, সেখানকার সমুদ্র তলদেশ ছেয়ে রয়েছে মরচে রঙের এক রকম মিহি চোঁয়ানো কাদায়—এ কাদার নাম 'লাল কাদামাটি'। পুঁচকে প্রাণীদের কংকাল, ক্ষুদে উদ্ভিদের আবরণ আর আগ্নেয় ভস্ম দিয়ে গড়ে উঠেছে এই 'লাল কাদা মাটি'।

শব্দ তরঙ্গ পাঠিয়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয় আজকাল। শব্দ তরঙ্গ সমুদ্রের তলদেশে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে ফিরে আসে ওপরে। পাঠানো থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়টা মেপে নিয়ে তাকে অর্ধেক করলেই যে সময়টা পাওয়া যায়, তা থেকে বার করে নেওয়া হয় সেখানকার গভীরতা।

এই মাপের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমুদ্রের গড়পরতা গভীরতার একটা ভাল রকম ধারণাই আজকাল আমরা করতে পারছি—সেই সঙ্গে পাচ্ছি সব চেয়ে গভীর অঞ্চলটা ঠিক কোনখানে। গড়পরতা গভীরতার দিক দিয়ে সবচেয়ে গভীর সমুদ্র হল প্রশান্ত মহাসাগর। ১৪,০৪৮ ফুট গভীর এই সমুদ্র। গড় গভীরতায় এর পরের সমুদ্রই হল ভারত মহাসাগর (১৩,০০২ ফুট)। আটলান্টিক হল তৃতীয় গভীর সমুদ্র যার গড় গভীরতা ১২,৮৮০ ফুট। বাল্টিক সমুদ্র সবচেয়ে অগভীর যার গড় গভীরতা মোটে ১৮০ ফুট!

সবচেয়ে গভীর সমুদ্র অঞ্চল মাত্র একটাই পাওয়া গেছে এই ভূ-গোলকে এবং সে অঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরে—গুয়ামের কাছে (৩৫,৪০০ ফুট)। এর পরেই গভীর অঞ্চল হল পুয়েরতো রিকোর পাশে আটলাণ্টিক মহাসাগরে (৩০,২৪৬ ফুট)। আবার দেখো, সবচেয়ে বৃহত্তম সাগর হয়েও হাডসন উপসাগরের গভীরতম অঞ্চল মাত্র ৬০০ ফুট!

কোন্ কবির নামের মানে 'তাঁবু নির্মাতা'?

শুধু যে তাঁর নামের মানেই 'তাঁবু নির্মাতা' তা নয়—ভদ্রলোক অংকে আর জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হয়েও পৃথিবী বিখ্যাত এবং ঐতিহাসিক পুরুষ হয়ে দাঁড়ালেন শুধু মাত্র কবি হিসেবে। আজকে ওমর খৈয়ামের 'রুবাই'য়ের নাম জানে না, সভ্য দেশে এমন মানুষ বিরল। কিন্তু ক'জন জানে যে তিনি ছিলেন আদতে গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী?

৮০০ বছরের আগে পারস্য দেশে থাকতেন ওমর খৈয়াম—মারা যান ১১২৩ সাল নাগাদ। 'খৈয়াম' শব্দটার মানে 'তাঁবু নির্মাতা'—সম্ভবত তাঁর বাবার পেশা থেকেই এ নাম তিনি পেয়েছিলেন। ওমর খৈয়াম কিন্তু নিজের পেশায় সুপণ্ডিত হয়েও নিয়তির আমাঘ নির্দেশে বিশ্ববিখ্যাত হলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের জন্যে নয়—'রুবাইৎ'য়ের জন্যে। এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড নামে এক প্রতিভাধর অনুবাদক দীর্ঘকাল পরে তাঁর এই রুবাইৎ আপন খেয়ালে অনুবাদ করেন ইংরেজিতে—বৃটেনের ঘরে ঘরে নাম পৌঁছে যায় ওমর খৈয়ামের।

পারস্য রাজসভায় চাকরীর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ওমর খৈয়ামকে। উনি কিন্তু সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে তার বদলে গ্রহণ করলেন একটা

বার্ষিক বেতন এবং অধিকাংশ সময় ব্যয় করে চললেন বিজ্ঞান চর্চায়। তাঁর লেখা বীজগণিত সর্ব প্রথম ফরাসী ভাষায় অনূদিত এবং সম্পাদিত হয় ১৮৫১ সালে। পুরো উনবিংশ শতাব্দী ধরে সাড়া ইউরোপে ওমর খৈয়াম সম্পর্কে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'রুবাইৎ' অনুদিত হয় রুশীয় ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষায়।

না কেঁদে পেঁয়াজ ছাড়ানো যায় ?

কেন যাবে না। পেঁয়াজ ছাড়াতে গেলে হাসি আসে না—কান্নাই আসে কেবল, কেন আস্বে, সেটা জানা থাকলেই না কেঁদে পেঁয়াজ ছাড়ানো যায়।

অ্যানাইল নামে ভারী উদ্বায়ী (ভোলাটাইল) একটা তেল থাকে পেঁয়াজের মধ্যে। খোসা ছাড়ালেই এই তেল উবে যেতে থাকে, চোখে লাগে—জল ঝরায়, নাকে পাই বিচিত্র পেঁয়াজের গন্ধ। জলের মধ্যে ডুবিয়ে পেঁয়াজ ছাড়ালেই কিন্তু অ্যানাইলের জারিজুরি খতম! উদ্বায়ী তেল আর চোখ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। কান্নাও আসে না।

হোমিওপ্যাথিতে কাঁচা সর্দি হলে অ্যালিয়াম সিপা নামে একটা ওষুধের বিধান আছে। নাম শুনেই কি বোঝা যাচ্ছে না পেঁয়াজ থেকে তৈরী এই ওষুধ?

কোন রাজা বাবাকে মেরে মা'কে বিয়ে করেছিল ?

ইডিপাস। গ্রীক পুরানের নায়ক, সম্ভবত সবচেয়ে বিয়োগান্তক নায়ক। প্রাচীন গ্রীসে থিবেস্ দেশের রাজা ছিলেন ইডিপাস। এঁর বাবা দৈববানী শুনেছিলেন যে তিনি নিহত হবেন নিজের ছেলের হাতে। ছেলে তখন সবে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কিন্তু প্রাণের ভয়ে রাজা সেই আঁতুড়ে ছেলেরই দু'পায়ে অনেক গুলো ছেঁদা করলেন, কষে বাঁধলেন ক্ষতবিক্ষত পা দুটো, তারপর এমন একটা পাহাড়ের মাথায় ফেলে এলেন যাতে দুদিনেই ছেলে অক্কা পায়।

কিন্তু এক মেষপালকের দয়ায় বেঁচে গেল ছেলেটা অকাল মৃত্যুর হাত থেকে। নিয়তির লিখন খণ্ডাবে কে? যেহেতু ছেলেটায় পা ফুলে ঢোল হয়েছিল, তার নাম রাখা হল ইডিপাস—গ্রীক ভাষায় যার মানে 'ফোলা পা'। কোরিনথ-এর রাজার কাছে বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে তিনি তো মহাখুশী।

অপুত্রক ছিলেন রাজামশায়। নিজের ছেলের মত মানুষ করতে লাগলেন ছেলেকে। ইডিপাস বড় হওয়ার পর একদিন দৈববাণী শুনল যে নিজের বাবাকে মেরে মা-কে বিয়ে করাই লেখা আছে তার কপালে। শিউরে উঠে দেশ ছেড়ে পালালো সে—কারণ ইডিপাস জানত কোরিন্‌থ্‌য়ের রাজা রাণীই তার প্রকৃত বাবা আর মা।

থিব্‌স্‌ যাওয়ার পথে রাস্তায় ঝগড়া হল এক রথ চালকের সাথে। রথে ছিল এক প্রৌঢ়। ইডিপাসকে রাস্তা ছেড়ে সরে যেতে বলেছিল রথ-চালক। ঝগড়া থেকে মারামারি বাধতেই ইডিপাস প্রাণ হরণ করল দুজনেরই। ফলে গেল দৈববানীর প্রথম অংশ; কেননা রথে বসেছিলেন ইডিপাসেরই বাবা।

প্রায় এই সময়েই থিব্‌সের আশে পায়ে ভারী পাজী আর ভয়ংকর এক দৈত্যের উৎপাত আরম্ভ হয়। দৈত্যটা যাকে পেত তাকেই একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করত। জবাব দিতে না পারলে তাকে খেয়ে ফেলত। সঠিক জবাব কেউ দিতে পারেনি, খাবারেরও কখনো অভাব হয়নি।

থিব্‌সের শূন্য রাজ-সিংহাসন আর বিধবা রাণীকে বউ হিসেবে দেওয়া হবে তাকেই যে এই পাজী নচ্ছার দৈত্যটাকে মারতে পারবে—এই ঘোষণা শুনেই ইডিপাস দৌড়োলো দৈত্য হনন করতে।

দৈত্যের নাম স্ফিংক্স। ইডিপাসকে দেখেই জিজ্ঞেস করলে, "বলো তো কোন্‌ জন্তু সকালে চার পায়ে হাঁটে, দুপুরে দুপায়ে হাঁটে, আর রাত্রে তিন পায়ে হাঁটে?"

ইডিপাস জবাব দিলে—'মানুষ। শৈশবকাল হল তার সকাল—তখন সে দুহাত আর দুপায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেয়। যৌবনকাল তার দুপুর—তখন সে দুপায়ে দাপিয়ে বেড়ায়। বার্ধক্য তার রাত্রি—তখন সে লাঠি নিয়ে ঠুক্‌ঠুক করে হাঁটে।" জবাব শুনেই তো খাদ টপকে পালাতে গিয়ে খতম হয়ে গেল স্ফিংস্কস!

ইডি াস তখন রাজা হয়ে বসল থিব্‌সের শূন্য রাজ-সিংহাসনে এবং বিয়ে করল বিধবা রাণী জোকাসটাকে। দুদিন যেতে না যেতেই প্লেগ মড়কে রাজ্য ছারখার হয়ে গেল। দৈববাণী শোনা গেল—রাজ্য বাঁচাতে হলে নিহত রাজার হত্যাকারীকে দেশ থেকে নির্বাসন দিতে হবে। একজন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষের কাছে এই সময়ে ইডিপাস জানল সেই ভয়ংকর সত্য—নিজের বাবাকে সে খুন করেছে, বিয়ে করেছে নিজের মাকে!

শিউরে উঠে নিজের দু চোখ উপড়ে এনেছিল ইডিপাস! অন্ধ অসহায়

অবস্থায় কন্যা অ্যান্টিগোনেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল যেদিকে দু-পা যায়!

সমুদ্র পৃষ্ঠের অনেক নিচের প্রাণী জগৎ টিঁকে আছে কি করে ?

এ রহস্য দীর্ঘদিন ভাবিয়েছে বিজ্ঞানীদের। নিতল সমুদ্রের তলদেশের প্রাণীরা খায় কী? কিছু প্রাণী অন্য প্রাণীকে খায় ঠিকই। কিন্তু মূলতঃ সাধারণ সামুদ্রিক খাদ্যটা মেঘের মত ভেসে বেড়ায় সমুদ্রের জলে। অসংখ্য আকার এবং প্রকারের সামুদ্রিক জীব এবং উদ্ভিদের সমষ্টি এরা। জীবন্ত বস্তুর বিপুল 'মেঘ' যেন—এদের উপাদান আয়তনে এতই ক্ষুদে যে মাইক্রোসকোপ দিয়ে না দেখলে শুধু চোখে দেখাই যায় না। সমুদ্রের স্রোতে অসহায় ভাবে এই বিপুল মেঘ ভেসে ভেসে বেড়ায় সমুদ্রের সর্বত্র—নিজেরা যেতে পারে না ইচ্ছেমত যেদিকে খুশী। সমবেতভাবে এই প্রাণী আর উদ্ভিদ-দের বলা প্লাঙ্কটন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্লাঙ্কটনদের খবর কেউ রাখত না। কিন্তু এখন জানা গেছে, এরাই হল মুখ্য এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ আহার্য যাদের অস্তিত্ব আছে বলেই সমুদ্রের অন্য সমস্ত প্রাণীরা টিঁকে আছে নিতল সমুদ্রেও।

সমুদ্রপৃষ্ঠ দিয়ে জাহাজে চড়ে যেতে যেতে যে কোন পর্যটকের মনে হতে পারে, এ যে দেখছি ধূ-ধূ সমুদ্র, নিষ্প্রাণ সমুদ্র, ঊষর সমুদ্র—প্রাণের চিহ্ন তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু পর্যটক মহাশয় যদি মিহি জাল ফেলে জলের মধ্যে আটকে থাকা 'গাদ'টা শক্তিশালী অণুবীক্ষণের নিচে রেখে পরীক্ষা করেন, সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করবেন অগুন্তি জীবন্ত প্রাণী-সম্পদকে।

তিনি দেখবেন জলজ উদ্ভিদ ডায়াটম-কে বিভিন্ন আকারে রত্নখচিত সূক্ষ্ম এবং বাহারি অলংকারের মত, দেখবেন পুঁচকে প্রাণী প্রোটোজোয়াকে খনিজ উপাদানে নির্মিত হরেক রকম খোলাসহ, দেখবেন বহুবিচিত্র প্রকারের অদ্ভুত শূককীটদের, দেখবেন ক্ষুদে ক্ষুদে কঠিন খোলার আবরণে ঢাকা চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি কবচী জীবদের এবং সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা পর্যন্ত চিংড়িমাছ জাতীয় প্রাণীদেরও। অগুন্তি প্রাণের এই সমবায়কেই এক কথায় বলা হয় প্লাঙ্কটন—যা এসেছে একটা গ্রীক শব্দ থেকে, মানে—রাস্তা ভুলে পথে বিপথে যাওয়া।

ডায়াটমদের সবচেয়ে বড় যে তার সাইজ লম্বায় মোটে এক ইঞ্চির একশ ভাগের এক ভাগ। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়, অণুবীক্ষণে দেখতে পাওয়া এই

উদ্ভিদ আর ক্ষুদে প্রাণীদের বলা হয় যথাক্রমে ফাইটোপ্লাঙ্কটন আর জুপ্লাঙ্কটন। হেরিং আর ম্যাকারেল মাছের ঝাঁক এই জীবন্ত ঝাঁকের পেছন পেছন চলে পেটভরে খাওয়ার জন্যে ; হাঙর এবং অন্যান্য বড় মাছেরা ভক্ষণ করে হেরিং আর ম্যাকারেলদের এবং এদের কেউ কেউ যায় তিমিদের উদরে। কিছু তিমি অবশ্য দানবিক স্কুইড খেতে বড় ভালবাসে, নিতল সমুদ্রে সব ক'টা বাহু ছড়িয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট মাপের স্কুইড যখন লড়তে আরম্ভ করে ৭০ টন ওজনের একটা তিমির সঙ্গে—দেড় হাজার ফুটের মধ্যে গোটা তল্লাট ফাঁকা হয়ে যায় দেখতে দেখতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিছু তিমি শুধু প্লাঙ্কটন ছাড়া আর কিছু খায় না। ঐ রকম বিরাট চেহারায় এত পুঁচকে খাবার? ফ্যানট্যাসটিক নয় কী ?

ঢেউ ওঠে কি করে ?

জলের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়ালে দেখা যাবে বাতাস না থাকলে জলে খুব অল্পই ঢেউ ওঠে, কিন্তু ঝড়ো বাতাসে ঢেউ ওঠে এন্তার।

এ থেকেই বোঝা যায়, ঢেউ ওঠে কেন। ওঠে স্রেফ বাতাসের জোরে। ঢেউয়ের মাধ্যমে শক্তি বা এনার্জির একটা বিশেষ রূপ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। ঢেউ শুরু করার জন্যে কিছু একটা শক্তি বা এনার্জি দরকার। জলের মধ্যে সেই এনার্জির জোগান দেয় বাতাস।

একটার পর একটা ঢেউ এগিয়ে যায় যখন, তখন তা দেখতে দেখতে মনে হয় জল যেন এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এক টুকরো কাঠকে জলে ভাসিয়ে দিলে দেখা যাবে, কাঠ এগিয়ে যাচ্ছে না—কিন্তু মনে হবে যেন জল এগিয়েই চলেছে। কাঠের টুকরো ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল ওপরে উঠবে আর নিচে নামবে। এগিয়ে যায় তখনই যখন বাতাস বা স্রোত তাকে ঠেলে দেয় সামনে।

জলের মধ্যে তাহলে কি ধরনের গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে, এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। জলের ঢেউ জল-কণিকার ওপর-নিচ নড়াচড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। নড়াচড়াটা এগিয়ে যায় তীরের দিকে—জল-কণিকা কিন্তু এগোয় না! যেমন ধরা যাক, একটা দড়িতে ঢেউ তুললে, ঢেউটা ওপর-নিচ ভঙ্গিমায় এগিয়ে যায় সামনে—তার মানে ওপর-নিচ নড়াচড়াটা এগিয়ে যায় সামনে—দড়ির কোনো কণা এগোয় না।

জলের ঢেউয়ের তলদেশ তীরের কাছাকাছি গিয়ে মাটি স্পর্শ করলেই ঘর্ষণের ফলে ঢেউয়ের গতিবেগ কমে আসে। ঢেউয়ের চুড়োটা তখনও যায়

এগিয়ে, তারপর ডিগবাজি খায়। একেই বলা হয় 'ব্রেকার'—তটভূমিতে বা প্রস্তরের ওপর যে বিশাল তরঙ্গ পড়ে ভেঙ্গে যায়।

যে এনার্জি ঢেউ সৃষ্টি করে, তীরের কাছে গিয়ে তা নিজেই ক্ষীণ হয়ে আসে। তীরের কাছে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেই টের পাওয়া যায় ঢেউ-য়ের এই এনার্জিকে!

জলের ঢেউয়ে, জল-কণিকারা চক্রাকার পথে পরিভ্রমণ করে; ঢেউয়ের ধাক্কায় ওপরে উঠে এগিয়ে যায় সামনে। তারপরেই মাধ্যা-কর্ষণের টানে নেমে গিয়ে পেছিয়ে আসে—ঠেলে ওঠা জলরাশি ফিরে আসে স্বাভাবিক সমতায়। এই ওপর নিচ নড়াচড়ার ফলেই ঢেউ এগিয়ে যায় সামনে।

ঢেউয়ের এক মাথা থেকে আরেক মাথার দূরত্বকে বলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (ওয়েভ লেন্থ), এবং একদম তলার পয়েন্টকে বলে 'ট্রাফ'।

ছ্যাঁকা লাগে কেন ?

গরম জিনিসে হাত দিলে যে ছ্যাঁকা লাগে এবং বেশ যন্ত্রণা হয়, এটা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিখতে হয় আমাদের সবাইকেই—বাচ্চা বয়স থেকে!

কিন্তু ছ্যাঁকাটা লাগে কেন? কেন অমন যন্ত্রণা হয় পোড়া জায়গায়? এক টুকরো তপ্ত লোহার অণুরা দারুণ দ্রুত কাঁপতে থাকে—সেকেণ্ডে সম্ভবতঃ দশ লক্ষ বার! তপ্ত লোহায় আঙুল ছোঁয়ালেই দ্রুত-কম্পিত লোহার পরমাণুরা আঙুলের চামড়ার পরমাণুতে এমন ভয়ংকর ঝাঁকুনি দেয় যে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠি আমরা। এরই নাম ছ্যাঁকা লাগা।

শুনে অবাক লাগছে নিশ্চয়। চামড়ায় যন্ত্রণায় অনুভূতি জাগ্রত করতে কত বেগে পরমাণুদের ছুটতে হবে, জানতে কৌতূহল হচ্ছে নিশ্চয়। একটু ধারণা দেওয়া যাক। বরফ গলার তাপমাত্রায় (যাকে মোটেই তপ্ত বলা চলে না), হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু সেকেণ্ডে ৫,৬০০ ফুট গতিবেগে সঞ্চরমান থাকে।

এ থেকেই আন্দাজ করা যায় নাকি তপ্ত অবস্থায় পরমাণুদের গতিবেগ?

দেশলাই কার আবিষ্কার ?

গুহাবাসী মানুষ চকমকি ঠুকে শুকনো পাতা জ্বালানোর চেষ্টা করে গেছে। হাজার হাজার বছর পরে রোমানরা এর বেশী খুব একটা এগোতে পারে নি। চকমকিতে চকমকি ঠুকে গন্ধক মাখানো কাঠের কুচি জ্বালি-

য়েছে, তার বেশী নয়। মধ্যযুগে চকমকিতে ইস্পাত ঠুকে শুকনো শ্যাওলা, পোড়া ন্যাকড়ার মত সহজ দাহ্য পদার্থ জ্বালানো হয়েছে। কিন্তু আধুনিক দেশলাইয়ের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে ফসফরাস আবিষ্কারের পর। খুব কম তাপমাত্রাতেই জ্বলে ওঠে ফসফরাস। ১৬৮১ সালে রবার্ট বয়েল নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক গন্ধক মাখানো কাঠের টুকরো গন্ধক আর ফসফরাসের সংমিশ্রণে ডুবিয়ে দিতেই এমন ধাঁ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল যে আবিষ্কারটাকে কার্যকর করা সম্ভব হল না।

জন ওয়াকার নামে একজন ওষুধ প্রস্তুতকারক সর্বপ্রথম কাজের দেশলাই আবিষ্কার করলেন ইংলণ্ডে। গুঁড়ো কাঁচ লাগানো কাপড়ের ভাঁজে এই দেশলাই জ্বালাতে হত। ১৮৩৩ সালে কাঠির ডগায় ফসফরাস লাগানো দেশলাই তৈরী হল অস্ট্রিয়া আর জার্মানীতে, এ দেশলাই ঘসতে হত কোনো কিছুর ওপর। কিন্তু দেশলাই প্রস্তুতকারকদের কাছে সাদা বা হলুদ ফসফরাস এমন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল যে শেষ পর্যন্ত তার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হল ১৯০৬ সালে আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা।

শেষকালে দেশলাই তৈরীর কাজে লাল ফসফরাসের ব্যবহার শুরু হতেই বিঘ্নহীন দেশলাই বা সেফটি ম্যাচ-য়ের উৎপাদন সম্ভব হল। লাল ফসফরাস বিষ নয়। আগে থেমেই প্রস্তুত কিছুর ওপর ঘসে এই দেশলাই জ্বালবার মত প্রথম দেশলাই তৈরী হল ১৮৪৪ সালে সুইডেনে। কাঠির ডগায় সব কটা রসায়ন দ্রব্য না দিয়ে লাল ফসফরাস মাখিয়ে রাখা হল দেশলাইয়ের খোলের গায়ে। কাঠির ডগা সেখানে ঘসলেই তবে জ্বলবে, নইলে নয়। এইভাবেই তৈরী হল প্রথম বিঘ্নহীন নিরাপদ দেশলাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সেনাবাহিনীরা দীর্ঘকাল বৃষ্টি বাদলা অঞ্চলে ছিল। দেশলাই গেল অকেজো হয়ে। তখন রেমণ্ড ক্যাডি বলে এক ভদ্রলোক দেশাইয়ের ওপর এমন একটা আস্তরণ দিয়ে দিলেন যে জলের মধ্যে সেই দেশলাই আট ঘন্টা ডুবিয়ে রাখলেও খারাপ হত না!

মাছ জল খায়?

মাছ জল খায়? তোমার কি মনে হয়? খুব যে মুচকে মুচকে হাসছো! ভাবছো, মাছ হাঁ করলেই তো মুখ ভরে যায় জলে।

মাছের পছন্দ হোক আর না হোক, খাবারের সঙ্গে কিছু জল তো পাকস্থলীতে প্রবেশ করেই। কিন্তু সে জল কি ওদের পক্ষে যথেষ্ট? মাছ

কি চির-তৃষিত? অনেক আগেই এই হেঁয়ালীর জবাব বার করে ফেলেছেন বৈজ্ঞানিকরা।

মাছ সারা ভূগোলকের সব রকম জলেই বাস করছে, কিন্তু প্রতিটি জাতের মাছ নিজেদের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যেই বাঁচতে পারে। সামান্য কিছু জাতের মাছ আছে যারা নোনা জল থেকে মিষ্টি জলে এসে আবার ফিরে যেতে পারে—নিজেদের শরীরের ক্ষতি না করেই। এদিক দিয়ে ঈল মাছরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী! এদের জীবনকালের অর্ধেক কাটে নোনা জলে, বাকী অর্ধেক মিষ্টি জলে। এক ধরনের জল থেকে অন্য ধরনের জলে অতি সহজে যাওয়ার পথে বাধাটা কী জানতে ইচ্ছা যাচ্ছে, তাই না? ছাল, চামড়া ইত্যাদি বহিরাবরণ, মুখ গহ্বরের আচ্ছাদন, কানকো এবং মাছের অন্যান্য দেহাংশ (দেহযন্ত্র আর টিশুদের প্রতিটি একক কোষের পাতলা ঝিল্লীশুদ্ধ) জলকে তাদের মধ্যে দিয়ে যেতে দেয়: কিন্তু লবণ এবং অন্যান্য অনেক বস্তুর পথ আটকে দেয়।

জলটা এদের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে যায় কোথায়? কোনো চৌবাচ্চার মধ্যে, না, চৌবাচ্চা থেকে বাইরে? জিনিসটা বুঝতে হলে অস্‌মোসিস সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকা দরকার। সূক্ষ্ম পর্দা বিশেষের মধ্যে দিয়ে জল বা অপর কোনো দ্রাবক পদার্থের যে গতি লক্ষিত হয়, তাকেই বলে অসমোসিস্। দ্রাবক তরল পদার্থটা পর্দার মধ্যে দিয়ে নিঃসৃত হয়, কিন্তু দ্রাব্য পদার্থটা আটকে যায়। অসমান ঘনত্বের দুটি দ্রব্যের মধ্যে এই রকম পর্দা দিলে অল্প ঘনত্বের দ্রব থেকে দ্রাবকের এই গতির (অসমোসিস্) প্রভাবে জল বা কোনো তরল দ্রাবক অধিক ঘনত্বের দ্রবের দিকে প্রবাহিত হয়ে উভয়ের ঘনত্ব সমান করতে চায়। মিষ্টি জলে বলতে গেলে জলের মধ্যে অন্যান্য জিনিস থাকে না—কিন্তু সেই জলের মাছের রক্ত আর টিশুর তরল পদার্থে লবণ আর অন্যান্য প্রোটিন বস্তু থাকে বিস্তর পরিমাণে। ফলে মিষ্টি জলের মাছেদের দেহযন্ত্রগুলো বাইরে থেকে চোঁ-চোঁ করে জল টেনে নেয় ভেতরে। এই বাড়তি জল বার করে দেওয়ার নিষ্ক্রমণ পথ না থাকলে ফুলে ঢোল হয়ে মারা যেত মাছেরা। ফলটা দাঁড়াল কী? না, মিষ্টি জলের মাছেদের জল খাওয়ার কোনো দরকারই হয় না। চারদিক দিয়ে এত জল ভেতরে ঢোকে যে তাকে বার করে দিতেই বেচারীদের হিমসিম খেতে হয় অবিরাম।

কিন্তু সামুদ্রিক হাড়ওলা মাছেদের ক্ষেত্রে ঘটে অন্য ঘটনা। সমুদ্রের জলে লবণ যে পরিমাণে থাকে, তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণে থাকে মাছেদের টিশুতে। এ ক্ষেত্রে তাই সমুদ্র পরম লোভীর মত মাছ বেচারীদের শরীরের

ভেতর থেকে চোঁ-চোঁ করে জল টেনে নেয়। তেষ্টায় টা-টা করে বলেই এখানকার মাছেদের ক্রমাগত জল খেয়ে যেতে হয়—নইলে সমুদ্রেই তাদের শুকিয়ে মেরে ফেলত!

সমুদ্রের সব মাছ কিন্তু জল খায় না। হাঙর আর রে মাছ হল গিয়ে সবচেয়ে প্রাচীন মাছ। হাড়ওলা মাছেরা (Teleosts) সমুদ্রে আসার আগেই খুব সম্ভব এরা সমুদ্রে এসেছিল বলেই নোনা জলের মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল অদ্ভুতভাবে। রক্তের মধ্যে ইউরিয়াকে এরা ধরে রাখবার কৌশল উদ্ভাবন করে নিয়েছে (ইউরিয়া জীবজন্তুর মূত্রে পাওয়া যায়। সাদা স্ফটিকাকার জৈব পদার্থ)। শরীরের মধ্যে ইউরিয়া থেকে যাওয়াটা খুব ক্ষতিকর বলেই জীবজন্তুরা ঝটপট একে শরীর থেকে বার করে দেয়। কিন্তু হাঙর আর রে মাছরা বিশেষ ধরনের ঝিল্লী দিয়ে কানকো এমনভাবে মুড়ে রাখে যে ইউরিয়া আর বেরোতে পারে না। ফলে সমুদ্রের জলের চেয়ে এদের রক্ত অধিক ঘন বলে সমুদ্রের জল বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকে। (অনেকটা মিষ্টি জলের মাছেদের ক্ষেত্রে যা ঘটে)। তাই বাড়তি জল বার করে দেওয়ার জন্যেই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় হাঙর আর রে মাছেদের।

হাঙরদের এই ইউরিয়া ধরে রাখার পদ্ধতিটা ধার করেছে এক জাতের কাঁকড়া-খেকো ব্যাঙেরা। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকরা এদের সন্ধান পেয়েছেন এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে। উভচরদের মধ্যে কেবল এরাই নোনা জলে বাস করতে পারে। জন্মায় কিন্তু মিষ্টি জলে। বাচ্চা একটু বড় হলেই মিষ্টি জল ছেড়ে নোনা জলে গিয়ে কাঁকড়া ধরে খায়। হাঙরদের মতই ইউরিয়াকে এরা রক্তের মধ্যে রাখতে পারে। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটা ঐচ্ছিক অর্থাৎ—ইচ্ছে মত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সমুদ্রে যাওয়ার আগে ইউরিয়া জমায় রক্তে, মিষ্টি জলে ফিরে আসার সময়ে বাড়তি ইউরিয়াকে বিসর্জন দিয়ে আসে সমুদ্রে। কাজেই নোনা জলেই থাকুক কি মিষ্টি জলেই থাকুক, ব্যাঙ বাবাজীদের জল খাওয়ার কখনো দরকারই হয় না!

মানুষ কি নিজে হীরে তৈরী করতে পারে না?

আকাটা খনিজ হীরে এত কঠিন যে কাঠিন্যের দিক দিয়ে ধাতু কিম্বা যে কোনো পদার্থের মধ্যে তা তুলনাহীন। হীরে না থাকলে ফ্যাসাদে পড়ত আধুনিক ইঞ্জিনীয়ারিং।

কিন্তু পৃথিবীতে হীরের খনি তো তেমন বেশী নেই। যে কটা আছে, তাদের হীরে-সম্পদও এমন কিছু নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া এই পৃথিবীর একশ ভাগের নব্বই ভাগ হীরে আসে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি হীরের খনি থেকে। প্রায় কুড়ি বছর আগে একটা বিরাট অঞ্চল আবিষ্কার করা হয় সোভিয়েত দেশের ইয়াকুতিয়ায়। মেলা হীরে পাওয়া গেছে সেখানে। সে হীরে তোলা হচ্ছে গয়না বানানোর জন্যে নয়—শিল্পপণ্য হিসেবে।

প্রকৃতির তৈরী হীরে তৈরির জন্যে দরকার দারুণ তাপ আর চাপ। ভূত্বকের সবচেয়ে গভীর অঞ্চলেই হীরে জন্ম নেয় এই দুটি কারণে—যেখান তাপ আর চাপ দুটিই ভয়ানক রকমের। কোথাও কোথাও অবশ্য হীরে গলিত অবস্থায় ভূত্বকের ওপরে উঠে এসে জমাট বেঁধে যায়। এ ঘটনা কিন্তু কালেভদ্রে ঘটে—আকছার ঘটে না।

তাহলে কি প্রাকৃতিক দয়াদাক্ষিণ্যের ওপরেই আমাদের নির্ভর করতে হবে হীরে উৎপাদনের জন্যে? মানুষ কি নিজে হীরে তৈরি করতে পারে না?

বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, নকল হীরে তৈরির অনেক চেষ্টাই করা হয়েছে। কপাল ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় অনেক নাম করা বৈজ্ঞানিকও ভিড়ে গিয়েছিলেন ; যেমন, আঁরি মুয়াসাঁ—ইনি বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন কিন্তু প্রথম মুক্ত ক্লোরিন পৃথককারী হিসেবে। এঁরা হাজার চেষ্টা করেও কিন্তু নকল হীরে বানাতে পারেন নি। হয়ত অত্যুচ্চ চাপ আর তাপ সৃষ্টি করার মত যন্ত্রপাতি ছিল না, অথবা পদ্ধতির গোড়ায় মৌলিক কোনো ভুল ছিল।

শেষকালে পাওয়া গেল নকল হীরে তৈরির রহস্য। গ্রাফাইট অর্থাৎ কৃষ্ণসীস থেকে নকল হীরে বানিয়ে নিলে আধুনিক ইঞ্জিনীয়ারিং—এই শতকের পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি। বৈজ্ঞানিকরা লক্ষ বায়ুচাপ আর প্রায় তিন হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রা একই সঙ্গে প্রয়োগ করলেন গ্রাফাইটের ওপর। এই সেই গ্রাফাইট যা দিয়ে স্কুল কলেজ অফিসের পেন্সিলের শিষ তৈরী হয়। আজকাল তো পৃথিবীর অনেক দেশেই নকল হীরে তৈরি হচ্ছে।

হীরের চেয়ে কঠিন পদার্থ তৈরি করা যায় ?

হীরে একটা কৃস্ট্যাল বা কেলাস। প্রাকৃতিক কৃস্ট্যাল জগতে, হীরের চেয়ে আদর্শ কৃস্ট্যাল আর নেই। কৃস্ট্যাল-স্ট্র্যাকচার অথবা কেলাস সংযুতি

হীরের মধ্যে যেমনটি আছে, তার চাইতে সেরা আর নেই। হীরের কৃস্ট্যালে কার্বন পরমাণুর আদর্শ জ্যামিতিক বিন্যাসই এর এই আত্যন্তিক কাঠিন্যের কারণ। কাঠিন্যের মূল রহস্য সেইখানেই।

হীরেকে আরও কঠিন করা সম্ভব নয়। কিন্তু হীরের চেয়ে কঠিন পদার্থ তৈরি করা যায় বই কি? এমন পদার্থ তৈরির জন্যে যে কাঁচা মালের দরকার রসায়নবিদরা তা তৈরি করে নিয়েছেন।

বোরন আর নাইট্রোজেন মিলেমিসে হয় বোরন নাইট্রাইড। অবিকল গ্র্যাফাইটের মতই এর কৃস্ট্যাল-স্ট্রাকচার অত্যন্ত চমকপ্রদ তাই তাকে লক্ষ লক্ষ বায়ুচাপ আর হাজার হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রায় রাখতেই পাওয়া গেল বোরাজন—হীরের চেয়ে কঠিন জিনিস। এত কঠিন যে মসৃণ হীরের বুকেও বোরাজন দিয়ে দাগ কাটা যায়। বোরাজনের তাপ সইবার ক্ষমতাও অনেক বেশী—পোড়ানো চাটিখানি কথা নয়।

অবশ্য বোরাজন এখনও বড় দামী পদার্থ। সস্তা করার সুযোগ যদিও আছে। তবে, মানুষ যে প্রকৃতির ওপর টেক্কা মারতে পারে, প্রকৃতির কারখানায় তৈরি জিনিসের চেয়েও ভাল জিনিস নিজের কারখানায় বানাতে পারে—তা প্রমাণ করেছে বোরাজন বানিয়ে।

এইটাই বড় কথা, নয় কী?

দাঁতের রোগ কেন হয়?

মুখবিবরের মধ্যে খাদ্যকণার সঙ্গে ব্যাকটিয়ার পারস্পরিক (মিথস্ক্রিয়া) ক্রিয়ার ফলে দাঁতের অবক্ষয় নিয়ে জীবনের বেশীর ভাগ কাটাই আমরা অনেকেই। দাঁতের এই ক্ষয় মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। দাঁতের ফাঁক ফোকরে আবর্জনা সঞ্চিত হয়। দাঁতের ডাক্তার এর নাম দিয়েছে প্লাক (Plaque)—বাংলায় যার মানে, ধাতু ইত্যাদি নির্মিত ফলক। সাধারণতঃ এরা অদৃশ্য। জীবন্ত ব্যাকটিরিয়ারা অদৃশ্য এই ফলকের ওপর খাদ্যকণাকে গাঁজিয়ে তা থেকে অ্যাসিড উৎপাদন করে। সেই অ্যাসিড দাঁতের এনামেল গলিয়ে ব্যাকটিরিয়াদের আরও অন্দর মহলে ঢোকবার পথ করে দেয়। তোপ দেগে দুর্গ প্রাকার ধসিয়ে দেওয়ার মত ব্যাপার আর কী? সূক্ষ্ম জীবাণুদের এই ক্ষমতা তাক লাগিয়ে দেওয়ার মত নয় কী? দেহের কঠিনতম এনামেল পাঁচিলকেও গলিয়ে দেয় অ্যাসিড দিয়ে। অথচ তাদের অণুবীক্ষণে দেখতে হয় বলে আমোলই দিতে চাই না আমরা। ভেতরে ঢোকার পথ আরও একটা আছে। এনামেল কোটিংয়ে সূক্ষ্ম চিড় থাকতে পারে—সামান্য

ফাঁক ফোকরের মধ্যে দিয়ে কুট কচালে মহাশত্রু জীবাণুরা সুরুৎ করে ভেতরে ঢুকে বসে এনামেলের ঠিক নিচের ডেনটাইনের ওপর ক্ষয়কর্ম শুরু করে। এক্স রে দিয়ে এই লুকোনো ক্ষয় দেখা সম্ভব। ব্যাপারটা আরো সাংঘাতিক। এনামেলের ওপরে তো খুব মাজাঘষা পালিশ চলছে—তলায় বসে আরামসে তেনারা দাঁতের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন।

২৫ বছর বয়সের পর থেকেই দাঁতের এই অবক্ষয় মন্থর গতি হয়ে আসে। এর পরেই যে জিনিসটার জন্যে আমাদের সজাগ থাকা দরকার, তা হল দাঁত ঘিরে নানা ধরনের অসুখবিসুখ। এরা হানা দেয় মাড়ির লাইনের নিচে। এখানেও কিন্তু পালের গোদা এই প্লাক। অনেকদিন ধরে একটু একটু করে মুখের লালা থেকে খনিজ দ্রব্য টুকটাক করে তুলে নেয় অদৃশ্য এই প্লাক, ফলে প্লাক হয়ে যায় টার্টার অথবা দাঁতের পাথরি। পাথরের মতই তা কঠিন, খাঁজকাটা, এবড়ো খেবড়ো, ধারযুক্ত। প্লাক অথবা টার্টার—এই দুই পরম শত্রুর দুজনের যে কেউ মাড়ির নিবিড় সান্নিধ্য থেকে আলগা করে দেয় দাঁতকে—এমন ছোট ছোট পকেট বানিয়ে দেয় যার মধ্যে জমা হতে থাকে খাদ্য কণা এবং ব্যাকটিরিয়া।

যত দুর্ভোগের সূত্রপাত এই থেকেই। মাড়ি ফোলে, রক্ত পড়ে। মাড়ি দাঁতের যে নরম অংশটিকে পরম স্নেহে অতন্দ্র প্রহরীর মত জাগলে রেখে দেয়, সাধারণতঃ ব্যাকটিরিয়া মহাপ্রভুরা সে অঞ্চলেই ঢুকে পড়ে গুটি গুটি। এই অবস্থা অব্যাহত থাকলেই সর্বনাশ—পুঁজের পকেট তৈরী হয়ে যায়—চোয়ালের সঙ্গে দাঁতেদের লেগে থাকারও দফারফা হয়ে যায়। এই অবস্থায় পৌঁছালেই মাড়িদের শেষ প্রণাম জানিয়ে শ্মশান যাত্রা করা ছাড়া আর পথ থাকে না দাঁতেদের।

বাচ্চা বয়সেই যদি বেঁকে থাকা দাঁত সিধে করে দেওয়া যায়, তাহলে ওপরের পাটির দাঁত নিচের পাটির দাঁতের সঙ্গে এমনভাবে এসে মিলে যায় যে ম্যালোক্লুসন নামক দাঁত ঘিরে আর একটি রোগের সূত্রপাত আর ঘটে না। দাঁতভাঙ্গা এই রোগটি আর কিছুই নয়—ওপরের পাটির দাঁত নিচের পাটির ঠিক জুড়ি দাঁতের সংগে এসে মিলতে পারে না চোয়াল বন্ধ করলে। ফলে, একটি দাঁত যখন সক্রিয়, তারই জুড়ি অপর দাঁতটি তখন নিষ্ক্রিয়। বসে থাকলে হাড়েও ঘুন ধরে—কাজেই নিষ্কর্মা দাঁতটিরও গোড়া আল্‌গা হয়ে যায় কাজের কোনো উদ্দীপনা পায় না বলে। শেকড় ঢিলে হলেই দাঁতের গোড়া থেকে মাড়ি সরে যায়, পুঁজের পকেট

তৈরী হয়, মহানন্দে জীবাণুরা হানা দেয়, আস্তে আস্তে দাঁড় নড়তে থাকে—তারপর গঙ্গাযাত্রা করে যথাসময়ে।

হীরে কত শক্ত ?

এক ডেলা পুটিং নিয়ে ক্রমাগত চাপ দিলে, তা শক্ত হবেই। ঠিক এই পন্থায় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে হীরেকে। পৃথিবীর তখন আদিম অবস্থা। মাটির তলায় রাশি রাশি পাথর রয়েছে গলিত অবস্থায়। পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে শুরু করতেই জমে যাওয়া ভূস্তরের প্রচণ্ড চাপ গিয়ে পড়ল তলাকার গলিত পাথরে। চাপের চোটে কার্বন হয়ে গেল 'হীরে'।

প্রকৃতির ভাঁড়ারে সবচেয়ে কঠিন বস্তু এই হীরে। এর কঠিনত্ব মাপাটাও একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। শেষকালে ১৮২০ সালে মোজ নামে এক ভদ্রলোক একটা পরীক্ষার ভিত্তিতে দশটা খনিজ পদার্থকে কঠিনত্বের বিচারে সাজালেন পর পর। ওঁর মাপকাঠি অনুসারে সবচেয়ে নরম খনিজ পদার্থ হল টাল্ক। সবচেয়ে শক্ত খনিজ পদার্থ—হীরে। এবার এদের পর পর সাজিয়ে দেখা যাক।

১। টাল্ক, ২। জিপসাম; ৩। ক্যালসাইট; ৪। ক্লোরাইট; ৫। আফাটাইট; ৬। ফেল্ড্স্পার; ৭। কোয়ার্জ; ৮। তোপাজ; ৯। কোরান্ডাম; ১০। হীরে।

আবার প্রত্যেকটার সংগে প্রত্যেকের কঠিনত্বের তারতম্য যদি দেখা যায়, তাহলেও তাজ্জব হতে হবে। কেননা, মাপকাঠির নরম স্থানে থেকেও কোরানডাম হীরের চাইতে যতখানি নরম, মাপকাঠির প্রথম স্থান থেকে টাল্ক কোরানডামের চাইতে তার অনেক বেশী নরম!

যেহেতু হীরে সবচেয়ে কঠিন বস্তু, তাই তাকে কাটতে হয় হীরে দিয়েই। হীরের ধুলো দিয়ে তৈরী করাত ব্যবহার করে হীরক-কাটিয়েরা।

শিল্প জগতে হীরে দিয়ে ঘষা আর কাটার ব্যবহার খুবই ব্যাপক। তামা, পেতল এবং অন্যান্য ধাতুর যন্ত্র তৈরী থেকে শুরু করে লেন্স ঘষা এবং কাঁচ কাটা পর্যন্ত—সব কাজেই হীরে নইলে চলে না। উৎপন্ন হীরের শতকরা আশিভাগই আজকাল কাজে লাগছে শিল্প জগতে—গয়না তৈরী করতে লাগছে অতি সামান্যই!

পশুপাখীরা কি রঙ দেখতে পায় ?

পৃথিবীর চারিদিকে এত রঙের ছড়াছড়ি যে আমরা কল্পনাও করতে পারি

বা অন্য প্রাণীরা আমাদের মত সব রঙ দেখতে পায় না। তারা তো কথা বলতে পারে না, তবে কি করে বুঝব যে তারা রঙ দেখতে পায় কি না?

বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। মৌমাছিদের নিয়ে বহু পরীক্ষা করা হয়েছে—তারা রঙ দেখে বিভিন্ন ফুল চেনে কিনা জানার জন্য। একটা লাল আর একটা নীল কার্ড নিয়ে, নীল কার্ডের সামনে একটু সিরাপ রেখে দিয়ে দেখা গেছে যে কিছুক্ষণ পরে, সিরাপ না থাকা সত্ত্বেও মৌমাছিরা নীল কার্ডের কাছে আসছে। সুতরাং মৌমাছিরা রং চিনতে পারে।

দুটো আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করা গেছে মৌমাছিদের রঙ চেনার ব্যাপারে। প্রথমতঃ তারা লাল রঙ দেখতে পায় না। লাল তাদের কাছে গাঢ় ধূসর অথবা কালো। দ্বিতীয় ব্যাপারটা আরও অদ্ভুত। মৌমাছিদের চোখে আলট্রা-ভায়োলেট রঙ হয়ে ধরা পরে, যা মানুষের চোখে অদৃশ্য।

ছেলে-পাখীদের গায়ে উজ্জল বর্ণের পালক থাকে। মেয়ে পাখীরা কি সেইসব রঙ দেখতে পায়? মুরগী নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে তারা রামধনুর সবকটা রঙই দেখতে পায়।

কিন্তু মানুষের সবচেয়ে কাজের বন্ধু—কুকুর কোনো রঙ দেখতে পায় না। অনেক সময় আমরা মনে করি হয়ত তারা রঙ দেখে চিনল, কিন্তু আসলে তা গন্ধ বা সাইজ অথবা গড়ন। কুকুর-প্রেমিকদের অবশ্য এতে হতাশ হবার কিছু নেই, কারণ কুকুরের ঘ্রাণশক্তি এতই প্রবল যে এই ত্রুটিটুকু পুষিয়ে নেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। বিড়ালরাও রঙ বুঝতে পারে না।

বাঁদর আর হনুমানরা খুব ভাল রঙ চিনতে পারে। তবে বেশীর ভাগ স্তন্যপায়ীরাই রঙ-কানা। লোকে বলে লাল রঙ দেখলে ষাঁড় ক্ষেপে যায়—এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, কারণ ষাঁড় কোনো রঙই দেখতে পায় না!

জ্বর হয় কেন?

আমাদের শরীর খারাপ হলে প্রথমেই মা অথবা ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের উত্তাপ মাপেন, অর্থাৎ জ্বর হয়েছে কিনা দেখেন।

সুস্থ মানুষের শরীরের উত্তাপ সাধারণতঃ ৯৮·৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট। অসুখ করলে এই উত্তাপ বেড়ে যায়। তখন তাকে আমরা বলি 'জ্বর'। সব অসুখে জ্বর না হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অসুখ করলে জ্বর হয়। জ্বর হলেই বুঝতে হবে শরীর কোন না কোনভাবে অসুস্থ হয়েছে।

ডাক্তার বা নার্স সাধারণতঃ দিনে দুবার করে শরীরের উত্তাপ মাপে এবং একটা চার্টে তা লিখে রাখে। এই চার্ট দেখে বোঝা যায় জ্বর কতটা

উঠছে বা নামছে, আর এ থেকেই প্রায় বোঝা যায় অসুখটা কি ধরনের। যেমন নিউমোনিয়ার চার্ট এক রকম ভাবে ওঠা-নামা করবে, আবার অন্য অসুখের চার্টের ছবি হবে অন্য রকম।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল—জ্বর যে আসলে কি, তা আমরা এখনও সঠিক জানতে পারিনি। তবে আমরা এটুকু জেনেছি যে জ্বর আমাদের শরীরে অসুস্থতা দূর করতে সাহায্য করে। জ্বরের সময় আমাদের শরীরের যন্ত্রগুলো দ্রুত কাজ করে। বেশী পরিমাণে হরমোন, এনজাইম আর রক্ত-কণিকা তৈরী হয়। হরমোন আর এনজাইমরা আরও বেশী সক্রিয় হয়। রক্ত-কণিকারা ক্ষতিকারক জীবাণুদের ভালভাবে ধ্বংস করে। রক্ত-প্রবাহের গতি বেড়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়। এইভাবে আমরা শরীরের দূষিত আবর্জনার হাত থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাই।

কিন্তু খুব বেশী জ্বর শরীর সইতে পারে না। একটানা চব্বিশ ঘণ্টা জ্বর হলে শরীরের সংরক্ষিত প্রোটিন নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু প্রোটিন জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়, তাই জ্বর দিয়ে রোগ সারাতে গেলে সেই সঙ্গে শরীরের দিক দিয়েও যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়। অতএব এটা মোটেই স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি নয়।

উটপাখী কি বালির মধ্যে মুখ লুকোয় ?

উটপাখী নাকি ভয় পেলে মুখটা বালির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েই নিজেকে নিরাপদে লুকোতে পেরেছে বলে মনে করে! তখন নাকি কাছে গিয়ে তাকে ধরা খুবই সোজা!

এ ধারণা কিন্তু খুবই ভুল। কেউই উটপাখীকে এরকম করতে দেখেনি। তবে ভয় পেলে ওরা অনেক সময় সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে আর লম্বা গলাটা সমান্তরাল ভাবে মাটির সাথে রেখে চুপচাপ বিপদের দিকে নজর রাখে। বিপদ কাছে এলেই অন্য সব প্রাণীর মতই সোজা চম্পট দেয়।

উটপাখী উড়তে পারে না বটে কিন্তু, খুব জোরে দৌড়োতে পারে। পাখীদের মধ্যে সবচেয়ে দৌড়বাজ হল উটপাখী। ঘন্টায় ৫০ মাইল বেগে ওরা একটানা আধ মাইল অনায়াসে ছুটে যেতে পারে।

উটপাখী বড়ই বিচিত্র প্রাণী। আফ্রিকার উটপাখী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাখী। অন্য কোনও পাখী এর ধারে কাছেও আসে না। এরা আট ফুট উঁচু হয় আর এদের ওজন হয় ৩০০ পাউণ্ডেরও বেশী। এত ভারী শরীর নিয়ে ওড়া কি সম্ভব?

ডিমের ব্যাপারেও উটপাখী হল সেরা! উটপাখীর ডিম সাইজে প্রকাণ্ড—অন্য সব পাখীর ডিমের চেয়ে অনেক বড়। উটপাখীর ডিম লম্বায় হয় ছয় থেকে সাত ইঞ্চি আর এর ব্যাস হয় পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি। উটপাখীর ডিম ব্রেকফাস্টে খাবার কথা মনে হলে একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে—এই ডিম সেদ্ধ হতে সময় লাগে পাক্কা চল্লিশ মিনিটেরও বেশী!

হাতীর শুঁড় থাকে কেন?

হাজার হাজার বছর আগে বিরাট চেহারার 'ম্যামথ'রা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু প্রকৃতির কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তারা একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের বংশধরদের মধ্যে শুধু মাত্র দুটো ধারাই এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছে। এরা হল আফ্রিকার হাতী ও এশিয়ার হাতী।

হাতী ডাঙার প্রাণীদের মধ্যে সবচাইতে বড়। হাতীদের বুদ্ধি কিন্তু প্রখর। তারা খুব নিরীহ, শান্ত আর ধৈর্যশীল। কুকুর বাদে অন্য সব প্রাণীদের থেকে হাতীকে পোষ মানান এবং শিক্ষা দেওয়া বেশী সহজ।

হাতীর প্রকাণ্ড শরীরটার ওজন প্রায় পাঁচ টন। এই ভীষণ ভারী দেহটাকে খাড়া রাখার জন্য তাদের পাগুলো হয় বেঁটে মোটা থামের মত।

হাতীর দুটো দাঁত খুব বেশী বেড়ে উঠে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। এই দাঁত দিয়ে তারা মাটি থেকে শেকড় খুঁড়ে বার করে খাওয়ার জন্য, আবার দরকার হলে আত্মরক্ষার কাজেও এর ব্যবহার হয়। ভারতীয় হাতীদের মধ্যে শুধু পুরুষ হাতীরাই দাঁতাল হয়।

হাতীর শুঁড় একটা বিস্ময়কর অঙ্গ যা না থাকলে তারা বাঁচতে পারত না। মানুষের যেমন হাত, হাতীর তেমনি শুঁড়। হাতীর শুঁড় আসলে নাক আর ওপরের ঠোঁটের লম্বা হয়ে যাওয়া অংশ। হাত, নাক ও ঠোঁট—সব কিছুর কাজই হয়ে যায় এই শুঁড় দিয়ে।

প্রায় ৪০,০০০ পেশীতে ঠাসা এই শুঁড়। তাই খুব নমনীয় অথচ মজবুত। এই শক্তিশালী শুঁড় আঙুলের মত খুব স্পর্শানুভূতি সম্পন্ন। এ দিয়ে তারা একটা ছোট আলপিনও তুলে নিতে পারে।

শুঁড় দিয়ে খাবার জোগাড় করে হাতী মুখে পুরে দেয়। জল খাবার সময় শুঁড়ে করে জল টেনে নিয়ে গলার মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। আবার এই শুঁড় দিয়েই সারা গায়ে জলের ফোয়ারা ছিটিয়ে হাতী চান করে। হাতী জল খুব ভালবাসে। সুযোগ পেলেই চান করে নেয়। এই

ভারী শরীর নিয়ে হাতীরা কিন্তু খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারে। মা-হাতী প্রায়ই বাচ্চা হাতীকে পিঠে বসিয়ে সাঁতার কাটে।

আগে অনেকে ভাবত হাতী কয়েক শ' বছর বাঁচে। কিন্তু বন্দী অবস্থায় তারা ৫০ বছরের বেশী বাঁচে না।

রক্তচোষা বাদুড় কাকে বলে ?

প্রায় ৬০,০০০,০০০ বছর ধরে অর্থাৎ মানুষের আবির্ভাবের আগে থেকেই পৃথিবীতে বাদুড়ের রাজত্ব চলে আসছে। বহু পুরোনো ফসিল বা বা জীবাশ্ম থেকে এই তত্ত্ব জানা গেছে। ৪,০০০ বছরের পুরোনো মিশরীয় কবরে বাদুড়ের ছবি পাওয়া গেছে।

বর্তমানে মেরুঅঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব জায়গায় ২,০০০ এর ওপর নানা জাতের বাদুড় পাওয়া যায়। বাদুড়ই হল একমাত্র স্তন্যপায়ী যে উড়তে পারে। ডানা ছড়ান অবস্থায় এদের মাপ ছয় ইঞ্চি থেকে ছয় ফুট পর্যন্ত হয়।

বেশীর ভাগ বাদুড়ই পোকা-মাকড় খায়। গ্রীষ্ম মণ্ডলের অনেক বাদুড় ফল বা ফুলের রেণু খেয়ে থাকে। অন্য বাদুড়েরা মাছ বা ছোট-ছোট চামচিকা খায়। আর কিছু বাদুড় খায় রক্ত।

এই রক্ত-খেকো বাদুড়দের বলা হয় "ভ্যাম্পায়ার" বা "রক্তচোষা", আর এদের জন্যে মানুষ বাদুড়কে এত ভয় পায়। এক সময় পূর্ব ইউরোপে রক্তচোষা বাদুড়দের নিয়ে অনেক কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকে মনে করত এরা আসলে মরা মানুষের আত্মা, রাত্রিতে বাদুড়ের রূপ ধরে ঘুরে বেড়ায় মানুষের গা থেকে রক্ত চুষে খাবার জন্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সব পর্যটকেরা দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় যায়, তারা এই রক্ত খেকো বাদুড়ের সন্ধান পায়। এরা ফিরে এসে অতিরঞ্জিত করে এই রক্ত-খেকোদের গল্প সবাইকে শোনায়, আর এর থেকেই বাদুড় নিয়ে নানা-রকম আষাঢ়ে উপকথার সূচনা হয়।

'ভ্যাম্পায়ার' বাদুড় কেবলমাত্র মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতেই পাওয়া যায়। এদের ছড়ান ডানার মাপ ১২ ইঞ্চি আর শরীরটা লম্বায় চার ইঞ্চি হয়। ভ্যাম্পায়ারের দাঁত ছুঁচের মত সরু ও ধারাল, যা দিয়ে তারা চামড়ার ওপর ছোট ক্ষত সৃষ্টি করে। আগে ভাবা হত রক্ত চোষা বাদুড় বুঝি রক্ত চুষেই খায়, কিন্তু আসলে এর জীব দিয়ে চেঁটে চেঁটে রক্ত খায়।

কোন প্রাণী যখন ঘুমোয়, তখন তার ঘুম না ভাঙিয়েই ভ্যাম্পায়ার তার রক্ত খেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ভ্যাম্পায়ারের লালাতে এমন কিছু থাকে যা ব্যথা মরিয়ে দেয় আর রক্ত জমতে দেয় না। ভ্যাম্পায়ার যে মানুষের রক্তই ভালবাসে তা মোটেই নয়—ঘোড়া, গরু, ছাগল বা মুরগীর রক্ত পেলেও তারা খুশী। কয়েক জায়গায় ভ্যাম্পায়াররা এক রকম রোগ ছড়ায় যা অনেক সময় আক্রান্ত প্রাণীর পক্ষে খুবই মারাত্মক হয়ে ওঠে।

বেড়াল কি অন্ধকারে দেখতে পায় ?

অনেকের বাড়ীতেই পোষা বেড়াল আছে। বাচ্চারা তাকে নিয়ে আদর করে—যেন সে পরিবারেরই একজন। কিন্তু এই বেড়াল এক আশ্চর্য প্রাণী। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের সাথে বাস করা সত্ত্বেও তারা এখনও বুনো বা জংলী রয়ে গেছে।

সিংহ, বাঘ আর চিতাবাঘের সঙ্গে বেড়ালের খুব মিল—স্বভাবেও তাদের মতই। সিংহ যেমন করে শিকার ধরে, বেড়ালও তেমনি চুপ করে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকে, তারপর লাফিয়ে পড়ে শিকারের ঘাড়ে।

বেড়াল দারুণ লাফাতে পারে। সোজা সাতফুট উঁচুতে তারা লাফিয়ে উঠতে পারে। পায়ের তলায় নরম গদির মত থাকায় বেড়াল নিঃশব্দে শিকারের পিছু নিতে পারে। বেড়ালের ১৮ খানা নখ থাকে যা তারা ইচ্ছেমত নিজের থাবার মধ্যে গুটিয়ে নিতে বা বার করতে পারে।

অন্ধকারে বেড়াল কি করে দেখতে পায় ? আসলে বেড়ালের চোখ অল্প বা বেশী আলোয় চট করে মানিয়ে নিতে পারে। জোরালো আলোতে বেড়ালের চোখের তারা দুটো সরু লম্বা ফাটলের মত হয়ে যায়, যাতে কম আলো ঢোকে। আবার অন্ধকারে চোখের তারা দুটো চওড়া হয়ে গিয়ে প্রায় পুরো চোখের মাপের হয়ে যায়। পুরোপুরি অন্ধকারে কিন্তু বেড়ালরা দেখতে পায় না, তবে অন্য বেশীর ভাগ প্রাণীর চেয়ে অনেক অল্প আলোতেই তারা ভালভাবে দেখতে পায়। বেড়ালের চোখ মাথা থেকে গোল হয়ে ঠেলে বেরিয়ে থাকে বলে অনেকটা কোণ থেকে আলো চোখে ঢুকতে পারে। বেড়ালের চোখে আলো পড়ে যখন প্রতিফলিত হয়, মনে হয় যেন চোখ দুটো জ্বলছে !

বেড়াল ১৯-২০ বছর বাঁচতে পারে, তবে সাধারণতঃ ১৪ বছরের বেশী বাঁচে না।

পৃথিবীর ৭টা আশ্চর্য জিনিস কি এখনো আছে ?

প্রাচীনকালের লোকেরা ভেবেছিল যে পৃথিবীর সাতটা বিস্ময়কর কীর্তিস্তম্ভ কোনদিনও নষ্ট হবে না। কিন্তু বর্তমান একটা ছাড়া বাকী ছ'টাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

যেটা এখনও রয়ে গেছে, সেটা হল মিশরের 'গিজেহ্' অঞ্চলে অবস্থিত 'চিয়প্স্'-এর পিরামিড। প্রায় ৫,০০০ বছর বছর আগে মিশরের এক ফারাও অর্থাৎ রাজা, আর তার রানীর সমাধির জন্য এটা তৈরী করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় আশ্চর্য জিনিসটা ছিল ব্যাবিলনের প্রকাণ্ড প্রাচীর। এখন এ জায়গার নাম হয়েছে ইরাক। যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার ছ'শ বছর আগে বিখ্যাত রাজা 'নেবুচ্যাডনেজার' এটি তৈরি করিয়েছিলেন। ইঁট দিয়ে গড়া এই প্রাচীরটা ৩৩৫ ফুট উঁচু ছিল। আজ তার ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

গ্রীসের অলিম্পিয়াতে দেবতা 'জু'-এর প্রতিমূর্তি ছিল পৃথিবীর তৃতীয় বিস্ময়কর বস্তু। ৪০ ফুট উঁচু এই মূর্তিটি তৈরি করেছিল ফিডিয়াস নামে এক গ্রীক ভাস্কর। এই মূর্তির পোশাক ছিল সোনার, গা ছিল রুপোর আর চোখ ছিল মূল্যবান পাথরের।

এখন যেখানে তুর্কীদেশ, আগে সেখানে ছিল এফেসিউস রাজ্য। এই এফেসিউস রাজ্যে দেবী ডায়ানার মন্দির ছিল চতুর্থ বিস্ময়। ষাট ফুট লম্বা পাথরের থাম দিয়ে ছাতটা ধরা ছিল। আর গ্রেসীয়ন শিল্পের বহু চমৎকার নিদর্শনে সাজান ছিল এই মন্দির। ২৬২ সালে গথ-রা যখন এফেসিউস আক্রমণ করে, তখন এই মন্দির পুড়িয়ে দেয়।

এই তুর্কী দেশেই 'হ্যালিকারনেসাস' নামে এক শহর ছিল। এই শহরে 'মৌসোলাস' এর সমাধি ছিল পৃথিবীর পঞ্চম আশ্চর্য জিনিস। রাজা মৌসোলাস মারা যান যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার ৩৫৩ বছর আগে। এই স্মৃতিসৌধটি এত সুন্দর আর দামী ছিল যে এর থেকেই 'মোসৌলিয়াম' কথাটা চালু হয়ে গেছে। কোনো সমাধি খুব জাঁকজমকভাবে সাজানো হলে তাকে আমরা 'মৌসোলিয়াম' বলি।

পৃথিবীর ষষ্ঠ বিস্ময় ছিল 'রোড্স্'-এর 'কলোসাস'। এটা সূর্যদেবতা 'হেলিওস'-এর মূর্তি—ব্রোঞ্জ দিয়ে গড়া। ১০৫ ফুট উঁচু এই মূর্তিটা স্থাপিত

ছিল রোডস্ দ্বীপে। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ২২৪ বছর আগে এক প্রবল ভূমি-কম্পে এই মূর্তি ধ্বংস হয়ে যায়।

সপ্তম এবং শেষ আশ্চর্য জিনিস ছিল 'ফারোস' এর আলোকগৃহ। মিশরের উপকূলে ফারোস দ্বীপে এটা তৈরি হয় যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার ২৮৩ বছর আগে। এটা নাকি ভিতের ওপর প্রায় ৬০০ ফুট উঁচু ছিল। এর মাথায় যে আলো জ্বলত, তা দেখে জাহাজরা বন্দরে যাবার পথ চিনতে পারত। ১,৫০০ বছর ধরে এই আলোকস্তম্ভ তার আলোকসংকেত দিয়ে গেছে। অবশেষে এক দারুণ ভূমিকম্পে এটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

পশুদের চোখ কি অন্ধকারে জ্বলে ?

রাত্রিতে গাড়ী চালিয়ে যাবার সময় অথবা টর্চের আলোতে দেখা যায় অনেক পশুর চোখ অন্ধকারে জ্বলছে, মনে হয় চোখ থেকে যেন আলো বেরোচ্ছে।

আসলে কিন্তু চোখ থেকে কোন আলো বেরোয় না। গাড়ীর হেডলাইট বা টর্চের আলো অথবা অন্য কোনও আলো চোখে পড়ে প্রতিফলিত হয় আর এই ঠিকরোনো আলো দেখে মনে হয় চোখ জ্বলছে। এই প্রতিফলনের কারণ হল পশুদের চোখে এক রকম স্ফটিক জাতীয় বস্তুর স্তর থাকে, যাতে আলো পড়লে ঠিকরে আসে। মানুষের চোখে এই বস্তু প্রায় নেই বললেই চলে, তাই মানুষের চোখ জ্বলে না।

এই প্রতিফলনকারী স্তরটা পশুদের অন্ধকারে দেখতেও সাহায্য করে, যার জন্য তারা অন্ধকারে মানুষের চেয়ে ভাল দেখতে পায়। জ্বলন্ত চোখের রঙ নানারকম হয়; কেননা একেক রকম জন্তুর চোখে রক্ত-নালীর সংখ্যাও একেক রকম হয়। যাদের চোখে অনেক বেশী রক্ত নালী আছে, তাদের চোখ থেকে প্রতিফলিত আলোর রঙ হয় লালচে। যে সব পশুর চোখে রক্ত নালীর সংখ্যা খুব কম, তাদের জ্বলন্ত চোখের রঙ হয় ঘোলাটে সাদা।

চোরাবালি কি ?

চোরাবালিকে মানুষ বরাবর ভয় করে এসেছে, ভেবেছে চোরাবালির এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে সবকিছু টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে নেবার।

সত্যি কথা বলতে কি চোরাবালির এমন কোনও ক্ষমতা নেই। চোরা-বালির সাথে কি করে মোকাবিলা করতে হয় জানা থাকলে সে কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

চোরাবালি এক রকমের হাল্কা এবং আল্গা বালি—জলের সঙ্গে মেশানো। সাধারণ বালি থেকে দেখতে মোটেই অন্য রকম নয়, কিন্তু চোরাবালির ওপর কোনো ভারী জিনিস থাকতে পারে না।

চোরাবালি দেখা যায় নদীর মোহনায় বা সমুদ্রের সমতল তীরে যেখানে বালির তলায় একটা শক্ত মাটির স্তর থাকে। এই সব জায়গায় জল জমে থাকে কারণ তলায় শক্ত মাটির জন্য জল বেরিয়ে যেতে পারে না। জোয়ারের সময় বা অন্য কোনোরকমভাবে জলটা এসে পড়ে আর এখানেই থেকে যায়।

চোরাবালির দানাগুলো হয় গোল-গোল—সাধারণ বালির দানার মত কোণা-কোণা নয়। গোল-গোল বালির দানাগুলোর মধ্যে জল ঢুকে দানাগুলোকে আলাদা করে ওপর দিকে ঠেলে দেয় যাতে দানাগুলো একে অপরের ওপর ভেসে উঠতে চায়। এইজন্য চোরাবালি কোনও কঠিন বস্তুকে ধরে রাখতে পারে না।

কিছু কিছু চোরাবালি আবার বালি ছাড়াই হয়। আলগা মাটি, কাদা মেশানো বালি বা ছোট ছোট নুড়ি মেশানো কাদা থেকেও চোরাবালির সৃষ্টি হয়।

চোরাবালিতে পা দিলে মানুষ ঝট করে ডুবে যায় না। যেহেতু চোরা-বালিতে অনেক জল থাকে, তাই সে এতে ভেসে থাকতে পারে। উপরন্তু চোরাবালি জলের চেয়ে ভারী, কাজেই এতে ভেসে থাকা জলে ভাসার চেয়ে আরও সহজ।

আসলে চোরাবালিতে খুব আস্তে নড়াচড়া করা উচিত। তাহলে চোরা-বালি শরীরের চারপাশে গড়িয়ে যেতে সময় পাবে। এরপর যেমন জলে সাঁতার কাটা যায়, তেমনি চোরাবালিতেও অনায়াসে সাঁতার কাটা যাবে।

উটের কুঁজ হয় কেন ?

উটকে বলা হয় 'মরুভূমির জাহাজ', কেননা জাহাজ যেমন তৈরী হয় জলে ভেসে চলার সব রকম সমস্যার মোকাবিলা করার মত করে, তেমনি উটও সৃষ্টি হয়েছে এমনভাবে যাতে করে সে মরুভূমির সব রকম দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে পারে আর বেঁচে থাকতে পারে।

অন্যান্য পশুরা যেখানে জল আর খাবারের অভাবে মারা পড়বে, উট কিন্তু সেখানে অনায়াসে প্রাণটা ধরে রাখবে। উট তার শরীরের মধ্যেই জল আর খাবার বয়ে নিয়ে যায়! যাত্রা শুরু করার অনেকদিন আগে থাকতে উট

শুধু খাবার আর জল খেতে থাকে প্রচুর পরিমাণে, আর কোনো কাজ করে না। এত বেশী খায় যে একটা বিরাট চর্বির ডেলা গজিয়ে ওঠে পিঠের ওপর যার ওজন হয় প্রায় ১০০ পাউণ্ড। এই চর্বির ডেলাটাই উটের কুঁজ। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাবার সময় উটের শরীর এই মজুত চর্বিটাই একটু একটু করে ব্যবহার করে।

উটের পেটের ভেতর দিকের দেওয়ালে সারি-সারি ছোট-ছোট ফ্লাস্কের মত থলি আছে। এখানেই উট জল সংগ্রহ করে রাখে। এই জল আর খাবার অর্থাৎ চর্বি নিয়ে উট দিনের পর দিন জল না খেয়ে মরুভূমির মধ্য দিয়ে এক মরুদ্যান থেকে আর এক মরুদ্যান অবধি হেঁটে চলে। এবং আরও অনেকদিন খাবার ছাড়াই চালিয়ে দিতে পারে—পিঠের কুঁজে জমা চর্বি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে।

এই লম্বা যাত্রার শেষে উটের কুঁজ চুপসে একদিকে ঝুলে পড়ে খাঁজ-খাঁজ হয়ে—কারণ চর্বি ফুরিয়ে যায়। তখন উটকে আবার অনেকদিন ধরে বিশ্রাম নিতে হয় তার শক্তি ফিরে পাবার জন্য।

উট মানুষের সবচেয়ে পুরোনো পোষা জন্তুদের মধ্যে অন্যতম। মিশরে মানুষ ৩,০০০ বছরেরও আগে থেকে উটকে নিজের কাজে লাগাচ্ছে।

হাতী কি ইঁদুরকে ভয় পায় ?

প্রকাণ্ড চেহারার একটা হাতী একটা ছোট্ট ইঁদুরকে ভয় পায়—ব্যাপারটা শুনতে বেশ মজার! লোকের মনে এই ধারণা জন্মানোর কারণ হল, তারা ভাবে ইঁদুর হাতীর শুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে হাতীর দম আটকে দিতে পারে।

আসলে কিন্তু হাতী ইঁদুরকে মোটেই ভয় পায় না। এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় যে হাতীর আস্তাবলে বাচ্চা ইঁদুরেরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু হাতীর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। যেহেতু হাতীর ঘ্রাণ শক্তি প্রখর, তাই এটা সম্ভব নয় যে ইঁদুরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে অচেতন।

যদিও একটা ইঁদুর কোনো রকমে সাহস করে হাতীর শুঁড়ের মধ্যে হামা-গুঁড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ে, তাহলে হাতী এক নিঃশ্বাসেই তাকে কামানের গোলার মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

চিন্তার গতি কত ?

চিন্তা কি সবচেয়ে দ্রুতগামী? অতীতে মানুষ বরাবর এই ধারণা নিয়েই চলে এসেছে। কিন্তু আজ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে আমরা জানতে পেরেছি

যে চিন্তা একটি স্পন্দন যা আমাদের শরীরের স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই স্পন্দনের বা চিন্তার গতি নিখুঁতভাবে মাপা সম্ভব। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, চিন্তার গতি আসলে খুব ধীর।

স্নায়ুর স্পন্দন ঘন্টায় মাত্র ১৫৫ মাইল যেতে পারে। অর্থাৎ কোন সংবাদ আমাদের শরীরের মধ্য দিয়ে এক অংশ থেকে আর এক অংশে পাঠাতে যত সময় লাগবে, তার চেয়ে অনেক অল্প সময় তা পাঠান যাবে শরীরের বাইরে দিয়ে। টেলিভিশন, রেডিও আর টেলিফোন আমাদের স্নায়ুর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি সংবাদ পাঠাতে পারে। একটা চিন্তা টেলিগ্রাফ, রেডিও, টেলি-ফোন বা টি. ভি.-র সাহায্যে নিইইয়র্ক থেকে শিকাগোতে পাঠালে যত সময় লাগবে, সেই চিন্তাটা স্নায়ুর মধ্য দিয়ে পাঠাতে গেলে তার চাইতে বেশ কয়েক ঘন্টা পরে সেটা শিকাগোতে এসে পৌঁছাবে।

যখন আমাদের পায়ের আঙুলে কিছু হয়, তখন সেটা অনুভব করতে, অর্থাৎ স্পন্দনটা মস্তিষ্কে পৌঁছাতে কিছু সময় লাগে। যদি এমন একটা বিরাট শরীর কল্পনা করা যায়, যার মাথাটা থাকবে আলাস্কাতে আর পা দুটো দক্ষিণ আফ্রিকায়, তাহলে একটা হাঙর যদি সোমবার সকালে এই পায়ের আঙুলে কামড় বসায়, মস্তিষ্ক সে খবরটা বুধবার সন্ধ্যের আগে পাবে না। তারপর পাটা জল থেকে টেনে তুলতে তার বাকী সপ্তাহটা কাবার হয়ে যাবে, কারণ এই পা সরানোর চিন্তাটা ফের মাথা থেকে পায়ে পাঠাতেও তো সময় লাগবে!

একেক রকম "সংকেত" মানুষের স্নায়ুর স্পন্দনকে একেক রকম গতিতে প্রবাহিত করে। আলোর চেয়ে শব্দে আমরা তাড়াতাড়ি সাড়া দিই। জোরালো আলো আমাদের চিন্তাকে ম্যাড়মেড়ে আলোর চাইতে জোরে ছোটায়। লাল আলো আবার সাদা আলোর চেয়ে বেশী সাড়া জাগায়। আর যে জিনিসটা ভাল লাগে না, সেটাই আমাদের তাড়াতাড়ি কাজ করায়, যা ভাল লাগে তার চাইতে।

একেক জনের চিন্তার গতি একেক রকম। তাই কেউ খুব তাড়াতাড়ি যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে, আবার কারোর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে সময় লেগে যায় অনেক।

ময়ূর পেখম তোলে কেন?

ময়ূরের পেখম তোলা সত্যিই দেখার মত বটে। প্রত্যেক মানুষই এই সুন্দর দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। প্রাচীনকালে গ্রীক আর রোমানরা ময়ূরকে খুব

পবিত্র পাখী বলে মনে করত। অবশ্য রোমানরা তার জন্য ময়ূরের মাংস খাওয়া মোটেই ছাড়ে নি!

ময়ূরের আদি বাসস্থান ছিল এশিয়া আর ঈস্ট-ইণ্ডিজে। পরে পৃথিবীর অন্য সব জায়গায় এদের নিয়ে যাওয়া হয়। ময়ূর দুরকমের হয় এবং এরা 'ফিজ্যান্ট' পাখীর সমগোত্র।

ময়ূরের মাথা উঁচু করে পেখম ছড়িয়ে চলাফেরা দেখে লোকে বলে "ময়ূরের মত দাম্ভিক"। আসলে কিন্তু সঙ্গী খোঁজার সময় সব পাখী এরকম ভাবে নিজের জাঁক-জমক দেখানোর চেষ্টা করে।

ময়ূর শুধুমাত্র ময়ূরীকে দেখানোর জন্যই তার চটকদার পেখম মেলে দেয়। পাখীদের মধ্যে ছেলে-পাখীরাই বেশী রঙচঙে আর ঝকমকে হয়। ময়ূরের রঙ অন্য সব পাখীর থেকে অনেক বেশী বিচিত্র।

ময়ূরের মাথা, গলা আর বুক ভেলভেটের মত লালচে-নীল রঙের সঙ্গে সবুজ আর সোনালার ছিটে মেশানো হয়—যাকে আমরা বলি 'ময়ূরকণ্ঠী রঙ'। মাথায় হাল্কা রঙের ২৪ টা পালকের একটা ঝুঁটি থাকে। পিঠের রঙ হয় সবুজ। ডানার পালকের কানাগুলো তামার মত রঙের হয়।

সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অংশ হল ময়ূরের লম্বা ল্যাজ বা পেখম। ময়ূর সাধারণতঃ ৭-৮ ফুট লম্বা হয়, তার মধ্যে ল্যাজটাই হয় ৩-৪ ফুট লম্বা।

ময়ূরের ল্যাজ তিনটে রঙে মেশানো—নীল, সবুজ আর সোনালা। চোখের মত নক্সা কাটা থাকে সারা পেখম জুড়ে। এই নক্সাগুলো আবার রঙ পাল্টায়। পেখমের নীচে ল্যাজের শক্ত পর বা পালকের সাহায্যে ময়ূর তার পেখম তোলে।

মেয়ে-ময়ূর বা ময়ূরী সাইজে একটু ছোট হয় আর এত রঙও গায়ে থাকে না। ময়ূরীর পেখম থাকে না, শুধু মাথার ওপর ফাকাসে রঙের একটা ছোট ঝুঁটি থাকে। ময়ূরী সাধারণতঃ একসঙ্গে দশটা ডিম পাড়ে। ডিমগুলো হয় ময়লা-খয়েরী রঙের। লোকে ময়ূর পোষে বাহারের জন্য আর তার পালকের জন্য।

চুল কত তাড়াতাড়ি বাড়ে?

যাদের মাথায় টাক পড়ছে, তাদের চুল তাড়াতাড়ি বাড়ে না বটে, কিন্তু জোয়ান ছেলেদের চুল ভীষণ তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে।

মেপে দেখা গেছে যে মানুষের চুল মাসে প্রায় আধ ইঞ্চি মত বেড়ে যায়। সারাদিন, অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টায় চুল সমানভাবে বাড়ে না—একটা ছন্দ ধরে

বেড়ে চলে।

রাত্তিরে বাড়ে খুব আস্তে আস্তে, কিন্তু দিন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুলের বাড়ও দ্রুত হয়ে ওঠে। চুল সবচেয়ে বেশী বাড়ে সকাল ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে। এরপর বাড়ার গতি কমে যায়। আবার সন্ধ্যে ৪টে থেকে ৬টা-র মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। তারপর ফের আস্তে হয়ে বেড়ে চলে। অবশ্য এই বড় হওয়া বা লম্বা হওয়া এতই সামান্য যে সকাল ১০টা থেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে চুলের বেড়ে ওটা দেখার আশা স্রেফ দুরাশা।

যদি শরীরের সমস্ত চুল এক হয়ে একটা লম্বা তীরের মত রূপ ধরে বাড়তে থাকত, তাহলে দেখা যেত সেটা মিনিটে ১·২ ইঞ্চি করে বেড়ে চলেছে। এক বছর পরে এর ডগাটা গিয়ে পৌঁছোত ৩৭ মাইল দূরে!

সব মানুষের সমান চুল থাকে না। সোনালী চুলওলা লোকেদের চুল হয় পাতলা। কালো চুলের মানুষের থেকে সোনালী চুলের মানুষদের শরীরে চুলের সংখ্যা হয় বেশী। লাল চুল যাদের মাথায়, তাদের চুলের সংখ্যা সবচেয়ে কম আর চুলগুলোও মোটা-মোটা।

নারহোয়াল কাকে বলে ?

নারহোয়াল এক অদ্ভুত ধরনের তিমি। আমরা অনেকে ভাবি তিমি শুধু এক রকমেরই হয়, আসলে বেশ কয়েক রকমের তিমি আছে।

দাঁতাল তিমিরা সাধারণতঃ নানা রকম মাছ খায়, যাদের তারা তাড়া করে ধরতে পারে। দাঁতাল তিমিদের মধ্যে 'স্পার্ম তিমি' হল চেহারায় সবচাইতে বড়। এরা ৬৫ ফুট লম্বা হতে পারে আর এদের মাথাটা হয় প্রকাণ্ড। আরেক ধরনের দাঁতাল তিমি হল 'বোতল-নাক তিমি'। এদের মাথার দু'দিকে অদ্ভুত কয়েকটা হাড়ের চূড়ো থাকে।

নারহোয়াল এক ধরনের দাঁতাল তিমি। প্রধানতঃ উত্তর-মেরু অঞ্চলের সমুদ্রে এদের দেখা যায়। এদের শরীরে এমন একটা জিনিস থাকে, যা আর কোনো তিমির দেহে দেখতে পাওয়া যায় না। পুরুষ নারহোয়ালের মুখের বাঁ-দিকে একটা লম্বা দাঁত থাকে, যেটা সামনের দিকে তরোয়ালের মত ঠেলে বেরিয়ে থাকে।

সানাই কোথা থেকে এল ?

আগেকার দিনে বাদশাহদের আমলে 'নাই' নামে এক রকম বাজনা ছিল।

তখন বাদশাহের অনুমতি ছাড়া এই যন্ত্র বাজানোর অধিকার কারও ছিল না। তাই লোকে এটাকে বলত—'শাহেরই নাই'। এর থেকে পরে 'শাহ+নাই' বা সানাই নামটা হয়েছে।

সানাই এক রকমের বাঁশী। দেখতে অনেকটা ধুতুরা ফুলের মত। সাধারণতঃ কাঠের তৈরী আর নীচের দিকটা পেতলের। লম্বায় এক হাত। ফুঁ দেবার জায়গা হল ওপরের সরু দিকটা। এইখানে দুটো শর বা নলের পাত থাকে যাকে বলা হয় 'রীড'। ফুঁ দিয়ে বাজান হয় বলে সানাই 'শুষির' শ্রেণীর বাজনার মধ্যে পরে। অনেকের মতে সানাইয়ের প্রাচীন নাম হল 'সুনাদি'।

বিয়ে, পূজা ইত্যাদি মাঙ্গলিক উৎসবে সানাই বাজান হয়। এর মিষ্টি করুণ সুরের রেশ অনেকক্ষণ কানে লেগে থাকে। সাধারণতঃ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুর, কজ্‌রী প্রভৃতি সানাইতে বাজানো হয় এবং তা বেশী শ্রুতিমধুর হয়।

সেতার কার সৃষ্টি ?

চতুর্দশ শতাব্দীতে বাদশাহ আলাউদ্দীন খীলজীর দরবারে আমীর খস্রো নামে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক এবং কবি রাজমন্ত্রী ছিলেন। ইনি কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন এবং অনেক নতুন রাগ, নতুন গান, নতুন বাজনা ও তালের সৃষ্টি করেছিলেন। শোনা যায় তিনি নাকি একরকম 'তত' বাজনা অর্থাৎ তারের বাজনা ব্যবহার করতেন যাতে তিনটে প্রধান তার আর ১৪টা পর্দা ছিল। এই তিনটে তারের প্রথমটা লোহার এবং পরের দুটো পেতলের হত। তিন তারের এই যন্ত্রটাকে বলা হত 'সেহতার'। 'সেহতার' একটা ফার্সি শব্দ। 'সেহ' মানে তিন। এর থেকেই সেতার নামটা চালু হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুহম্মদ শাহের দরবারের শাহ সদারঙ্গজী সেতারে বীনার অনুকরণে আরও তিনটে তার জুড়ে ছটা তারের ব্যবহার শুরু করেন। আজকাল সেতারে সাতটা প্রধান তার থাকে। কিন্তু নামটা সেই রয়ে গেছে।

দুরকমের সেতার হয়—সাদা এবং তরফদার। শুধু প্রধান ৭টা তারওয়ালা সেতারকে বলে সাদা সেতার। আবার এই ৭টা তার ছাড়া পাশের দিকে ৯টা, ১১টা বা ১৫ টা তার লাগানো সেতারকে বলে তরফদার সেতার, অর্থাৎ পাশে তার লাগানো সেতার। আজকাল

অধিকাংশ সেতারেই ১৬ টা পর্দা থাকে। কেউ কেউ আরও কয়েকটা অতিরিক্ত পর্দাও ব্যবহার করেন।

ডান হাতের তর্জনীতে একটা তারের টুপি লাগিয়ে তাই দিয়ে তারে আঘাত করে সেতার বাজান হয়। এই ষ্টীলের তারের টুপিকে বলা হয় মিজ্রাব্ অথবা নক্কী।

বর্তমানে ভারতে দুটো প্রধান ঢঙে সেতার বাজান হয়—(১) দেহলী-বাজ (২) লখ্নৌই বা পূর্বীবাজ। শাহ সদারঙ্গজী খেয়ালের ঢঙে সেতারের জন্য বিলম্বিত ও মধ্যলয়ের গৎ তৈরী করেন। এই গৎকে বলা হয় 'দহলী-বাজ্' বা 'মসীদখানী' গৎ। আর 'লখনৌই 'বা 'পূর্বীবাজ' গৎ সৃষ্টি করেন সুপ্রসিদ্ধ যন্ত্র-শিল্পী গুলাম রজা। এই গৎ জলদ অর্থাৎ দ্রুতগতিতে বাজান হয় এবং গুলাম রজার নামানুসারে একে বলা হয় 'রজাখানী' গৎ।

বাদ্য যন্ত্র কত রকমের হয় ?

যন্ত্র সঙ্গীতকে প্রধান দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—সুর সঙ্গীত আর তাল সঙ্গীত। কিছু বাদ্যযন্ত্র সুর সৃষ্টি করে---যেমন বীণা, সেতার, সুরবাহার, সরোদ তানপুরা, সারেঙ্গী, এস্রাজ, বেহালা, একতারা, দোতারা, গোপীযন্ত্র, বাঁশী, সানাই ইত্যাদি। এগুলো হল সুরযন্ত্র। আবার কতকগুলো যন্ত্রকে আশ্রয় করে আছে তাল্—যেমন, পখাওয়াজ, মৃদঙ্গ, তবলাবাঁয়া, ঢোলক, ঢোল, ঢাক, খঞ্জনী, করতাল, মন্দিরা প্রভৃতি। এগুলোকে বলা হয় তাল যন্ত্র।

এইসব বাজনাগুলো মোট চার রকমের হয়—তত, শুষির, অবনদ্ধ বা আনদ্ধ এবং ঘন।

তাঁত বা পেতল অথবা ষ্টীলের তারে আঘাত করে যেসব যন্ত্রে স্বর তোলা হয়, তাকে বলে তত-যন্ত্র। বীণা, সেতার, সুরবাহার, তানপুরা, সারেঙ্গী, এস্রাজ, সরোদ, বেহালা, একতারা, দোতারা ইত্যাদি এই শ্রেণীর যন্ত্র। ততবাদ্য আবার দুরকমের—(ক) যে সব যন্ত্রের তারে আঙ্গুলের টোকা দিয়ে বাজান হয়। যেমন—বীনা, সেতার, সরোদ, তানপুরা ইত্যাদি। (খ) যে সব যন্ত্রের তারে বা তাঁতে গজ বা ছড় টেনে বাজান হয়। যেমন—এসরাজ, বেহালা, সারেঙ্গী, দিলরুবা ইত্যাদি। এগুলোকে বিতত-যন্ত্রও বলা হয়।

হাওয়া দিয়ে যে সব যন্ত্রে স্বর তোলা হয়, সেগুলোকে বলে শুষির-যন্ত্র। যেমন—বাঁশী, সানাই, হারমোনিয়াম, শাঁখ প্রভৃতি। এগুলোও

দুরকমের—(ক) যেগুলোতে রীড় (ধাতুর পাত) বা পাত্তির সাহায্যে স্বর সৃষ্টি করা হয়। যেমন—হারমোনিয়ম, অর্গ্যান ইত্যাদি। (খ) যেগুলো ফুঁ দিয়ে বাজান হয়। যেমন—বাঁশী, শাঁখ সানাই ইত্যাদি।

অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বাজনা কাঠ, ধাতু বা মাটির তৈরী খোলের মুখে চামড়া দিয়ে ছাইয়ে তৈরী করা হয়। ঐ চামড়ায় আঘাত করে শব্দ করা হয়। সাধারণতঃ সঙ্গীতের তাল রক্ষা করার জন্য এই বাজনা ব্যবহার করা হয়! পখাওয়াজ, শ্রীখোল, তবলা, ঢাক, ঢোল, ডমরু, কাড়া, নাকাড়া প্রভৃতি এই শ্রেণীর যন্ত্র।

যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র পেতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু বা কাঠ থেকে তৈরী করা হয় আর যেগুলো কোন ধাতু বা অন্য কিছুর ওপর ধাতু বা কাঠ দিয়ে আঘাত করে বাজান হয়, তাদের বলা হয় ঘন-যন্ত্র। এগুলো সাধারণতঃ গান-বাজনা ও নাচের সময় তাল দেবার জন্য ব্যবহার হয়। যেমন—মন্দিরা, করতাল, ঝাঁঝ, জলতরঙ্গ ইত্যাদি।

সারা ভারতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত খোলা তারের বাজনা কি ?

তানপুরা বা তম্বুর ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। যন্ত্রের রাজ্যে এর জোড়া মেলে না। সংগীতের ক্ষেত্রে তানপুরার দান অতুলনীয়। এই যন্ত্র রাজা থেকে দরিদ্রতম ব্যক্তি সবার কাছে সমান ভাবে আদরণীয়। বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তানপুরা অপরিহার্য।

তানপুরার দণ্ডটা কাঁঠাল, তুঁত বা সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরী হয়। এতে কাঠের পট্‌রী আর কাঠের চারটে কান থাকে। দণ্ডের নীচের দিকে গোল লাউয়ের খোল লাগান থাকে। এই খোলটার ওপর কাঠের তবলী আর তবলীর মাঝখানে কাঠ বা হাতীর দাঁতের অথবা হরিণের শিঙের তৈরী সওয়ারী বসান থাকে।

তানপুরায় চারটে তার থাকে। এর দুটো পেতলের, দুটো ষ্টীলের, অথবা একটা পেতলের তিনটে ষ্টীলের হয়। তারগুলো খোলের নীচ থেকে সওয়ারীর ওপর দিয়ে উঠে কানের নীচে বসান হরিণের শিঙ, কাঠ বা হাতীর দাঁতের তৈরী বাঁকানো সরু ব্রিজের মধ্যে দিয়ে কান পর্যন্ত থাকে।

প্রথম তার মন্দ্র সপ্তকের পঞ্চমে বা মধ্যমে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তার দুটো

মধ্য সপ্তকের ষড়জে এবং চতুর্থ তারটা মন্দ্র সপ্তকের ষড়জে বাঁধা হয়। সওয়ারী এবং প্রতিটি তারের মধ্যে সিল্কের সুতোর টুকরো জুড়ে দিয়ে সুরের জোয়ারী করতে হয়। তাতে সুন্দর সুর-ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়।

তানপুরা বাজানোর সময় তারগুলোর মূল স্বর ছাড়াও অন্য স্বরের ধ্বনি এর থেকে বেজে ওঠে। এই অন্য স্বরগুলোকে Overtone বা সহায়ক নাদ বলে। এগুলো সাধারণতঃ মূল স্বরের দ্বিগুণ থেকে ন'গুণ পর্যন্ত উঁচু হয়।

লক্ষ্মৌ, রামপুর, তাঞ্জোর, মীরাজ, বাংলা ও বম্বেতে ভাল তানপুরা তৈরী হয়। তানপুরার গায়ে হাতীর দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকার্য করে যন্ত্রটাকে আরও সুন্দর ও মূল্যবান করা হয়ে থাকে। আজকাল ছ'তারের তানপুরা পাওয়া যায়।

জ্যাজ কাকে বলে ?

এক ধরনের জনপ্রিয় সঙ্গীতের নাম জ্যাজ। আমেরিকার নিগ্রোরা প্রথম এই জ্যাজ-সঙ্গীত চালু করে। পরে পৃথিবীর নানা অঞ্চলের নানা রকমের সঙ্গীতের প্রভাব এই জ্যাজ বাজনার ওপর এসে পড়ে এবং এইসব নানা-সুরের মিশ্রণে জ্যাজ আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়।

জ্যাজের একটা প্রধান বৈশিষ্ট হল এর ছন্দ। জ্যাজের সুর বা melody আফ্রিকা আর ইউরোপের সঙ্গীত থেকে নেওয়া, কিন্তু সুরের ঐকতান বা harmony প্রধানতঃ ইউরোপের সঙ্গীতেরই অনুকরণ। জ্যাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল আগে থেকে কোনা প্রস্তুতি না নিয়ে গাওয়া বা বাজিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ গাওয়া অথবা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে সুর সৃষ্টি করে চলা। একে বলে improvisation ; এই imrovisation নির্ভর করে গাইয়ে বাজিয়ের জ্ঞান, দক্ষতা এবং তার মেজাজ বা মানসিক পরিস্থিতির ওপর। improvisation খুবই কঠিন কারণ নতুন সৃষ্টি করা সুর এমন হওয়া চাই যা মূল গানের সুর, ঐকতান এবং ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলবে। আবার একঘেয়ে হলে চলবে না অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে নতুনত্বের চমক থাকবে—সুর এবং ছন্দে—অথচ এ কাজ করতে হবে কোনো সময় না নিয়ে, শ্রোতাদের সম্মুখে গাওয়া বা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে।

বছরের পর বছর ধরে জ্যাজ অনেক পাল্টেছে এবং উন্নত হয়েছে, কিন্তু মূলতঃ জ্যাজের ঢং একই রয়ে গেছে। জ্যাজের নানা অংগের মধ্যে একটা প্রধান অংগ হল 'ব্লুজ'। জ্যাজের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এই 'ব্লুজ'

এর ওপর তৈরী। 'রক-এন্-রোল'-এরও প্রায় অর্ধেক এই ব্লুজ থেকেই নেওয়া। এমন কি আমেরিকার কিছু কিছু দেশী এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতও 'ব্লুজ'-এর ঢং-এ তৈরী। 'ব্লুজ' এসেছে আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাসদের কাছ থেকে। এর সুর প্রধানতঃ করুণ এবং আবেগময়।

নিউ অরলিন্সের সঙ্গীতজ্ঞরা জ্যাজের অনেক উন্নতি করে। নিউ অরলিন্সের জ্যাজ বা ডিক্সিল্যাণ্ড জ্যাজের মধ্যে 'ব্লুজ'-এর গভীর অনুভূতি, নিগ্রোদের আধ্যাত্মিক সুর, 'র‍্যাগটাইম' সঙ্গীত আর ইউরোপের লোকসঙ্গীত —সব কিছুরই স্বাদ পাওয়া যায়।

এরপর এল 'বিগ-ব্যাণ্ড জ্যাজ' বা 'সুইং'। তারপর ১৯৪০-১৯৫০ সালে এল 'আধুনিক জ্যাজ'। আধুনিক জ্যাজ ছন্দ এবং ঐকতানের দিক দিয়ে আগেকার জ্যাজের চেয়ে অনেক বেশী জটিল। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নানারকম বৈচিত্রপূর্ণ ছন্দ। নতুন নতুন তালের ওপর তৈরী হল সুর আর ড্রামাররাও খুব দুরূহভাবে বাজাতে শুরু করল।

১৯৬০-এ আর এক প্রস্থ এগোল জ্যাজ—সৃষ্টি হল 'নিউ থিং' বা 'নতুন জিনিস'। 'নিউ থিং' জ্যাজের স্বাধীন রূপ। এতে বাজিয়েরা খেয়াল খুশী-মত বাজনার গতি বা লয় বাড়িয়ে দিতে পারে। এর মানে এই নয় যে এটা সংগঠনের অভাব, আসলে এটা স্বাধীনভাবে মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা।

বর্তমানে 'ইন্দো-জ্যাজ' প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে জ্যাজ বাজনার অনেক মিল আছে। দুটোতেই improvisation বা প্রস্তুতি না নিয়ে খেয়ালখুশী মতো সুর সৃষ্টি করা যায় এবং মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। এই দুই ধারার সঙ্গীতের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে 'ইন্দো-জ্যাজ'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জ্যাজ ক্রমাগত নতুন নতুন রূপে উন্নত হচ্ছে, কিন্তু এর মূল গুণ আর রূপ একই রয়ে গেছে।

ব্যাল্যাড কাকে বলে ?

ব্যাল্যাড হল কাহিনীমূলক লোকসংগীত বা গাথা। মধ্যযুগে ইউরোপে এর উৎপত্তি হয়।

ব্যাল্যাডে সংলাপের মধ্য দিয়ে সহজ সরলভাবে গল্প বলা হয়—গানের মাধ্যমে। অনেক ব্যাল্যাডের সঙ্গে নাচ থাকে। ব্যাল্যাড বাজনা সহযোগেও করা হয় আবার বাজনা ছাড়াও করা হয়। কিন্তু ব্যাল্যাড সবসময় সুরের চেয়ে কথার ওপরই বেশী জোর দিয়ে গাওয়া হয়। যদিও ব্যাল্যাড সব সময়

কাহিনীর ওপরেই নজর দিয়ে গাওয়া হয়, তবুও ব্যাল্যাডের সুরগুলো অতি চমৎকার।

এক-এক দেশের ব্যাল্যাড এক এক রকম হয়, আর তাদের নামও হয় ভিন্ন ভিন্ন। ফ্রান্সে বলে 'বালাড', ইটালিতে 'বাল্যাটা', স্পেনে 'রোমান্স', আর রাশিয়ায় 'বাইলিনা'।

আমেরিকায় ব্যাল্যাড অনেক রকমের হয়। এক ধরনের হল ছ'-সাত যুগ পুরোনো বৃটিশ ইতিহাসের ঐতিহ্যময় ব্যাল্যাড। বংশ পরম্পরায় মুখে-মুখে এই সব ব্যাল্যাড চলে এসেছে এবং এর প্রচুর রদবদল করা রূপও প্রচলিত হয়েছে।

আরেক ধরনের ব্যাল্যাড শুরু হয় ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে। এদেরকে বলা হয় 'ব্রডসাইড ব্যাল্যাড'। খবরের কাগজের পেছনে ছেপে এক পেনী দামে এগুলো বিক্রী করা হত।

ইংরেজরা ব্যাল্যাডকে তাদের উপনিবেশে নিয়ে যায় এবং এর ব্যবহার অব্যাহত রাখে। এই বৃটিশ গানগুলোকে আদর্শ করে আমেরিকানরা অনেক ব্যাল্যাড তৈরী করে। এই সব ব্যাল্যাড তৈরী হয় 'জেসী জেম্‌স্' আর 'বিলি দি কিড'-এর মত দস্যুদের নিয়ে, 'জন হেনরী'-র মত বলিষ্ঠ পুরুষদের নিয়ে আর 'ইয়ং চারলট্'-এর মত হতভাগ্য মেয়েদের নিয়ে।

এই সব ব্যাল্যাড প্রায়ই পুরোনো বৃটিশ সুরে এবং কাঠামোয় তৈরী হলেও এতে আমেরিকার চেহারা এবং প্রভাব সন্নিবেশিত থাকে।

বেহালা কোথা থেকে এল ?

একটা সিমফনি অর্কেষ্ট্রার মোট বাজনদারদের সংখ্যা হয় একশ বা আরও বেশী। তার মধ্যে তিরিশ জনেরও বেশী বাজায় বেহালা। বেহালার সুরের মাধুর্য অনেক বেশী এবং এতে বহু রকম সুরের কারুকার্য ফুটিয়ে তোলা যায়।

অনেক যুগ ধরে বেহালা ক্রমে ক্রমে উন্নত হয়েছে। বেহালার ইতিহাস শুরু হয় ভারতবর্ষে। সম্ভবতঃ ভারতেই প্রথম ছড় দিয়ে তারের যন্ত্র বাজান চালু হয়। মধ্য যুগে ইউরোপে নানারকম তারের বাদ্যযন্ত্র তৈরী হয় যেগুলো ছড় দিয়ে বাজান হত।

এদের মধ্যে একটা যন্ত্র ছিল, নাম যার 'ভিয়েল'। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীতে ইউরোপে এর প্রচলন হয়। বেহালার মত ভিয়েল কাঁধে লাগিয়ে বাজান হত। পরে 'রিবেক' যন্ত্রের অনুকরণে ভিয়েলকে নতুনভাবে গড়া হয়।

রিবেক আরব দেশের বাজনা। স্পেন থেকে সারা ইউরোপে এই বাজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভিয়েলের মজবুত কাঠামোর সঙ্গে রিবেকের সুবিধাজনক কানগুলো জুড়ে একটা নতুন ধরনের বাজনা সৃষ্টি করা হয়।

বেহালা তার বর্তমান চেহারা পায় ১৫৫০ থেকে ১৬০০ সালের মধ্যে। কে যে প্রথম বেহালা তৈরী করেছিল, তা কেউ বলতে পারে না। ভাল জাতের বেহালা তৈরি শুরু হয় সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

ইটালীতে অনেক দক্ষ বেহালা-কারিগরের সন্ধান মেলে। প্রত্যেক কারিগরের তৈরীর পদ্ধতি স্বতন্ত্র এবং গোপনীয়—যা সে তার বাবা এবং পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শিখেছে। 'ক্রেমোনা' শহরের 'আমাতি' পরিবারের তৈরী বেহালার সুর ছিল অত্যুৎকৃষ্ট মধুর ও কোমল। এদের তৈরী বেহালার থেকে ভাল বেহালা কেউ কোনদিন যে করতে পারে, তা লোকে বিশ্বাস করত না।

কিন্তু নিকোলো আমাতির এক ছাত্র, অ্যানটোনিও স্ট্রাডিভারি, যাকে বলা হত গুরুর গুরু, এক ধরনের চ্যাপ্টা বড় বেহালা তৈরী করল, যার সুর আরও জোরালো এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। স্ট্রাডিভারি প্রায় ১,১১৬টা বেহালা তৈরী করেছিল, আর এর মধ্যে ৫৪০টা এখনও অটুট আছে। এর প্রতিটা প্রচুর দামী আর শিল্পকলার এক অপূর্ব নিদর্শন।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক বলা হয় নিকোলো পাগানিনিকে, যিনি ১৭৮৪ থেকে ১৮৪০ সাল অবধি বেঁচে ছিলেন। বর্তমানের শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক হলেন ইহুদী মেনুইন।

অর্কেষ্ট্রা কিভাবে শুরু হল ?

অনেক বাজিয়ে নানারকম বাজনা একসাথে বাজালে তাকে বলা হয় অর্কেষ্ট্রা। সাধারণতঃ একটা অর্কেষ্ট্রাতে কমপক্ষে পঁচাত্তর থেকে একশজন বাজিয়ে থাকে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী বাজায় তারের যন্ত্র। তারের যন্ত্রই অর্কেষ্ট্রার ভিত তৈরী করে। বাকীরা বাজায় 'উড-উইণ্ড' অর্থাৎ ক্ল্যারিওনেট, ওবো ইত্যাদি, 'ব্রাস' অর্থাৎ ট্রাম্পেট, হর্ন, ট্রমবোন ইত্যাদি আর 'পারকাশন্' অর্থাৎ ড্রাম্‌স্, ক্যাসটানেট্‌স্, টিমপানি ইত্যাদি।

এই ধরনের অর্কেষ্ট্রাকে বলা হয় 'সিমফনি অর্কেষ্ট্রা'। ছোট হল বা 'চেম্বার'-এ বাজানোর উপযোগী পনেরো থেকে ষোলোজন বাজনদারের অর্কেষ্ট্রাকে বলা হয় 'চেম্বার অর্কেষ্ট্রা'। আর সিমফনি অর্কেষ্ট্রার শুধু তারের যন্ত্রগুলো নিয়ে তৈরী অর্কেষ্ট্রাকে বলা হয় 'স্ট্রিং অর্কেষ্ট্রা'।

আধুনিক সিমফনি অর্কেস্ট্রা কয়েক শ' বছর ধরে গড়ে উঠেছে। অর্কেস্ট্রা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং রদ-বদল করা হয়েছে। আসলে সঙ্গীত রচয়িতারাই অর্কেস্ট্রাকে নতুন-নতুন রূপ দিয়েছে।

অর্কেস্ট্রার সঙ্গীত রচনার পথ-প্রদর্শক হলেন ইটালীর 'ক্লডিও মন্টেভার্ডি' (১৫৬৭—১৬৪৩)। অপেরার জন্যও তিনিই প্রথম সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর সুরারোপিত এক অর্কেস্ট্রায় তিনি পঁয়ত্রিশজন বাজনদারকে নিয়ে কাজ করেছিলেন, যারা নানারকম যন্ত্র বাজিয়েছিল, যেমন—ভায়োলা, গীটার, হার্পসিকর্ড, অর্গ্যান, ট্রাম্পেট, ট্রমবোন আর ফ্লুট।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন বেহালা সঠিক ভাবে তৈরী হল, তখন তারের যন্ত্রই অর্কেস্ট্রার প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠল। ফ্রান্সের বিখ্যাত অপেরা সুরকার 'রামিউ' (১৬৮৩-১৭৬৪) এবং আরও কয়েকজন সর্বপ্রথম অর্কেস্ট্রাতে ক্ল্যারিনেট ব্যবহার করতে শুরু করেন। তিনি সব সময় 'বেসুন' আর 'হর্ন'-ও কাজে লাগাতেন।

ইউরোপ পর্যটনকারী 'তুর্কী ব্যাণ্ড' বহু রকমের পারকাশান্ বাজনা চালু করে যায়, যেমন—বেস ড্রাম, ট্র্যাঙ্গল্, সিম্বাল্ ইত্যাদি। কাজেই সুরকাররা যেমন-যেমন যন্ত্র ব্যবহার করে গেছেন, অর্কেস্ট্রাও তেমন-তেমন ভাবে রূপ বদল করে এসেছে। যাঁরা সঙ্গীত রচনা করতেন তাঁরা এমন ভাবে সুর সৃষ্টি করতেন যাতে অর্কেস্ট্রাতে নতুন-নতুন সুর এবং রূপের উদ্ভব হয়।

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনী কি কি ?

মহাদেবের পাঁচটা মুখ—সদ্য, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। এই পঞ্চমুখ থেকে শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম ও মেঘ নামে পঞ্চরাগের সৃষ্টি হয়। পার্বতীর মুখ থেকে জন্ম নেয় নটনারায়ণ নামে আরেকটা রাগ। এই ছ'টা আদি রাগই হল পুরুষ রাগ। এদের প্রত্যেকের ছ'টা করে পত্নী। সুতরাং মোট রাগিনীর সংখ্যা হল ছত্রিশটা। অবশিষ্ট রাগগুলোকে এদের পুত্র কন্যা বলে ধরা হত।

শ্রী রাগের পত্নী হল—মালবশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, ভূপালী, বরাটী আর কল্যাণী। বসন্ত রাগের রাগিনীদের নাম—হিন্দোলী, গুর্জরী, মালবী, পঠমঞ্জরী, সাবেরী এবং কৌশিকী।

ভৈরব রাগের ছয় স্ত্রীর নাম—ভৈরবী, তোড়ী, রামকিরী, গুণকিরী, বাঙ্গালী ও সৈন্ধবী। পঞ্চম রাগের ভার্যারা হল—দেবকিরী, ললিতা,

বিভাষা, কর্ণাটী, বড়হংসিকা আর আভিরী। মেঘ রাগের পত্নীরা—মধুমাধবী, মল্লারী, সৌরাটী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারা এবং সারঙ্গী। নটনারায়ণের ছয় স্ত্রীর নাম—পাহাড়ী, দেশী, কেদারা, কামোদী, নাটিকা ও হাম্বিরী।

তখনকার দিনে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রাগ গাওয়া হত। যেমন—শিশিরে শ্রী, বসন্তে বসন্ত, গ্রীষ্মে ভৈরব, শরতে পঞ্চম, বর্ষায় মেঘ আর হেমন্তে নটনারায়ণ।

অবশ্য এই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী নিয়ে কিছু মতান্তর আছে।

বর্তমানে সঙ্গীত-শাস্ত্রে রাগিণী বলে কোন কথা নেই—সবই রাগ। আধুনিক মতে ভৈরব ও ভৈরবী, হিন্দোল ও হিন্দোলী প্রভৃতি সবগুলোকেই 'রাগ' বলা হয়।

ধ্রুপদ, ধামার এবং খেয়াল গানের মধ্যে তফাৎ কি?

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তিনটে প্রধান রূপ হল ধ্রুপদ, ধামার এবং খেয়াল।

ধ্রুপদ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সঙ্গীত। 'ধ্রু' মানে স্থির ও পবিত্র এবং 'পদ' মানে গান। প্রাচীনকালের ধ্রুব-প্রবন্ধ-গীতি থেকে এর উৎপত্তি। রাজা মান এই ধ্রুপদ গানের প্রচলন করেন। মোগল সম্রাট আকবরের দরবারে ধ্রুপদ গানের আদর ছিল। তাঁর সভায় বহু ধ্রুপদ-শিল্পীদের মধ্যে তানসেন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই সময় ধ্রুপদ গান লেখা হত হিন্দি, উদু আর ব্রজভাষায়। খেয়াল গনের চেয়ে ধ্রুপদ গান বেশী বিস্তৃত। ধ্রুপদে সাধারণতঃ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চারটে তুক বা অংশ থাকে। হিন্দুস্থানে অনেকে ধ্রুপদ গানকে জোরদার অথবা মর্দানা গান বলত কারণ বলিষ্ঠ, সুসংযত এবং খুব ভাল সাধক না হলে সঠিক ধ্রুপদ গান করা মোটেই সম্ভব নয়। ধ্রুপদ গানের ভাষা গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং প্রধানতঃ বীর, শৃঙ্গার এবং ভক্তিরস ব্যঞ্জক। সাধারণতঃ চৌতাল, সুরফাঁক, ঝাঁপ, তেওড়া, ব্রহ্ম এবং রুদ্রতালে ধ্রুপদ গাওয়া হয়। ধ্রুপদে মীড়, গমক ও বোলতান ব্যবহার করা হয় এবং মূল গানটাকে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি নামারকম ছন্দে গাওয়া হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ধ্রুপদ খুব জনপ্রিয় ছিল। এরপরে ক্রমশঃ খেয়াল গান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আধুনিক কালে ধ্রুপদ গানের চর্চা একেবারেই কমে গেছে।

রাধা-কৃষ্ণের বসন্তকালীন লীলার বর্ণনা নিয়ে 'হোরী' প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে। এই হোরী প্রবন্ধ ধামার তালে গাওয়া হলে তাকে ধামার গান বলা হয়। ধ্রুপদের মত ধামারেও বোলতান, মীড় ও গমক ব্যবহার করা হয় এবং দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি নানা ছন্দে গাওয়া হয়। সাধারণতঃ ধ্রুপদ গাইয়েরাই ধামার গান গেয়ে থাকেন।

খেয়াল গানের সৃষ্টি হয়েছে ধ্রুপদ গান থেকে। খেয়াল একটা ফার্সী শব্দ। খেয়াল গানে ধ্রুপদের চেয়ে অনেক স্বাধীনতা আছে। এতে মূল গানের নানা অংশকে রাগের নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন স্বর জুড়ে বিভিন্ন ছন্দে খেয়ালের রীতি অনুযায়ী গাওয়া যায়। ধ্রুপদ ও ধামারে তান ব্যবহার হয় না। কিন্তু খেয়াল তান, বোলতান, মীড়, গমক দিয়ে নানা বিচিত্র ছন্দে গাওয়া হয়। খেয়াল গানের প্রচলন করে জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কি। ১৮ শ শতাব্দীতে মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহের দরবারের প্রসিদ্ধ বীণকার নিয়ামৎ খাঁ বা সদারঙ্গ এবং তাঁর পুত্র ফিরোজ খাঁ বা অদারঙ্গ কয়েক সহস্র খেয়াল গান রচনা করেন। আজকাল সারা হিন্দুস্থানে তাঁদের রচিত অনেক গান গাওয়া হয়। তখনকার খেয়ালে চারটে করে তুক থাকত। এই তুক-গুলোকে বলা হত 'ওনার'। আজকাল খেয়ালে কেবল স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটো তুকই থাকে। খেয়াল দুরকমের—বড় খেয়াল ও ছোট খেয়াল। বড় খেয়াল তিলওয়াড়া, ঝুমরা, বিলম্বিত একতাল, বিলম্বিত ত্রিতাল প্রভৃতি তালে গাওয়া হয়। বড় খেয়ালের গতি ধ্রুপদের মত খুব বিলম্বিত লয়ে চলে আর এতে নানা রকম সুরের কারুকাজ করা হয় এবং এর প্রকৃতি হয় গাম্ভীর্যপূর্ণ। ছোট খেয়াল ত্রিতাল, একতাল, দাদরা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি মধ্য ও দ্রুত লয়ের তালে গাওয়া হয়। এর প্রকৃতি বড় খেয়ালের চেয়ে চঞ্চল।

ঠুংরী, টপ্পা আর গজল গান কাকে বলে ?

ঠুংরী এক ধরনের ছোট গান। এর রচনা শৃঙ্গার রসাত্মক এবং সংক্ষিপ্ত। ঠুংরী প্রধানতঃ কাফী, ঝিঁঝোটি, পীলু, বরওয়া, খাঁড, ভৈরবী, খমাজ ইত্যাদি রাগে গাওয়া হয়। এতে রাগের শুদ্ধতার দিকে তত নজর দেওয়া হয় না। ভিন্ন ভিন্ন রাগের মিশ্রণে ঠুংরী গাওয়া হয়। ঠুংরী পাঞ্জাবী ত্রিতাল, যৎ, দাদরা, আদ্ধা ইত্যাদি তালে গাওয়া হয়। লক্ষ্ণৌ এবং বারাণসীর ঠুংরী সব চাইতে লোকপ্রিয় এবং শ্রুতিমধুর।

'টপ্পা' একটা হিন্দী শব্দ। প্রাচীনকালে পাঞ্জাবী উট-পালকেরা এই গান গাইত, যদিও তখন এতে বিশেষ মাধুর্য্য এবং বৈচিত্র ছিল না। পরে

শোরীমিয়াঁ সভ্য সমাজে টপ্পার প্রচলন করেন। টপ্পার রচনায় খুব কম শব্দ ব্যবহার করা হয় এর বেশীর ভাগ শব্দই পাঞ্জাবী। টপ্পার প্রকৃতি চঞ্চল এবং আদিরসাত্মক। টপ্পায় স্থায়ী এবং অন্তরা এই তুটো ভাগ থাকে। টপ্পা প্রধানতঃ কাফী, ঝিঁঝোটি, পীলু, বারওয়া, মাঁড, ভৈরবী, খমাজ ইত্যাদি রাগে গাওয়া হয়। খেয়ালে যে সব তাল ব্যবহার করা হয়, টপ্পাতেও সেই সব তাল ব্যবহার করা হয়।

গজল প্রধাণতঃ শৃঙ্গার রসাত্মক। কোন কোন গজল গান গম্ভীর প্রকৃতির ও উচ্চভাবপূর্ণ হয়। বেশীর ভাগ গজলই উর্দু এবং ফার্সী ভাষায় লেখা। গজল গানে অনেকগুলো চরণ বা অংশ থাকে। স্থায়ী ছাড়া বাকী চরণগুলোকে অন্তরা বলা হয়। সব অন্তরাই একই সুরে গাওয়া হয়। পস্তু এবং দীপচন্দী তালেই বেশীর ভাগ গজল গাওয়া হয়। ঠুংরী ও টপ্পার মত গজলও সাধারণতঃ কাফী, ঝিঁঝোটি, পীলু, বারওয়া, মাঁড, ভৈরবী, খমাজ প্রভৃতি রাগে গাওয়া হয়। গজল ভাল করে গাইতে গেলে খুব ভাল ভাষা-জ্ঞান থাকা দরকার।

মার্গ সঙ্গীত ও দেশী সঙ্গীত কাকে বলে ?

ব্রহ্মার আদেশে মহাদেবের সামনে ভরত যে গান গেয়েছিলেন তাকে মার্গ সঙ্গীত বলে। প্রাচীনকালে সাধক গায়কেরা আধ্যাত্মিক উন্নতি বা আত্ম-শুদ্ধি ও মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য মার্গ সঙ্গীত গাইতেন। মার্গ সঙ্গীতকে গান্ধর্বও বলা হয়, কেননা স্বর্গলোকে গন্ধর্বেরা বা দেবগায়কেরা বা বেদগায়কেরা দেবলোকে দেবোপাসনার উদ্দেশ্যে এই গান গাইতেন। সামগানের পর সামের উপদান নিয়ে মার্গ সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়। গান্ধর্ব গীত বা মার্গ সঙ্গীতের প্রচলন অনেকদিন আগেই তিরোহিত হয়েছে। বর্তমানে এ গানের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন কিছুই জানা যায় না।

মার্গ সঙ্গীত যেমন দেবলোকের, তেমনি দেশী সঙ্গীত মর্তলোকের গান। ছেলে-মেয়ে, রাজা-দরিদ্র, পশুপালক-মাঝি ইত্যাদি প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছায় অনুরাগের সঙ্গে যে গান করে তাকেই বলা হয় দেশী সঙ্গীত। দেশী সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের মনোরঞ্জন করা। মার্গ সঙ্গীতের মত দেশী সঙ্গীতে নিয়মের বন্ধন নেই। দেশী সঙ্গীত নিয়মের শাসনমুক্ত। দেশী সঙ্গীত প্রধানতঃ তু'রকমের। এক রকম হল নিয়মবদ্ধ অভিজাত রূপের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। এতে নিয়ম মানা হলেও নিজের রুচি ও প্রতিভা এবং জ্ঞান অনুযায়ী গায়কেরা কিছু কিছু স্বাধীনতা অবলম্বন করতে পারেন। আরেক

রকমের দেশী সঙ্গীত হল সহজ সরল আঞ্চলিক সঙ্গীত যাকে বলা হয় লোক-সঙ্গীত।

কীর্তন কাকে বলে ?

কীর্তন বাঙ্গালীর এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীত। রাধাকৃষ্ণের রূপ-গুণ, লীলা ইত্যাদি বর্ণনা করে যে প্রশংসাগীতি গাওয়া হয়, তাকে কীর্তন বলে। এই প্রশংসাসূচক 'কীর্তিগাথা' থেকে 'কীর্তন' নামটা আসে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে কীর্তনের ধারা বাংলাদেশের কাব্য এবং ভাবধারাকে প্রভাবান্বিত করে এসেছে। কীর্তনের সঙ্গে ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের অনেক মিল দেখা যায়, এজন্য কেউ কেউ কীর্তনকে প্রাচীন বাংলার মার্গ-সঙ্গীত বলে থাকেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আগে কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের লেখা পদাবলী অবলম্বনে কীর্তন গান করা হত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভু কীর্তনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রেম-ধর্ম প্রচার করেন। তাই অনেকে তাঁদেরকেই কীর্তনের প্রবর্ত্তক বলেন।

কীর্তনের প্রধানতঃ দুটো ভাগ—নাম সংকীর্তন ও লীলা কীর্তন বা রস কীর্তন।

ভগবানের নাম ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে বা তালে এবং বিভিন্ন রাগে সমবেত কণ্ঠে গাওয়াকে নাম সংকীর্তন বলে। যেমন—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'; অথবা 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ'। চিত্তশুদ্ধিই নাম সংকীর্তনের লক্ষ্য।

রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে যে গান গাওয়া হয় তাকে লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন বলে। লীলাকীর্তনের পাঁচটা শাখা—গরেরহাটি বা গরাণহাটি, মনোহরসাহী, রাণিহাটি বা রেনিটি, মন্দারিনী আর ঝাড়খণ্ডি। পাঁচটা জায়গার নাম থেকে এই পাঁচটা সম্প্রদায় ও ঘরোয়ানার সৃষ্টি হয়।

দু'শ্রেণীর কীর্তন গায়ক দেখা যায়। এক শ্রেণী সহজ সরল সুর, তাল ও ভাষা দিয়ে সাধারণের উপযোগী কীর্তন করেন, আর এক শ্রেণী প্রাচীন পদ্ধতিতে ভজন গানের মত কীর্তন গেয়ে থাকেন।

কীর্তন গানের সঙ্গে প্রধানতঃ শ্রীমহাপ্রভু প্রবর্তিত মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল এবং করতাল সংগৎ করা হয়।

শ্যামাসঙ্গীত সর্বপ্রথম কে রচনা করেন ?

বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দী থেকে শ্যামা মা-কে নিয়ে এক বিশিষ্ট সঙ্গীত ধারা চলে এসেছে। একেই বলা হয় শ্যামা সঙ্গীত। কীর্তন যেমন বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনে গাওয়া হয়, শ্যামাসঙ্গীত তেমনি শাক্ত পদাবলী অবলম্বনে গাওয়া হয়।

দেড় শ'র ওপর রচিয়তার লেখা প্রায় চার হাজার শ্যামাসঙ্গীত শুনতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে যে শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে গেছেন তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। কিন্তু এই সব রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনিই শ্যামাসঙ্গীতকে এক অভূতপূর্ব ভাব, ভাষা আর সুরের সমন্বয়ে অপূর্ব রূপ দিয়ে গেছেন। তাঁর এই সৃষ্টি 'প্রসাদী সুর' নামে বিখ্যাত। অন্য কোন সাধন সঙ্গীতই রামপ্রসাদের গানের মত এত তাড়াতাড়ি এত গভীরভাবে ভক্তের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। রাম-প্রসাদ বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ সাধক কবি।

এছাড়া আরও অন্য বহু শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতার নাম পাওয়া যায় যাঁরা শ্যামাসঙ্গীতকে মানুষের মনে স্থান করে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন—কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা,) কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু, হরু ঠাকুর, গোবিন্দ চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহতাব চাঁদ, (মহারাজ), দাসরথি রায়, এন্টনি সাহেব, রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ), কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি।

শ্যামাসঙ্গীত বিভিন্ন শুদ্ধ ও মিশ্র রাগে একটা স্বতন্ত্র প্রণালীতে গাওয়া হয়। বিভিন্ন তালে শ্যামাসঙ্গীত গাওয়া হয়—চোতাল, তেওড়া, যৎ, সুল-তাল, আড়াচৌতাল, একতাল, ঝাঁপতাল, ত্রিতাল ইত্যাদি।

বৈষ্ণব পদাবলীর মত শাক্ত পদাবলীকে ভাব হিসেবে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ভক্তের আকুতি, মনোদীক্ষা, ইচ্ছাময়ী মা, করুণাময়ী মা, কালভয়হা-রিণী মা, লীলাময়ী মা, ব্রহ্মময়ী মা, মাতৃপূজা, সাধন শক্তি, নামমহিমা, চরণ-তীর্থ প্রভৃতি।

বাংলার সাধকেরা কালী ও কৃষ্ণের অভেদ রূপ কল্পনা করেছেন। কৃষ্ণ পূজার প্রচার ও প্রভাব বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও দেখা যায়। কিন্তু মাতৃরূপে দুর্গা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতির আরাধনা এবং মাকে মেয়ে রূপে

কল্পনা করে বাংলার ভক্ত ও সাধকেরা যে নতুন ভাবধারার সন্ধান দিয়েছেন তার নিদর্শন পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না।

বেদ বা শ্রুতি কি ?

বেদ বা শ্রুতি একখানা বইয়ের নাম। এতে ধর্মের আর মন্ত্রের কথা লেখা আছে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিঃশ্বাস থেকে এই বই তৈরি হয়েছে। কোনও পুরুষ বা মানুষ এই বই লেখে নি। তাই একে বলে অপৌরুষেয়। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদের মন্ত্রগুলিকে চার ভাগে ভাগ করেন। তাই তাঁর নাম বেদব্যাস অথবা ব্যাসদেব। বড়ো বড়ো মনীষীরা এই সব মন্ত্র উচ্চারণ করে সাধন-ভজন করতেন। পরিবারের লোকেরা সেই সব মন্ত্র শুনে মনে করে রাখতেন। তাঁদের কাছ থেকে অন্য লোকেরা আবার শুনে নিয়ে, অন্য লোকদের শোনাতেন। এই জন্য বেদের আর একটি নাম শ্রুতি। বেদ চারটি—ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ।

পুরাণ কাকে বলে ?

এটি একটি প্রাচীনকালের বইয়ের নাম। সুন্দর সুন্দর গল্প বলে ধর্মকে পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়েছে। ব্যাসদেব ও আরো অনেক মুনি ও ঋষিরা এই সব পুরাণের গল্প লিখে গেছেন। স্বর্গ, নরক, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মানুষ, ভগবান, বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী আছে। পুরাণ দুই রকম। একটি মহাপুরাণ, আর একটি উপপুরাণ। মহাপুরাণ ১৮টি। ইহা তিন প্রকার। ১। সত্ব মহাপুরাণ ছয়টি—যেমন—বিষ্ণু পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, গরুড় পুরাণ, পদ্ম পুরাণ ও বরাহ পুরাণ। ২। রজঃ মহাপুরাণ ছয়টি—ব্রহ্ম পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ ও বামপুরাণ। ৩। তম মহাপুরাণ ছয়টি—মৎস্য পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, শিব পুরাণ (বায়ু পুরাণ), স্কন্দ পুরাণ, ও অগ্নি পুরাণ।

উপনিষদ বা বেদান্ত বলতে কি বোঝায় ?

বেদের শেষ ভাগকে বলে উপনিষদ। এই জন্য এর অপর নাম হলো বেদান্ত। বিভিন্ন মুনি ও ঋষিরা উপনিষদের বিষয়ে বলে গেছেন। বেদে বেশির ভাগ কাজের কথা বলা হয়েছে। বেদান্ত বা উপনিষদে বেশির ভাগ

জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। উপনিষদের বইগুলি সংখ্যায় অনেক। এইগুলির মধ্যে ১২ খানি প্রধান। যেমন—ঋগ্ বেদীয় উপনিষদ্ (১) ঐতরেয় (২) কৌশীতকী; সামবেদীয় উপনিষদ—(৩) ছান্দোগ্য, (৪) কেন; যজুর্বেদীয় উপনিষদ্ (৫) তৈত্তিরীয়, (৬) কঠ, (৭) শ্বেতাশ্বতর, (৮) বৃহদারণ্যক, (৯) ঈশ, (১০) প্রশ্ন, (১১) মুণ্ডক, (১২) মাণ্ডুক। আর যে সব উপনিষদ আছে, সেগুলি সব অথর্ববেদীয় উপনিষদ্।

উপবেদ কি ?

উপবেদের স্থান বেদের চেয়ে অনেক নীচে। বেদ বা শ্রুতির সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। উপবেদ বিজ্ঞান বিষয়ের বই। সকল বেদেরই উপবেদ আছে। ঋগবেদের উপবেদ হলো আয়ুর্বেদ, যজুর্বেদের উপবেদ হলো ধনুর্বেদ; সামবেদের উপবেদ হলো গন্ধর্ববেদ; এবং অথর্ববেদের উপবেদ হলো স্থাপত্যবেদ।

উপপুরাণ কাকে বলে ?

ছোটো পুরাণকেই উপপুরাণ বলে। পুরাণ যেমন ১৮টি; উপপুরাণও তেমনি ১৮টি। নানা মুনি ও ঋষিদের রচনা এই সব উপপুরাণের মধ্যে আছে। যেমন—আদিত্য বা আদি উপপুরাণ, নৃসিংহ উপপুরাণ, বায়ু উপপুরাণ, শিবধর্ম উপপুরাণ, দুর্বাসা উপপুরাণ, নারদ উপপুরাণ, নন্দিকেশ্বর উপপুরাণ, উশন উপপুরাণ, কপিল উপপুরাণ, বরুণ উপপুরাণ, কালিকা উপপুরাণ, মহেশ্বর উপপুরাণ, পদ্ম উপপুরাণ, দেব উপপুরাণ, পরাশর উপপুরাণ, মরীচি উপপুরাণ, ভাস্কর উপপুরাণ এবং শাম্ব উপপুরাণ।

ঋগ্ বেদে কী আছে ?

চারটি বেদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বেদ হলো ঋগ্ বেদ। যেসব মন্ত্র দিয়ে দেবদেবীর বন্দনা করা হয়, তাকে বলে ঋক্। ঋগ্ বেদে এই সব ঋকই বেশি আছে। এদের সংখ্যা প্রায় ১০,৫৮০। এর মধ্যে ১৬৩টি লোপ পেয়েছে। বাস্কল, অশ্বলায়ন, শঙ্খায়ন, মণ্ডুক, শাকল প্রভৃতি ঋষিরা এইসব মন্ত্র চর্চা করতেন। অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, উষা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পৃথিবী, বায়ু, রুদ্র, যম এবং সোম দেবতাদের স্তবস্তুতি করা হয় এই সব মন্ত্রের দ্বারা।

সামবেদ কী?

সামবেদ একটি প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রের নাম এবং বেদের দ্বিতীয় ভাগ। বেদের প্রথম ভাগ ঋক্‌বেদে যে সব মন্ত্র আছে, সেগুলি কেবল উচ্চারণ করে দেব-দেবীদের বন্দনা করা হয়। সেগুলিকে বলা হয় ঋক্। এইগুলিকে যখন নানারকম সুর দিয়ে গান করা হয়, তখন সেইগুলিকেই বলা হয় সাম। সাম-বেদে এই সব রাগরাগিনীযুক্ত মন্ত্র আছে।

যজুর্বেদ কি?

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মের বই বেদের তৃতীয় ভাগকে বলে যজুর্বেদ। কিভাবে যজ্ঞ করতে হয়, কি কি নিয়ম পালন করতে হয় এবং কি কি মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়—এই সব বিষয়ে এই বইতে লেখা আছে। যজুর্বেদের দুইটি ভাগ আছে। একটি কৃষ্ণ যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা, এবং আর একটি শুক্ল যজুর্বেদ বা বাজসনেয়ি সংহিতা। এই বেদের মন্ত্রগুলি গদ্যের আকারে লেখা।

অথর্ববেদ কি?

বেদের চতুর্থ ভাগকে বলা হয় অথর্ববেদ। অথর্ববেদ কিছুটা ব্রহ্মার উত্তর দিকের মুখ থেকে, আর বাকিটা ব্রহ্মার পূর্ব দিকের মুখ থেকে প্রকাশ হয়েছিল। এই বেদ নয় ভাগে বিভক্ত। এতে ৭৩০ সূক্ত ও ২০ খণ্ড আছে। এর কিছুটা গদ্যে এবং কিছুটা ছন্দে রচনা করা হয়েছে।

অগ্নি কে?

সাধারণ আগুনকেই বলা হয় অগ্নি। অগ্নির জন্ম হয়েছে পাঁচভাবে। প্রথম ভাগ হয়েছে পৃথু রাজার কন্যা পৃথিবীর গর্ভ থেকে। দ্বিতীয় ভাগ হয়েছে দুইটি অরণি অর্থাৎ চকমকি পাথর থেকে। তৃতীয় ভাগের জন্ম দাতা হলো দুইটি টুকরো শুকনো কাঠ। চতুর্থ ভাগের জন্মদাতা হলো অঙ্গিরা ঋষি। অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিত (বিষ্ণু পুরাণ)। পঞ্চম ও শেষ ভাগের জনক-জননী হলেন ধর্ম ও বসুভার্যা (মহাভারত)। এই পাঁচটি অংশে একত্রিত হয়ে এক বিরাট শক্তি হলেন অগ্নিদেব। এঁর স্ত্রী হলেন দক্ষরাজের কন্যা স্বাহা। অগ্নি থেকেই জলের উৎপত্তি। অগ্নির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে

তার বাবা ও মাকে অর্থাৎ দুইটি চকমকি পাথর ও দুইটি শুকনো কাঠকে খেয়ে ফেলে। পাখীর যেমন দুবার জন্ম হয়, অগ্নিরও দু'বার জন্ম হয়। একবার আকাশে ও আর একবার পৃথিবীতে। আকাশে এঁর নাম সূর্য ও বিদ্যুৎ, আর পৃথিবীতে নাম হলো অগ্নি। তাই অগ্নির এক নাম দ্বিজ। প্রতি ঘরেই এঁর অধিষ্ঠান বলে এবং নানাভাবে এর জন্ম হয় বলে এঁর নাম বহুজন্মা। অগ্নি ছাড়া কোন যজ্ঞই হয় না, তাই এঁকে পুরোহিত বলা হয়। অগ্নি হলেন দেবতা ও মানুষের মধ্যস্থ। দুইটি কাঠের ঘর্ষণে এঁর জন্ম বলে, এঁর নাম প্রমন্থ (গ্রীক ভাষায় প্রমিথিউস্)। আর এক নাম ভরন্যু বা গ্রীক ভাষায় ফোরোনীউস্। এছাড়াও আরো অনেক নাম আছে। যেমন—ঘৃতপৃষ্ঠ, অজহস্ত, নীলপৃষ্ঠ, জ্বালাকেশ, হিরণ্যকেশ, বহ্নি, পিঙ্গলশত্রু, রোহিতাশ্ব, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা, হিরণ্যদন্ত, ছাগরথ, জ্বালাময়, মধুজিহ্ব, ধূমকেতু, সপ্তজিহ্ব, তোমরধর, ত্রিজিহ্ব, অনল, পাবক, হুতাশন, বৈশ্বানর। পৃথিবীর দেবতাদের মধ্যে অগ্নি হলেন প্রধান। ইনি ইন্দ্রের মতই শক্তিমান ও সহস্রজিৎ।

অগ্নিদেব এক রাক্ষসের কাছে মহর্ষি ভৃগুর স্ত্রী পুলোমার পরিচয় দেন। রাক্ষস পুলোমাকে হরণ করে নিয়ে যায়। হরণকালে গর্ভবতী পুলোমার গর্ভচ্যুত হয়ে মহর্ষি চ্যবনের জন্ম হয়। সেই শিশুর তেজে রাক্ষস পুড়ে মারা যায়। মহর্ষি ভৃগু অগ্নিদেবকে শাপ দেন—'তুমি সর্বভুক হবে।' অগ্নিদেবও কোনো যজ্ঞের কাজে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃত হন। অগ্নিদেবের পিতামহ ব্রহ্মা তখন অগ্নিদেবকে বলেন—তুমি সদা পবিত্র থাকবে। তোমার শেষ শিখাগুলিই সর্বভুক হবে। মুখে যে অগ্নি দেওয়া হবে, তা দেবতাদের কাজে লাগবে।

এদিকে যজ্ঞে দেওয়া ঘি খেয়ে খেয়ে, অগ্নিদেবের শরীর খুব খারাপ হলো। ব্রহ্মা বললেন—খাণ্ডব বন খেলে অর্থাৎ সেই বনের সব জীবজন্তু, গাছপালা খেলে শরীর ভালো হতে পারে। সেই বন দেবতাদের জন্য সংরক্ষিত। তাই তা খেতে গিয়ে ইন্দ্র অগ্নিকে বাধা দিলেন। অগ্নি কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্য চাইলেন। তাঁরা রাজী হলেন। অগ্নিদেব তখন বরুণদেবের কাছ থেকে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অর্জুনকে এবং সুদর্শনচক্র ও কৌমদকী গদা শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্যে অগ্নিদেব সেই খাণ্ডব বন খেয়ে রোগমুক্ত হলেন।

অগ্নিদেবের বাহন হলো ছাগল। এঁর চারটি হাত, লাল রঙের ঘোড়া এঁর রথ টানে। সপ্তবসু হলো এঁর রথের চাকা। ইনি কালো কাপড় পরেন, হাতে জলন্ত বর্শা। রথের মাথায় ধোঁয়া রঙের পতাকা ওড়ে।

অগ্নিপরীক্ষা কাকে বলে ?

(ক) পুরাকালে ভারতবর্ষে নিয়ম ছিল, কোনও নারীকে খারাপ বলে সন্দেহ করা হলে, তাকে অগ্নিপরীক্ষা করা হতো। লাঙলের একটা লোহার টুকরো আগুনে গরম করে—তার জিভে ঠেকান হতো। জিভ যদি না পুড়তো, তাহলে তাকে যথার্থ সতী বলে ঘোষণা করা হতো।

(খ) সীতা-উদ্ধারের পর সীতার চরিত্রে প্রজাদের সন্দেহ হয়। তাই সীতা এই অপমানে প্রাণ বিসর্জন করার জন্য আগুনে প্রবেশ করেন। অগ্নিদেব সকলের সামনের সীতাকে ধরে আগুন থেকে বেরিয়ে আসেন ও শ্রীরামচন্দ্রের হাতে তাহাকে তুলে দেন। একে-ও অগ্নিপরীক্ষা বলা হয়।

অক্ষৌহিণী কি ?

পুরাকালের ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনীর এই নাম ছিল। এইদলে পদাতিক সৈন্য থাকতো ১০৯,৩৫০; অশ্বারোহী সৈন্য ৬৫,৬১০ টি, হস্তীবাহী সৈন্য ২১,৮৭০টি এবং রথ থাকতে ২১,৮৭০টি।

অঘোরপন্থী কাদের বলে ?

অঘোর মানে শিব। অঘোরপন্থী, অঘোরতন্ত্রী বা অঘোরী নামে এক উপাসক সম্প্রদায়। এদের আদর্শ হলো "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।" পচা, গলা মড়া, এমন কি, নিজের মলমূত্রও খেয়ে থাকে। মানুষের মাথার খুলি করে মদ খায়। শরীর সাফ করে না। নরবলিদ্বারা পূজা করে। নির্বিকার ও নিঘৃণ্য এদের মূলমন্ত্র। এদের আদি বাসস্থান ছিল বরোদা রাজ্যে।

অজাতশত্রু কে ?

(ক) উপনিষদের এক রাজা। বারাণসীতে এঁর রাজধানী ছিল। মহর্ষিগণ এঁকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে এসে এঁর ব্রহ্মজ্ঞান দেখে অবাক হয়ে যান। ব্রহ্মজ্ঞানী ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।

(খ) ভগবান বুদ্ধদেবের একজন প্রধান ভক্ত মগধের মহারাজা বিম্বিসার এবং মগধের মহারানী কোশল রাজকন্যা বৈদেহীর পুত্র হলেন এই অজাতশত্রু। ভগবান বুদ্ধের আপন মামাতো ভাই ও শ্যালক এবং বুদ্ধপত্নী যশোধরার

বড়ো ভাই, বুদ্ধ বিদ্বেষী ও ভণ্ড তপস্বী দেবদত্ত ছিলেন অজাতশত্রুর গুরু। দেবদত্তের চক্রান্তে অজাতশত্রু সিংহাসনের লোভে পিতা বিম্বিসারকে বন্দী করে অনাহারে কারাগারে রেখে তিলে তিলে তাকে বধ করেন। দেবদত্তের মৃত্যুর পর অজাতশত্রু নিজের ভুল বুঝতে পেরে বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন এবং বুদ্ধের একজন প্রকৃত ভক্ত হয়ে উঠেন। বুদ্ধদেব তাকে ক্ষমা করেন ও আশ্রয় দেন এবং কিছুদিন পরে নির্বাণলাভ করেন।

অজিত কাদের বলে ?

কয়েকজন দেবতার নাম অজিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করা একলার পক্ষে সম্ভব হবে না বলে, প্রজাপতি জয় নামে বারোজন দেবতাকে সাহায্যকারী হিসাবে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি মানেই দুঃখ। সেই দুঃখকে এড়াবার জন্যই এঁরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি পাবার আশায় ধ্যানে বসে যান। সৃষ্টির অসুবিধা হচ্ছে দেখে, ব্রহ্মা এঁদের শাপ দেন যে, এঁরা বার বার জন্মাবেন। বায়ুপুরাণের মতে, এইভাবে এঁরা বার বার জন্মেছিলেন। যথা—অজিতগণ, তুষিতগণ, সত্যগণ, হরিগণ, বৈকুণ্ঠগণ, সাধ্যগণ ও আদিত্যগণ।

অতিকায় কে ?

রাবণের এক ছেলের নাম। বিশাল ও বিরাট শরীরের জন্য একে এই নামে ডাকা হতো। হাতী, ঘোড়া এবং নানা প্রকার অস্ত্র ভালোভাবে চালাতে পারতেন। ব্রহ্মার বরে দেবতা ও অসুররাও একে মারতে পারতেন না। ইন্দ্রের বজ্র (বাজ) এবং বরুণের পাশ (দড়ির ফাঁস) অতিকায়কে জব্দ করতে পারে নি। পরে রাম রাবণের যুদ্ধে ইনি মারা যান।

অতিবলা কী ?

মন্ত্রপূত এক প্রকার বিদ্যার নাম। কৃশাশ্ব মুনির কাছ থেকে বিশ্বামিত্র মুনি এই বিদ্যালাভ করেছিলেন আশ্রমে রাক্ষসদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য। বিশ্বামিত্র মুনি যখন শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে যান, তখন তিনি শ্রীরামকে এই শিক্ষা দেন। শ্রীরাম এই বিদ্যার দ্বারা তাড়কাকে বন থেকে জন্মের মতো তাড়িয়ে দেন। এই বিদ্যা শিখলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। কোনও লোক কিছু ক্ষতি করতে পারে না।

অনন্তনাগ কাকে বলে ?

নাগাদের মধ্যে ইনি সর্বপ্রধান ও শেষ নাগ। কশ্যপ মুনি এঁর পিতা, কদ্রু এঁর মা এবং তুষ্টি এঁর স্ত্রী। এঁর কঠোর তপস্যায় খুসী হয়ে ব্রহ্মা এঁকে বর দেন। অনন্তদেব তখন রসাতলে গিয়ে পৃথিবীকে নিজের মাথায় ধারণ করেন। ব্রহ্মা খুসী হয়ে সাপেদের চিরশত্রু গরুড়কে অনন্তদেবের বন্ধু করে দেন। অনন্তনাগকে অনন্তদেব, শেষ নাগ ও বাসুকিনাগ'ও বলা হয়। কালিকাপুরাণে আছে—প্রলয় হলে পর নারায়ণ লক্ষ্মীর সঙ্গে অনন্তদেবের মাঝের ফণায় শুয়ে থাকেন। ছয়টি ফণা লক্ষ্মীনারায়ণকে ছাতার মতো রক্ষা করে। দক্ষিণ ফণায় মাথা ও উত্তর ফণায় পা রেখে নারায়ণ বিশ্রাম করেন। বিষ্ণু পুরাণ মতে বলরাম হলেন এই অনন্তদেবের অবতার। দ্বারকায় বটগাছের নীচে যোগসমাহিত হয়ে বলরাম বসে থাকেন। তখন হাজার ফণাওলা একটা লাল বিরাট অজগর বলরামের মুখ থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ভিতর ঢুকে যায়। তখনই বলরামের মৃত্যু হয়।

অন্তরীক্ষ ও আকাশ কি এক ?

(ক) সাধারণ অর্থে অন্তরীক্ষ মানেই আকাশ। কিন্তু অন্তরীক্ষ বলে আকাশের একটি অংশকে। ভুবর্লোক, স্বর্গলোক এবং পৃথিবীর মাঝামাঝি হল অন্তরীক্ষ। অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষরা এইখানে বাস করেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র যযাতি ইন্দ্রের পাপে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে এই অন্তরীক্ষে বাস করেন। পরে দৌহিত্রদের পুণ্যবলে যযাতি আবার স্বর্গলোকে ফিরে গিয়ে মুক্তিলাভ করেন।

(খ) যাঁরা বেদ বিভাগ করেন, তাঁদের বলা হয় ব্যাস। ২৮ জন মুনি বেদ বিভাগ করেছিলেন। অন্তরীক্ষ মুনি হলেন ১৩ সংখ্যক ব্যাস। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হলেন শেষ ব্যাস।

অবতার কেন হয় ?

অধর্মকে নাশ করার জন্য, ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবান নানা মূর্তি ধরে পৃথিবীতে আসেন। একেই বলে অবতার। অবতার সাধারণতঃ দু'রকম হয় :—পূর্ণাবতার ও অংশাবতার। তিনি বার বার অবতীর্ণ হয়েছেন এবং বার বার অবতীর্ণ হবেন। সেইজন্য অবতারের সংখ্যা অনেক। সাধারণতঃ দশ রকম অবতারের কথাই আমরা

জানি। প্রথমে তিনবার সত্যযুগে জন্তুর আকারে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। যেমন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ অবতার। বিবর্তন নীতির মাধ্যমে পরিবর্তনের ফলে কিছুটা জন্তু ও কিছুটা মানুষের আকার নিয়ে একবার অবতীর্ণ হন সত্যযুগে। ইনি হলেন চতুর্থ নৃসিংহ অবতার। পরে ত্রেতাযুগে নররূপ ধারণ করে এলেন; কিন্তু পূর্ণশরীর হলো না। ইনি পঞ্চম বামন অবতার। পূর্ণ শরীর নিয়ে এলেন ষষ্ঠ অবতার। কিন্তু পশুর মতো প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মালেন। ইনি হলেন ত্রেতাযুগের পরশুরাম অবতার। ত্রেতাযুগে আদর্শ মানুষ হয়ে এলেন সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্র। দ্বাপর যুগে বিষ্ণু ভগবানের পূর্ণ অবতার হয়ে এলেন অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ। কলিযুগে নবম অবতার আদর্শ মানুষ ভগবান বুদ্ধদেব। কলিযুগের শেষে প্রলয়কালে দশম অবতার হয়ে আসবেন —কল্কি অবতার। ইনি হবেন ব্রাহ্মণ সন্তান। সাদা ঘোড়ায় চেপে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে দুষ্টের দমন করে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠা করবেন।

অষ্টসিদ্ধি কাকে বলে ?

যোগীরা যোগসাধনা করতে করতে নানা প্রকার শক্তির অধিকারী হন। ভগবানের কৃপায় তাঁরা এই সব শক্তিলাভ করেন এবং মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়ে পার্থিব নাম, যশ, সম্পদসুখ, শক্তির প্রলোভনে পড়ে যোগ সাধনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে মায়াবদ্ধ হয়ে পড়েন। ভগবানের ইচ্ছা তাঁর এই সৃষ্টি চলুক। অনেক জ্ঞানী, ভক্ত, বা যোগী এই সৃষ্টির আবর্তে পড়ে দুঃখ পেতে চান না। তাঁরা চান মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ পরমব্রহ্মে লীন হতে বা শ্রীভগবানের শ্রীচরণে চিরন্তন, সনাতন ও শাশ্বত আশ্রয়। এতে আর পুনর্জন্ম হয় না। বার বার দুঃখ পেতেও হয় না। কঠোর পরীক্ষার জন্যই শ্রীভগবান এই সব সাধকদের আটরকম ক্ষমতা দেন। এদেরকেই বলে অষ্টসিদ্ধি, অষ্টবিভূতি, কামাবশায়িতা বা সিদ্ধাই ক্ষমতা। যেমন—অণিমা (অণুর আকার ধারণ করে যেখানে সেখানে যাওয়ার ক্ষমতা); ২। লঘিমা (খুব হাল্কা হয়ে আকাশে উড়ে যাওয়া); ৩। গরিমা বা মহিমা (নিজেকে ইচ্ছামত অত্যন্ত ভারী করে ফেলা ; ৪। ব্যাপ্তি (নিজেকে সব দিকে প্রসারিত বা ব্যাপ্ত করে ফেলা); ৫। প্রাপ্তি (যে কোনো জায়গায় যে কোনও জিনিস ইচ্ছামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে হাতে লাভ করা); ৬। প্রাকাম্য (যে কোনও জায়গায়, যে কোনও সময়ে নিজের ইচ্ছা মত স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া); ৭। বশিত্ব (কোনও লোককে যে কোনও সময়ে ইচ্ছামত নিজের বশে আনা); ৮। ঈশিত্ব (সর্বভূতের উপর প্রভুত্ব করা)।

রুদ্রাক্ষের উপকারিতা কি ?

রুদ্রাক্ষ অর্থ রুদ্রের অক্ষি অর্থাৎ শিবের চোখ। রুদ্রাক্ষ হলো একরকম গাছের ফল, শ্রীভগবানের নামে মালা জপ করার জন্য যেমন তুলসীর মালার প্রয়োজন হয়, তেমনি রুদ্রাক্ষের মালারও প্রয়োজন হয়। বৈষ্ণব বা বৈদ্যান্তিকগণ তুলসীমালাই পছন্দ করেন। শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক বা অঘোর-পন্থীগণ রুদ্রাক্ষের মালাই বেশী পছন্দ করেন। রুদ্রাক্ষমালা বা রুদ্রকমালা নানা রকমের হয়। যেমন—দ্বিমুখী, ত্রিমুখী, চতুর্মুখী, পঞ্চমুখী, সপ্তমুখী ন'মুখী ইত্যাদি। ন'মুখী রুদ্রাক্ষ খুবই দুষ্প্রাপ্য। বাজারে সাধারণত রুদ্র-কের প্রচলনই বেশী। বিল্বপত্র, ধুতুরাফুল, কলকে ফুলের মতোই পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষও বাবা পঞ্চানন মহাদেবের খুবই প্রিয়। শান্ত অবস্থার পঞ্চানন হলেন মঙ্গলময় শিব। প্রলয়-সংহারের সময় তিনি হন রুদ্রপতি এবং তাঁর শক্তি পার্বতীও হন দুর্গতিনাশিনী বিপত্তারিণী রুদ্রাণী। এই দুই ভয়ংকর রুদ্রশক্তি কে প্রশমিত করার জন্যেই রুদ্রাক্ষের প্রয়োজন। রুদ্রাক্ষ প্রচুর আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী—যে শক্তি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়। তবে তাকে জাগাতে হয় সাধনার দ্বারা। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের দ্বারা পঞ্চদেবতার (রুদ্র, রুদ্রাণী, আদিত্য, কেশব ও গণেশ) কৃপালাভ করা যায়। নরদেহের পঞ্চবায়ুকে (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। পঞ্চরত্ন (নীল কান্তমণি, হীরক, পদ্মরাগ, মুক্তা ও প্রবাল) ধারণের যে ফললাভ হয়, তা একটি পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণের ফলেই পাওয়া যায়। পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম) প্রভাবকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। পঞ্চভূতের পঞ্চতন্মাত্র হলো—রূপ (তেজ থেকে), রস (অপ থেকে), গন্ধ (মরুৎ থেকে) শব্দ (ব্যোম থেকে), এবং স্পর্শ (ক্ষিতি থেকে)। পঞ্চতন্মাত্র থেকে উৎপত্তি হয় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু—(রূপ থেকে), কর্ণ—(শব্দ থেকে), নাসিকা—(গন্ধ থেকে), জিহ্বা—(রস থেকে), ত্বক—(স্পর্শ থেকে)। জ্ঞানেন্দ্রি-য়কে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজন হয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, স্নায়ু ও উপস্থ—। এই দশটি ইন্দ্রিয়ের উপর হলো একাদশ ইন্দ্রিয় মন এবং পরে বুদ্ধি (সাংখ্য দর্শন)। এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ঠিক পথে চালনা করার ক্ষমতা জন্মায় রুদ্রাক্ষ মালা ব্যবহার করলে। প্রখ্যাত যোগিনী ও সাধিকা আনন্দময়ী মায়ের দেওয়া রুদ্রাক্ষের মালা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ইন্দিরা গান্ধীর গলায় সব সময়ে বিরাজ করছে। যার শক্তিতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর হারানো গদী ফিরে পেলেন। কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা, রামপ্রসাদ সব সময়ে রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করতেন।

পৃথিবীর আশ্চর্য কি কি ?

প্রাচীনকালের সাতটি আশ্চর্য জিনিসকে বলা হয় সপ্তম আশ্চর্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তখন সাতটির জায়গায় আটটি আশ্চর্য জিনিস ছিল। এগুলির মধ্যে এখন শুধু মিশরের পিরামিডই আছে। আর সব সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

প্রাচীনযুগের আশ্চর্য

১। মিশরের পিরামিড—

নীলনদের পশ্চিমে প্রায় ৬০ মাইল জায়গা নিয়ে ফ্যারাওগণের সমাধিস্থানকে বলে পিরামিড। সবার থেকে বড়োটার উচ্চতা ছিল ৪৮২ ফুট —এখন হয়েছে ৪৫০ ফুট এবং ৭৪৬ বর্গফুট। ২৩ লক্ষ নীল পাথর দিয়ে এটা তৈরি হয়েছিল। ছোটখাট প্রায় ৭০টি পিরামিড আছে।

২। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান—

৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে রাজা নেবুচাডনেজার বর্তমান বাগদাদের দক্ষিণে ইউ-ফ্রেটিস নদীর কাছে প্রায় ৭৫ থেকে ৩০০ ফুট উঁচুতে এই বাগান তৈরি করিয়েছিলেন।

৩। রোডস্ দ্বীপের কলোসাস—

২৮৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে লিণ্ডাসের ক্যারেস, তাঁর গুরু ভাস্কর লিসিটপ্পায়ের নির্দেশে গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো বা হেলিয়াসের ১২০ ফুট উঁচু এই প্রতি-মূর্তিটি ভূমধ্যসাগরের রোড্‌স্ দ্বীপে তৈরি করেছিলেন। পেতল ও ব্রোঞ্জের তৈরি এই মূর্তিটি ২২৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়। রোমে ১১০ ফুট উঁচু সম্রাট নীরোর প্রতিমূর্তিও ছিল এই ধরনের আর একটি কলোসাস।

৪। জিউসের প্রতিমূর্তি—

চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ পশ্চিম গ্রীসের অলিমপাস মন্দিরে প্রাচীন-গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ফিডিয়াস গ্রীক দেবরাজ জিউসের এই ৫৮ ফুট উঁচু প্রতিমূর্তিটি তৈরি করেছিলেন। সাদা পাথর, হাতীর দাঁত আর সোনা দিয়ে তৈরি এই মূর্তিটি নানারকম রত্ন দিয়ে তৈরি একটি সুন্দর সিংহাসনের উপর বসানো ছিল। পরে খৃষ্টান আক্রমণকারীরা এই মূর্তিটি ধ্বংস করে ফেলে।

৫। আলেকজান্দ্রিয়ার ফ্যারোক—

৪০০ ফুট উচু শ্বেত পাথরের তৈরি বিশ্বের সর্বপ্রথম ও বিশ্ববিখ্যাত বাতি-ঘর বা লাইট হাউস। ২৬৫ থেকে ২৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে মিশরের রাজা

টলেমি প্রথম আলেকজান্দ্রিয়া পোতাশ্রয়ের মুখে ফ্যারোক দ্বীপে প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই বাতিঘরটি তৈরি করিয়েছিলেন। ৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পে এই লাইটহাউস ধ্বংস হয়ে যায়।

৬। ব্যাবিলনের বিরাট দেওয়াল—

গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের বর্ণনায় আছে—এই দেওয়ালের লম্বা ছিল ২১ কিলোমিটার এবং চওড়া ৮৬ কিলোমিটার। দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে যেতো। সম্রাট নাবোপোলসার ও তাঁর সন্তান নেবুচাড্‌নে-জার এই দেওয়ালের বার বার সংস্কার করিয়েছিলেন। মহাবীর আলেক-জাণ্ডার এটিকে সারাবার ইচ্ছা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই দেওয়ালের ভাঙাচুড়ো রাবিশ সাফ করতেই লাগবে দশ হাজার লোক এবং দু মাস সময়। তারপর তিনি মারা যান এবং তার বংশধররা এতে আগ্রহ না দেখানোতে ধীরে ধীরে তা ধ্বংস হয়ে যায়।

৭। মসোলীয়াম—

পারস্য দেশের রাজা আর্টাজারসেক্সের অধীনস্থ ক্যারিয়া রাজ্যের শাসন-কর্তা মসোলাম এই বিরাট সমাধি মন্দির তৈরি শুরু করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মসোলাসের স্ত্রী আর্টেমিসিয়া এটা সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। সবার উপরে মসোলাস ও আর্টেমিসিয়ার মূর্তি ছিল।

৮। এফেসাসের আর্টেমিসের মন্দির—

রোম্যানদের ডায়নাকেই গ্রীক ভাষায় আর্টেমিস বলা লয়। মন্দিরটি প্রায় দুশো বছর ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। পরে হেরোসট্র্যাটস্ নামে এক উন্মাদ এতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঠিক ঐ দিনেই মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জন্ম হয়। বড়ো হয়ে আলেকজাণ্ডার এই মন্দির মেরামত করার ইচ্ছা করেন। তারা বলেছিল—"এক ঈশ্বর আর এক ঈশ্বরের মন্দির তৈরি করবে, এটা ঠিক নয়।" পরে এই মন্দির ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়।

মধ্যযুগের আশ্চর্য

১। রোমের কলোসীয়াম—

ডিম্বাকৃতি রোম্যান অ্যাম্পিথিয়েটার। পরিধি ১৬৮০ ফুট। ৭৫ খৃষ্টাব্দে ভেসপোসিয়ান তৈরি শুরু করেন এবং পাঁচ বছর পরে টাইটাস তৈরি করা শেষ করেন। মার্বেল পাথর ও কংক্রিটে তৈরি এই অ্যাম্পিথিয়েটারে পর পর তিনসারি খিলান ছিল। আশী হাজার দর্শক এতে বসে খেলা দেখতে পারতো। ১৫৭ ফটে উঁচু, লম্বা ২৮৫ ফুট আর চওড়া ছিল ১৮৩ ফুট।

২। আল্‌হাম্‌ব্রা—

দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাডায় পাহাড়ের ওপর ১২৪৮ থেকে ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুররাজ আল্‌ আহমারের তৈরি বিরাট প্রাসাদ। চার কোণা উঠানের চারিদিকে বিরাট হলঘর ও ঘর ছিল। সূক্ষ্ম কারুকলাও ছিল বিচিত্র। ১৪৯২ খৃস্টাব্দে ভ্যাণ্ডালগণ মুরদের স্পেন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এটি ধ্বংস করে দেয়।

৩। তাজমহল—

ভারত সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজমহলের বিরাট গম্বুজ-যুক্ত সমাধি। ১৬২৯ থেকে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ২১ বছর ধরে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে শাহজাহান এটি তৈরি করিয়েছিলেন। বাইরের দিকে হীরা-মণি মাণিক দিয়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য ছিল। প্রধান গম্বুজটির উচ্চতা ৮০ ফুট ও ব্যাস ৫৮ ফুট।

৪। মিশরের স্ফিংক্স—

উত্তর মিশরের ঘিজে নামক জায়গায় পাথরের তৈরি মানুষের মুখ সহ অর্ধশায়িত সিংহের মূর্তি। ৩৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ফ্যারাও স্টেফেসে এটা তৈরি করিয়েছিলেন। ৬৬ ফুট উঁচু, ১৮৯ ফুট লম্বা। মুখের আয়তন ১৩ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বায় ও ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি চওড়া। আর ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা নাক।

৫। চীনের প্রাচীর—

উত্তর চীন ও মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে—মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরি ১৪০০ মাইল লম্বা প্রাচীর। চীন সম্রাট শি হোয়াং এর আমলে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এর কাজ শুরু হয়েছিল। মিঙ সম্রাটগণের আমলে ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪ সালের মধ্যে এটি তৈরি শেষ হয়েছিল। ১০০ গজ অন্তর ৪০ ফুট উঁচু এক একটি গম্বুজ। পাঁচিলের নীচের অংশের চওড়া ১৫ থেকে ৩৫ ফুট, উঁচু ২০ থেকে ৩০ ফুট, আর ওপর দিকে চওড়া ১৫ ফুট।

৬। জাভা'র বুদ্ধ মন্দির বা বড়বুদর—

৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে জ্যাভা দ্বীপে আগ্নেয়গিরি থেকে বেরুনো লাভা দিয়ে এই মন্দির তৈরি। উঁচু ১৫০ ফুট—সিঁড়ির আকারে তৈরি চারিদিকে সাতটি দেওয়াল। সবার উপরে ৫২ ফুট চওড়া একটি চূড়া। পাদদেশের প্রত্যেক দিকের লম্বা ৫২০ ফুট।

৭। রোমের সেন্টপিটার্স গির্জা—

পৃথিবীর বৃহত্তম গির্জা। ইতালীর রাজধানী রোমে ১৮ হাজার বর্গগজ জায়গা নিয়ে এটি তৈরি। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের সময় এটির কাজ শুরু হয়। ১৮২ বছর পর ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে এর কাজ শেষ হয়।

৬৬৩ ফুট উঁচু। উপাসনার জন্য ৪৫ হাজার লোকের জায়গা হয়।

৮। তিব্বতের পোতালা—

তিব্বতের ধর্মগুরু ও শাসক দলাই লামার বাসগৃহ। কিয়চু নদীর তীরে রাজধানী লাসার কাছে পোতালা পাহাড়ের উপর এই বাসগৃহ। গিরি দুর্গের মত দেখতে। লম্বায় ৯০০ ফুট। গম্বুজের উচ্চতা ৪০০ ফুট। এখানে দলাইলামা বাস করতেন, অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করা হত ও অনেক উপাসনা মন্দিরও আছে।

৯। শোয়ে ড্রাগন পাগোডা—

ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে এই প্যাগোডা আছে। ব্রহ্মদেশের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে বুদ্ধ নিজের আটগাছা চুল উপহার দিয়ে ছিলেন। এই প্যাগোডাতে সেইগুলি আছে। প্যাগোডার চারদিকে ছোট ছোট অনেক মন্দির আছে। পাদদেশের পরিধি ১৩৫০ ফুট। শীর্ষদেশ সোনার পাত দিয়ে ঢাকা।

আধুনিক কালের আশ্চর্য

১। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং—

১০২তলা ও ১২৫০ ফুট উঁচু নিউইয়র্কের এই বাড়িটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন। ১৯১১ সালে এর তৈরির কাজ শেষ হয়। ৮৬তম তলার উপরে পর্যবেক্ষণের যে গ্যালারি আছে, সেখান থেকে ২৫ মাইল দূর পর্যন্ত সমস্ত দৃশ্য চোখে দেখা যায়।

২। স্বাধীনতার মূর্তি—

আমেরিকার রাজধানী নিউইয়র্ক বন্দরে পোতাশ্রয়ের মুখে বেড্লোর দ্বীপে এই মূর্তিটি আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফরাসী গভর্ণমেন্ট এই মূর্তিটি আমেরিকার জনসাধারণকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ ভাস্কর ফ্রেডারিক বার্থল্ডি এটি তৈরি করেছিলেন। হাতে জ্বলন্ত একটি মশাল নিয়ে এক নারী মূর্তি। মূর্তির উচ্চতা ১৫১ ফুট, কিন্তু ভিত্তির পাদদেশ থেকে মশাল পর্যন্ত উচ্চতা ৩১০ ফুট। ধাতুর তৈরি এই মূর্তি এবং ভেতরে ফাঁপা—তবুও এর ওজন ২২৫ টন। মূর্তির ভেতর দিয়ে মাথা পর্যন্ত একটা সিঁড়ি আছে। মূর্তির পাদদেশে এমা ল্যাজারসের একটি কবিতা খোদাই করা আছে।

বিশ্বের বৃহত্তম কি কি?

ক। দেশ—ব্রাজিল (দঃ আমেরিকায়—৩২,৮৬,১৭০ বর্গ মাইল)

খ। রাষ্ট্র—সোভিয়েট রাশিয়া (৮৬,৫০,০০৯ বর্গ মাইল)

গ। অট্টালিকা—গিজের পিরামিড (মিশর)
ঘ। প্রাসাদ—ভ্যাটিকান (রোম)
ঙ। ঘণ্টা—মস্কোর ঘণ্টা (২০০ টন ওজন—২১´×২১´)
চ। জাহাজ—কুইন এলিজাবেথ (গ্রেট বৃটেন—৮৫,০০০ টন)
ছ। গির্জা—সেন্ট পিটার্স গির্জা (রোম)
জ। দূরবীক্ষণ যন্ত্র—ক্যালিফোর্ণিয়ার পালোমায় পর্বতে স্থাপিত যন্ত্রটি।
ঝ। মিউজিয়াম—বৃটিশ মিউজিয়াম (লণ্ডন)
ঞ। রেল স্টেশন—গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল টারমিন্যাল (নিউইয়র্ক, ৪৭টি প্ল্যাটফরম্)
ট। গ্রহ—বৃহস্পতি
ঠ। গম্বুজ—গোল গম্বুজ (বিজাপুর, ভারতবর্ষ। ১৪৪ ফুট ব্যাস)
ড। হীরক—কুল্লিয়ন (৩,১০৬ ক্যারেট)
ঢ। হীরকখনি—কিম্বারলি (দক্ষিণ আফ্রিকা)
ণ। মুক্তা—বেরেসফোর্ড হোপ পার্ল (১,৮৩০ গ্রাম)
ত। নগর—টোকিও (জনসংখ্যা—১,০০,০৩,০৫৫)
থ। আগ্নেয়গিরি—মৌনালোয়া (হাওয়াই দ্বীপ)
দ। খিলান—সিডনি হারবার ব্রীজ (অস্ট্রেলিয়া)
ধ। মরুভূমি—সাহারা (আফ্রিকা—৩০,০০,০০০ বর্গমাইল)
ন। দ্বীপ—গ্রীণল্যাণ্ড ; আতলান্টিক। ৬,৩৬,৫১৯ বর্গমাইল
প। মহাদেশ—এশিয়া (১,৬৯,৯০,০০০ বর্গমাইল)
ফ। মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর (৬,৩৮,০১,০০০ বর্গমাইল)

বিশ্বের সর্বোচ্চ কি ?

ক। গিরিশৃঙ্গ—এভারেষ্ট (নেপাল—২৯,০০২ ফুট)
খ। অট্টালিকা—এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং (নিউইয়র্ক—১০২ তলা—১২৫০ ফুট উঁচু)
গ। মূর্তি—স্বাধীনতার মূর্তি (আমেরিকা—১৫১ ফুট)
ঘ। গির্জা—উলম ক্যাথিড্রাল (জার্মানী—৫২৯ ফুট)
ঙ। মালভূমি—পামির (মধ্য এশিয়া)
চ। নগর—কারি (তিব্বত ১৫,৩০০ ফুট)
ছ। বাঁধ—বুল্ডার ডাম (আমেরিকা)

বিশ্বের দীর্ঘতম কি ?

ক। বারান্দা—রামেশ্বর মন্দির (দক্ষিণ ভারত—৫,০০০ ফুট)

খ। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম— (ছাপরা, ভারত—২,৫২৭ ফুট)

গ। রেল লাইন—ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (লেনিনগ্রাড ব্লাডিভস্টক)

ঘ। সড়ক সুড়ঙ্গ—মাউন্ট ব্লাঙ্ক গিরিশৃঙ্গের নীচে ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে।

ঙ। সুড়ঙ্গ পথ—তানা (জাপান)

চ। প্রাচীর—চীনের প্রাচীর (১,৪০০ মাইল)

ছ। নদী—মিসিসিপি—মিসৌরী (আমেরিকা—৪,২৪০ মাইল)

জ। নাব্য খাল—সুয়েজ (মিশর—১০৪ ১/২ মাইল)

বিশ্বের সর্বাধিক কি ?

১। বৃষ্টিপাত—চেরাপুঞ্জি (ভারত, বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০০ ইঞ্চি)

২। সর্বাধিক উষ্ণ অঞ্চল—আজকিয় (সাহারা মরুভূমির উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ত্রিশেলিবানিয়াতে অবস্থিত

৩। সর্বাধিক শীতল অঞ্চল—ভারকোয়ানস্ক (উত্তর পূর্ব সাইবেরিয়াতে)

৪। সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ—বাইবেল।

৫। সমুদ্রের সর্বাধিক গভীরতা— (ফিলিপাইন দ্বীপ ও প্রশান্ত মহাসাগর—৩৫,৪০০ ফুট)

কালো বেড়ালকে অশুভ বলে মনে হয় কেন ?

প্রাচীন মিশরীয়গণ বেড়ালকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো এবং বেড়ালকে পবিত্র মনে করতো। মিশরিয়দের এক দেবী ছিল—যার নাম ছিল পাস্ত্‌ এবং তাঁর মাথাটা ছিল বেড়ালের। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই দেবীর ন'টা প্রাণ। সেই থেকে অনেক লোকের বিশ্বাস যে, বেড়ালেরও ন'টা প্রাণ অর্থাৎ বেড়াল সহজে মরে না। মিশরে কোনো কালো বেড়াল মারা গেলে, তাকে মমী করে রাখা হতো। সম্প্রতি এইরকম একটা গোরস্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে হাজার হাজার মমি করা বেড়াল পাওয়া গেছে। প্রাচীন লোকেরা ডাইনীদের শক্তিতে খুব বিশ্বাস করতো এবং ডাইনীদের সঙ্গে কালো বেড়ালও থাকতো। কালো বেড়াল হলো ছদ্মবেশী ডাইনী। কালো বেড়াল মারলে ডাইনীরাও মরতো না।

কারণ, ওদের নয়টা করে প্রাণ থাকতো তাছাড়া, নানারকম ওষুধ তৈরি করার জন্য ডাইনিরা এবং মধ্য যুগীয় ডাক্তাররা কালো বেড়ালের মাথা ব্যবহার করতো। সেই থেকেই লোকের বিশ্বাস যে, চোখের সামনে কালো বেড়াল পড়লেই, বুঝতে হবে একটা অঘটন ঘটবেই।

ডাইনিদের কুহকবিদ্যায় মানুষ বিশ্বাস করে কেন ?

মানুষ মাত্রেই ভয় পায়। যে সব জিনিষ থেকে ভয় পায় বা কোনও রকম জখম বা আহত হলে এবং যেসব জিনিসের ঠিকমত ব্যাখা যখন করতে পারে না, তখনই মানুষ ডাইনি বিদ্যা, কুহকিনী বিদ্যা, বিচিত্র যাদুবিদ্যা প্রভৃতির আশ্রয় নেয়। অনাবৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বাজপড়া, শারীরিক বা মানসিক কোনও রোগের ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে না পারলেই ডাইনিবিদ্যার উপর বিশ্বাস করে।

পরের ক্ষতি বা লোকসান করার জন্য বা কাউকে নিজের বশীভূত করে কোনও কাজে লাগানোর জন্য এই সব ডাইনিদের বা কুহকিনীদের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। বিভিন্ন দানবীয় বা রাক্ষসীয় শক্তিদ্বারা এরা চালিত হতো। মেয়েছেলে হলে এদের বলা হত ডাইনী, কুহকিনী, ডাকিনী বা পিশাচিনী। এরা ঝাঁটার পিঠে বসে ঘুরে বেড়াতো। পুরুষ হলে বলা হতো ডাইন, কুহক বা পিশাচ—।

বহুশত বছর আগে থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে। ভয় আতংক, অজ্ঞতা অথবা কুসংস্কারই হলো এর মূল। আরো আশ্চর্য হলো যে অনেক শিক্ষিত ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসী লোকও এসবে বিশ্বাস করতো।

খৃষ্টানদের বিশ্বাস এরা শয়তানদের কাছে নিজেদের বিক্রি করে দেয় এবং তাদের হুকুম মতোই এরা চলে।

১৪৮৪ সালে সারা ইউরোপে ভয়ংকর প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। তখন ৮ম পোপ ডাইনীবিদ্যাকেই দোষী বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে, রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ও প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান— দুই দলই এইসব ডাইনিদের খুঁজে বার করার কাজ শুরু করে। ১৬৪৭ থেকে ১৬৬৩ সালের মধ্যে অনেক ডাইনি, পিশাচিনী ও কুহকিনীদের অভি-যুক্ত করা হয়।

সেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ নাটকেও তিনজন ডাইনির কাহিনী পাওয়া যায়।

পিশাচসিদ্ধ কোনও ডাইনির প্রভাবেই মন্থরা কৈকেয়ীকে ও কৈকেয়ী

জা দশরথকে প্রভাবিত করে। যার ফলে দশরথ রামকে বনবাসের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হন। ঠিক ঐভাবেই শকুনি প্রভাবিত হয়, পরে দুর্যোধন এবং ধৃতরাষ্ট্রও প্রভাবিত হয় ও তাদের ঘাড়ে ডাইনি ও কুহকিনীরা ভর করে। যার ফলে পঞ্চপাণ্ডবকেও বনবাসে যেতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেও এই শ্রেণীর অনেক লোক এসেছিল, কিন্তু তাঁর দৈব ও সাত্ত্বিক তেজের কাছে তারা ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠোতে পারে নি।

আধুনিক ডাক্তারদের মতে হিস্টিরিয়া ও মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীরাই উৎকট স্বপ্ন ও নানা রকম বিচিত্র দৃশ্য দেখে থাকে। আর সাধারণ লোকেরা এগুলি ডাকিনী-যোগিনীদের ক্রিয়াকলাপ বলে ভুল করে।

হীরা কিভাবে হয় ?

হীরা হলো সবচেয়ে কঠিন পদার্থ। প্রায় দশ কোটি বছর আগে মাটির তলায় যেসব গরম গলিত পাথর ছিল, সেইগুলি কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে এবং ওপরকার মাটির বিরাট চাপে হীরায় পরিণত হয়। কঠিনতা ও উজ্জ্বলতাই হলো হীরার প্রধান বিশেষত্ব। অ্যালুমুনিয়াম জাতীয় কোরামডাম নামক ধাতুর চেয়েও হীরা পাঁচগুণ বেশী কঠিন। অলঙ্কারে হীরা ব্যবহার করার সময়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ হীরাকে সাধারণ অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না। হীরাকে হীরা দিয়েই কাটতে হয় এবং নানারকম পল তোলা হয়। এক একটি হীরাতে প্রায় ৫৮টা পল তোলা হয়। এই পল তোলার কাজ খুব কঠিন; আর এই জন্যই এ থেকে জ্যোতি ঠিকরে বেরুতে থাকে।

কোন্ জন্তু মানুষের মত ?

লেজ হীন বাঁদরই হলো মানুষের কাছাকাছি জন্তু—যার সংগে মানুষের অনেক মিল আছে। মানুষের মত এদেরও বুড়ো আঙুল আছে। যার জন্য এরা যে কোনও জিনিষ ধরতে পারে এবং সহজে গাছেও চড়তে পারে। মানুষও এইজন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে, এরাই নাকি মানুষের পূর্ব্বপুরুষ—বিবর্তনবাদের ফলে এই রকম তফাৎ হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ ও বাঁদরদের মাঝে কোনও "সংযোগ-সূত্র" পাওয়া যায় না।

নররূপী বাঁদর চার রকম হয়। সবচেয়ে বড়ো হলো গরিলা। এর পরেই হলো ওরাং-উটাং। তারপরে শিম্পাঞ্জী। আর সব চেয়ে ছোট হলো

গিবন। এর সংগে মানুষের অনেক মিল আছে। এরা পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে এবং সামনের দিকে না ঝুঁকে মানুষের মতো সোজা চলতে পারে। তবে এরা বেশী হাঁটে না। গাছেই বেশীর ভাগ থাকে এবং ঝুলে ঝুলে অন্য জায়গায় চলে যায়। মাঝে মাঝে ফল পাতা খাবার জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়ায়। খাবার সময়ে মানুষের মতো সোজা হয়ে বসে। মাকড়শা, পাখী আর ডিম হলো এদের খাদ্য। এদের এক একটি পরিবারে ৮।৯ জন করে এবং এক সংগে থাকতে ভালবাসে। ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত এরা বেঁচে থাকে।

মানুষের পদতল সমান নয় কেন ?

মানুষের শরীরের কোনও দু'টি অংশই সমান নয়। বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিকের কোনও মিল নেই। আয়নায় নিজে মুখের দিকে তাকালে, দেখতে পাবে ডানদিকের মুখের অংশ বাঁদিকের মুখের অংশের চেয়ে সামান্য একটু বড়ো। ডানদিকের গাল, চোখ, কান, বাঁদিকের চেয়েও একটু পরিপুষ্ট।

শরীরের অন্যান্য অংশেও ঐ একই নিয়ম চলে আসছে। ডান দিকের হাত, পা, লিভার, ফুসফুস বাঁদিকের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ও কর্মক্ষম। এই জন্য আমাদের চলাও ঠিক সমান ভালো হয় না। কুয়াশার সময়ে, মরুভূমিতে, কিংবা চোখ বাঁধা অবস্থায় যখন আমরা চলি, তখন দেখা যায় আমরা এক জায়গাতেই গোল হয়ে ঘুরছি।

মস্তিষ্কের বাঁ অংশ যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে আমরা ডান হাতে ও ডান পায়েই বেশী কাজ করি। আবার ডান অংশ যদি জোরালো হয়, তাহলে বাঁ হাতে ও বাঁ পায়েই বেশী কাজ হয়। তবে শতকরা ৯৬ ভাগ লোকই ডান হাতেই বেশী কাজ করে।

সাপেরা ডিম পাড়ে, না বাচ্চা দেয় ?

নানা জাতির সাপ আছে। র‍্যাট্‌ল সাপ, কপারহেডেড সাপ, জলঢোঁড়া, গার্টার—এরা ডিম পাড়ে না। সোজাসুজি বাচ্চাই দেয়। কোনো কোনো কোনো সাপ একসঙ্গে ৭৫টা বাচ্চার জন্ম দেয়।

বেশীর ভাগ সাপই ডিম পাড়ে। পাথর বা কাঠের গুঁড়ির তলায় বা কোনো গর্তের কোণে এরা ডিমগুলিকে লুকিয়ে রাখে। মুর্গির ডিমের চেয়ে এগুলি একটু ছোট ও একটু লম্বাটে ধরনের হয়। কিছু কিছু সাপের ডিম

মুর্গির ডিমের মতই হয়।

সাপের ডিমের খোল হয় খুব শক্ত এবং চামড়ার মতো। ভারতীয় পাইথন একসঙ্গে ১০৭টা ডিম পাড়ে। ডিমের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে, কিংবা সূর্যের আলোয়, কিংবা শুকনো পাতার সাহায্যে ডিমগুলিকে তা দেওয়া হয়।

গিনিপিগ কি ?

পিগ মানে শূয়োর। এরা কিন্তু শূয়োর নয়। আর গিনি নিয়েও এরা কোনো কারবার করে না। খরগোস, শশক প্রভৃতিদের মতো এরাও এক রকম ছোটো প্রাণী। পেরু, ইকুয়েডার, কলাম্বিয়ায় এদের প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা গিনিপিগকে খাবার হিসাবেই ব্যবহার করতো। আমেরিকা আবিষ্কারের পরে ইউরোপের লোকেরাও গিনিপিগের মাংস খেতে আরম্ভ করে। বর্তমানে শুধু পেরুদেশের লোকেরাই গিনিপিগ খায়। দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা এদের পোষে।

গিনিপিগ লম্বায় প্রায় দশ ইঞ্চি হয়। আর ওজন হয় প্রায় এক কিলো-গ্রাম। এদের লেজ থাকে না। ছোট ছোট গোল কান হয়। সামনের দুটো পায়ে চারটে আঙুল আর পেছনের দুটো পায়ে তিনটে করে আঙুল থাকে। সব আঙুলেই নখ থাকে। নখগুলো খুব চওড়া হয়। এরা শাক-সব্জী খায়। খাবার সময়ে পেছনের দুটো পায়ের উপর ভর করে বসে। প্রচুর শাকসব্জী খেতে পেলে এরা জল না খেয়েও থাকতে পারে। খাঁচায় রাখলে ইঁদুরের ও খরগোসের দেওয়া খাবার খেয়েই এরা বেঁচে থাকে। তখন এরা জল খেতে চায়। এরা বছরে দু' তিনবার করে বাচ্চা দেয়। প্রতিবারে দুই থেকে আটটা বাচ্চা হয়। জন্মাবার কয়েক ঘন্টা পরেই এরা দৌড়োতে পারে। জীবন্ত জন্তু দরকার হলে, গবেষণাগারে এদের খুব কাজে লাগে। ওষুধ তৈরি করতে বা অন্যান্য ডাক্তারী কাজেও এদের খুব দরকার লাগে।

লোকে মানুষের মাংস খায় কেন ?

যারা মানুষের মাংস খায়, তাদেরকে নানা নামে ডাকা হয়। যেমন—নর-মাংসাশী, নরমাংসভোজী, নরমাংসখাদক ইত্যাদি। মানুষের মাংস খেতে সুস্বাদু বলেই যে তারা নরমাংস খেতো তা নয়। ধর্মীয় প্রথা এবং ভগবানের প্রসাদ হিসাবেই তারা মানুষের মাংস খেতো। বহু বছর আগে পূর্ব ভারতের

কোনো আদিম জাতি—তাদের নিজেদের বাবার ও মায়ের মাংস খেতো। কারণ তারা নিজেদের বাবা মাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এইভাবে তারা তাদের বাবার ও মায়ের আশীর্বাদ লাভ করবে। যার মাংস খাবে, তার গুণাবলীও তারা লাভ করবে। সিংহের মাংস খেলে সিংহের মতো বলবান হবে; হরিণের মাংস খেলে, হরিণের মতো দ্রুতগামী হবে, শেয়ালের মাংস খেলে শেয়ালের মত ধূর্ত হবে।

যেসব মানুষের সাধারণভাবে মৃত্যু হতো, তাদের চেয়েও যেসব অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হতো, তাদের মাংস আরো প্রিয় ছিল। কারণ তারা ভগবানের কাছে অপরাধ করেছে। তাই তাদের শাস্তির জন্য তাদেরকে ভগবানের কাছেই উৎসর্গ করা হতো। তাই ভগবানের প্রসাদ হিসাবেই, তাদের মাংস খুব ভক্তিভরে খাওয়া হতো। উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। নিউগায়না দেশেও কিছু কিছু নরমাংসভোজী আদিম জাতিদের অস্তিত্ব এখনও আছে। তবে, এই সম্প্রদায় কোন্ কোন্ দেশে কতো আছে কেউ বলতে পারে না।

তান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ বা অঘোরপন্থীদের মধ্যেও নর-মাংস খাওয়ার প্রথা এবং সেই উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়ার প্রথা এখনও আছে। তন্ত্রসাধনার সময়ে ভৈরবীর দেওয়া গলিত নরমাংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও খেতে হয়েছিল।

নববর্ষ উৎসব আমরা পালন করি কেন ?

চীন দেশেই এই প্রথার প্রথম চালু হয়। এই উৎসব কয়েকদিন ধরে চলতো। এরপরে প্রাচীন জার্মানরা এই উৎসব পালন করতে থাকে। জার্মান দেশের শীত আরম্ভ হতো নভেম্বরের মাঝামাঝি। এই সময়ে ওদের বিশ্রামের সময় আসতো। নভেম্বর মাস হলেও, এই সময়টাকেই তারা নববর্ষের প্রাককালীন হিসাবে পালন করতো। ইউরোপ বিজয়ের পর, রোমানরা পয়লা জানুয়ারী দিনটাকেই নববর্ষ হিসাবে পালন করা শুরু করে। তাদের ধারণা ছিল ঐ দিন থেকেই তাদের নতুন আশা নিয়ে নতুন জীবন শুরু হবে। এই প্রথাই এখনও চলে আসছে।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পয়লা বৈশাখ দিনটা নববর্ষ হিসাবে পালন করা হয় সারা পশ্চিমবঙ্গে। ভারতের অনেক জায়গায় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন, আবার কোন জায়গায় দেওয়ালীর দিনও নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়।

গাছপালা কোথা থেকে এবং কিভাবে এলো ?

সৃষ্টির আদিতে উদ্ভিদ বা গাছপালা বলতে এ পৃথিবীতে কিছুই ছিল না। লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবী তখন জলময় ছিল। সেই সময়ে উদ্ভিদের ও অন্যান্য জীবজন্তুর মূল উপাদান "প্রোটোপ্লাজম" জলে দেখা গেল। এর চারদিকে একটা কঠিন আবরণ ছিল আর ভেতরে ছিল সবুজ রঙের একরকম পদার্থ—যার নাম "ক্লোরোফিল।" এই ক্লোরোফিলই হাওয়া, জল এবং খাদ্য তৈরি করে উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। প্রথমে ছিল একটি কোষে। পরে বহু কোষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদেরইকেই বলা হয় শ্যাওলা বা অ্যালগা। এরাই হলো পৃথিবীর আদি উদ্ভিদ। আর কতকগুলি উদ্ভিদের সৃষ্টি হলো, যারা ক্লোরোফিল ছাড়াই নিজেদের খাদ্য তৈরি করে। এরা সবুজ নয়। এদের রঙ হলো সাদা। নাম ছাতা—অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা। শ্যাওলা ও ব্যাঙের ছাতাই হলো বর্তমান উদ্ভিদ জগতের আদিম পূর্বপুরুষ। শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদই পরে ছোট শেকড় ও পাতা বার করে এক জায়গায় স্থিতি লাভ করার চেষ্টা করে। এরাই হলো মস এবং ফার্ণ জাতীয় গাছ। কোষগুলি বিভক্ত হয়ে গিয়ে এরা বাড়তে থাকে। একটা থেকে দুটো কোষ, দুটো থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটা—এই ভাবে। তাছাড়া প্রত্যেক পাতার নীচে ধুলোর মত ছোট ছোট কোষ হতো। এগুলিকে বলা হয় "স্পোরস্"। এই স্পোরসের মধ্যে বীজের মতো খাদ্য মজুত থাকত না, কিন্তু এই স্পোরস্ থেকে গাছপালা বেড়ে উঠতো। পরে আস্তে আস্তে গাছের ফুল হলো, ফল হলো, ফলের মধ্যে বীজ হলো। এই বীজের মধ্যেই একটা বিরাট গাছের যাবতীয় খাদ্য মজুত থাকে। এই বীজ থেকেই আধুনিক কালে বড়ো বড়ো বৃক্ষের জন্ম হয়। বীজ হয় দু'রকমের। (১) খোলা বা অনাবৃত বীজ এবং (২) আবৃত বা ঢাকা বীজ। কোনো কোনো ফলে একটা বীজ, কোনটাতে দুটো তিনটে বীজ, আবার কোনো কোনো ফলে একাধিক বীজ থাকে। যেমন—কাঁঠাল, আতা, ডুমুর ইত্যাদি।

গাছপালা কিভাবে এবং কোথা থেকে তাদের খাদ্য পায় ?

গাছপালার পাতাই হলো ওদের রান্নাঘর বা কারখানা। এই পাতাতেই গাছের খাবার রান্না হয় ও অন্যান্য জিনিস তৈরি হয়। এখান থেকেই খাবার খেয়ে গাছ বেঁচে থাকে এবং ফুল ও ফলের সৃষ্টি হয়। ফলের বীজ থেকে

আবার আরও গাছ জন্মাতে থাকে। শেকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে জল এবং হাওয়া থেকে পাতা নিজে প্রত্যেক গাছের জন্য খাবার তৈরি করে। বায়ু থেকে যে খাদ্য জোগাড় করা হয় তাকে বলে কার্বন-ডায়-অক্সাইড গ্যাস। আর শেকড় থেকে আসে জল। এই গ্যাস আর জল মিশিয়ে গাছের খাদ্য-শর্করা তৈরি হয়। একেই বলে আলোক-সংশ্লেষণ বা ফটোসিন-থেসিস্। অনেক গাছে শর্করা থাকে না। শর্করার বদলে থাকে স্টার্চ এবং প্রোটিন। যে মেশিনের দ্বারা গাছের খাবার তৈরি হয় তার নাম ক্লোরোপ্লাস্ট। এর রঙ হয় সবুজ। যে শক্তির দ্বারা এই মেশিনটা চলে, তার নাম হল সূর্যকিরণ। মাটির জল শেকড়ের ভিতর দিয়ে এসে গুঁড়ি, ডাল এবং পাতার শিরার মধ্যে দিয়ে কোষে গিয়ে হাজির হয়। এখানেই ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। খাবার রান্না হয়ে যাবার পর এই শিরা দিয়েই আবার খাবার শেকড়ে, ফুলে, ফলেও বীজের মধ্যে চলে যায়। খাবার তৈরির জন্য গ্যাসের প্রয়োজন শেষ হলে পর বাকী গ্যাসটুকু অক্সিজেনের আকারে পাতার নীচে 'স্টোমা' নামক যে ছিদ্র থাকে সেইখান দিয়ে বেরিয়ে আবার হাওয়ায় মিশে যায়। এই কাজ দিনের বেলাতেই হয়। তাই দিনের বেলায় বাগানে বেড়ানো মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ। গাছের পক্ষে অক্সিজেন ক্ষতিকারক, আবার মানুষের পক্ষে হিত-কর। রাতের বেলায় গাছের কাছে যাওয়া ঠিক নয়, তাতে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। কারণ খাদ্য তৈরির পর প্রয়োজনাতিরিক্ত কার্বন গ্যাস রাতেই গাছ থেকে বেরুতে থাকে। এই কার্বন গ্যাস মানুষের ফুসফুসকে দুর্বল করে দেয়।

গাছের ছাল হয় কেন ? এর উপকারিতা কি ?

প্রত্যেক গুঁড়ি বা শেকড়ের বাইরের মোটা আবরণটাই হলো ছাল। অনেক গাছের গুঁড়ি থেকে ছালকে পৃথক করা যায়। পাম বা তাল জাতীয় গাছের ছালকে পৃথকভাবে আলাদা করা যায় না। গাছের ছালকে বলা হয় বল্কল বা বাকল। বৈদিক বা প্রাচীন ভারতে যখন যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নি, তখন মুনি ঋষিরা গাছের ছাল পরেই লজ্জা নিবারণ করতেন। গাছের ছালের দুইটি প্রধান কাজ :—(১) গাছের ভেতরের রস বা গাছের খাদ্যকে শুকোতে না দেওয়া—(২) বাইরের কোনও আঘাত থেকে গাছকে রক্ষা করা। শুকনো ঘাস পাতা ও গরম হওয়ায় সংস্পর্শে জঙ্গলে মাঝে মাঝে আপনিই আগুনের সৃষ্টি হয়, যাকে বলে দাবানল বা বনাগ্নি। এই আগুন নিভে যাবার পর দেখা

গেছে—বড়ো বড়ো গাছ এই ছালের জন্যই বেঁচে গেছে। ছালটা পুড়ে গেছে, কিন্তু গাছের কোন ক্ষতিই হয় নি।

এই গাছের ছাল জন্মাতে কয়েক বছর কেটে যায়। প্রথমে বাইরের আবরণটা খুবই নরম ও মসৃণ থাকে। যতো বড়ো হ'তে থাকে ততোই এই আবরণ কড়া ও কঠিন হতে থাকে। সবুজ রং থেকে ক্রমশঃ মেটে বা চকোলেট রঙে পরিণত হয়। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ির গায়ে চির বা ফাটল দেখা যায়। এগুলিকে গাছের ছালই ভরাট করা দেয়। যেখানে ক্ষত হয় সেই-খানকার বাইরের কোষগুলি মরে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সেই জায়গাটুকু মসৃণ থেকে কর্কশ এবং নরম থেকে খরখরে জায়গায় পরিণত হয়। এই ভাবে ছোট ছোট ছালের সৃষ্টি হয়। পরে কয়েক বছর পরে সারা গুঁড়িটার গায়ে সেই ছাল ছড়িয়ে পড়ে।

ওক গাছের ছাল থেকে ছিপি তৈরি হয়। হেমলক নামক এক প্রকার বিষাক্ত গাছের ছাল নিয়ে চামড়া ট্যানিং করা হয়। ডালচিনি গাছের ছাল থেকে মসলা তৈরি হয়। সিনকোনা গাছের ছাল থেকে কুইনাইন তৈরি হয়। অনেক গাছের ছাল থেকে নানারকম সুগন্ধি দ্রব্য ও ওষুধপত্র তৈরি হয়।

আপেল কত রকমের হয় ?

শুনলে অবাক লাগে যে সারা পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার রকমের আপেল আছে। শুধু বিলাতেই দু হাজার রকমের আপেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। আমরা যেসব প্রাচীন ফল ব্যবহার করে থাকি, আপেল তাদের অন্যতম। দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া থেকেই এই ফলের উৎপত্তি হয় প্রায় দু হাজার বছর আগে। প্রাচীন রোমে প্রায় সাত রকম আপেলের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল।

গবেষকগণ বিভিন্ন আপেল গাছেল সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অর্থাৎ কলম কেটে জোড়া লাগিয়ে বহু রকমের দো-আঁশলা বা সংকর আপেলের উৎপত্তি ঘটান।

সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত দু'রকম আপেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। (১) কস্‌টার্ড আপেল, (২) কড়লিন আপেল। চতুর্দশ শতাব্দীতে উরসেসটার, পিয়ারমেন, পিপিং ও অরেঞ্জ আপেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমানে ২০ রকম আপেলই বাজারে চালু আছে।

বটগাছের বৈচিত্র্য কি?

গাছেদের মধ্যে বটগাছ হলো একটা বিরাট দৈত্যের মতো। যা কিছু বিরাট তার সমস্যাগুলিও তেমনি বিরাট। বটগাছও এই সব সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। প্রথম সমস্যা হলো মাটির ভেতর থেকে খাবার টেনে নিয়ে শেকড়ের ও গুঁড়ির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডালে ডালে এবং সব চেয়ে উঁচু চূড়ার শেষ পাতাটি পর্যন্ত তাকে পোঁছে দেওয়া। দ্বিতীয় সমস্যা হলো— বিরাট বলেই, এই গাছের গুঁড়িকে খুব শক্ত ও মজবুত ক'রে তোলা। তা না হলে সামান্য ঝড়ে বা ধাক্কাতেই ভেঙে পড়ে যাবে। সুতরাং এই বিরাট দৈত্যের মতো গাছটির গুঁড়ি ও ডালপালাকে শক্ত হতেই হবে। পূর্ব ভারতে ও মালয়েশিয়াতে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

বটগাছের বিচিত্র জিনিস হলো এর ডাল। ডালপালাগুলি বেশী উঁচুতে বাড়তে পারে না। কিন্তু আশেপাশে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। এতো তাড়াতাড়ি ও বিরাট হয়ে বাড়তে থাকে যে এরা নিজেদেরকে আর উপরে রাখতে পারে না—নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন এইসব ডালের নীচ থেকে শেকড় বেরিয়ে মাটির দিকে চলে যায়। এই শেকড়গুলো শুধু থামেরই কাজ করে না, এরা হাওয়া ও মাটি থেকে আরও খাদ্য সংগ্রহ ক'রে গাছটিকে বলিষ্ঠ ক'রে তোলে। পরে এই শেকড়গুলোই গাছের গুঁড়িতে পরিণত হয়ে যায়। তাই বটগাছ উঁচুতে বেশী না বাড়লেও, চারিদিকে চওড়ায় দেড় হাজার ফুট বেড়ে যায়। ডাল থেকে বেরুনো এই সব শেকড় বা গুঁড়িগুলোকে দূর থেকে এক গোছা তোরণ বলে মনে হয়। এইগুলি কেটে খুঁটির-কাজে বা দড়ির কাজেও ব্যবহার করা হয়। ডুমুরের মতো ছোট ছোট ফল হয়। পেকে গেলে টকটকে লাল হয়। নানা পাখী ও বাদুড়েরা এই সব ফল খেয়ে, যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করলে, সেখান থেকেই আবার এই গাছ জন্মায়। তাই, বাড়ির আনাচে কানাচে, ছাদের কার্নিশে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। বট গাছ খুব সহজেই বাড়তে পারে। হাওড়ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে বহু বছরের পুরানো এই রকম একটা বটগাছ আছে—যায় আসল ও মূল কাণ্ডটি অনেক বছর আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। ডাল থেকে বেরুনো শেকড় ও গুঁড়িগুলোর উপরেই এই আতকার বিরাট গাছটি আজও দাঁড়িয়ে আছে।

হিন্দু ঘরে পূজার সময়ে এই গাছের পাতার খুবই প্রয়োজন হয়। একে পূজার ভাষায় বলা হয়—পঞ্চবৃক্ষের বন বা পঞ্চবট বা পঞ্চ পল্লব। বৈদান্তিক

বা বৈষ্ণব মতে পঞ্চ পল্লবের নাম হলো—অশ্বত্থ, অশোক, বট, আমলকী (অথবা আম্র) এবং বিল্ব (অথবা যজ্ঞডুমুর)। তান্ত্রিকদের পঞ্চ পল্লব হলো—অশ্বত্থ, অশোক, বট, বকুল ও কাঁঠাল।

বাসববিজয়ী ও রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাবার আগে নীলমেঘের মতো ভীমদর্শন এক বিরাট বটবৃক্ষকে পূজা করে যুদ্ধযাত্রা করতেন। ফলে তিনি অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করতে পারতেন ও শত্রুদের বধ ও বন্ধন করতেন। রামের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে, এই বটবৃক্ষকে পূজা করতে যাবার আগেই, বিভীষণ লক্ষণকে এনে ইন্দ্রজিৎকে বধ করার গোপন কৌশলটা বলে দেন। এই ভাবেই বটবৃক্ষের কৃপালাভে বঞ্চিত হয়ে লক্ষণের হাতে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হয়। (রামায়ণ সর্গ ৮৫—৮৭)

সীতা তাঁর শ্বশুর দশরথের শ্রাদ্ধ কার্য করেছেন কিনা, শ্রীরামচন্দ্র তা জানতে চান তিনজনের কাছে। (১) ব্রাহ্মণ, (২) ফল্গুনদী, (৩) বট বৃক্ষ। অর্থলোভে ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা বলে অর্থাৎ রামকে বলে যে, সীতা-দেবী শ্রাদ্ধকাজ করেন নি। সীতার অভিশাপে ব্রাহ্মণ মাত্রই চিরদারিদ্র্যকে বরণ করতে বাধ্য হয় অর্থাৎ লাখ টাকা পেয়েও সে ভিখারী হয়ে থাকবে। ব্রাহ্মণকে সাহায্য করার জন্য ফল্গুনদীও মিথ্যা কথা বলে। সীতার অভিশাপে ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা হয়। নদীকে কেউ দেখতে পাবে না—সকলে মাড়িয়ে চলে যাবে। একমাত্র বটবৃক্ষই সত্য কথা বলে—"হ্যাঁ, সীতা দেবী শ্রীরামচন্দ্রের অসাক্ষাতে দশরথের শ্রাদ্ধকার্য করেছিলেন।" সীতার আশীর্বাদে বটবৃক্ষ অমর হয়ে যায়! লক্ষ লক্ষ জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী ও মানুষ বটবৃক্ষের আশ্রয়ে শান্তিলাভ করে থাকে। গ্রীষ্মকালে বটবৃক্ষের হাওয়া হয় শীতল, আর শীতকালে হাওয়া হয় গরম। (রামায়ণ)

সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের নাম কিভাবে হোল?

প্রাচীনকালে যখন সপ্তাহ বলে কোন সময় বা দিন ছিল না, তখন দিনের বা বারের কোনও নামকরণ হয়নি। তখন শুধু মাসের নামই প্রচলন ছিল। সহর ও নগর গড়ার পর, লোকেরা একটা বিশেষ দিন ঠিক করলো যেদিন সকলে বাজার হাট করতে পারে। প্রথমে এটা করা হয়েছিল দশদিন অন্তর, কখনও কখনও সাতদিন অন্তরও করা হতো। আবার পাঁচদিন অন্তরও বাজারহাট করা হতো। (১) ব্যাবিলনের লোকেরা ঠিক করলো যে, সাতদিন অন্তর সকলে বাজার হাট ও ধর্মীয়

কাজকর্ম করবে। এদিনে কেউ অন্য কাজ আর কিছু করবে না। (২) ইহুদিরাও এই নিয়ম মেনে চলতো। তাছাড়া এই দিনটা বিশেষ করে, উপাসনাদির জন্যই তারা ঠিক করে রেখেছিল। (৩) ইহুদিরাই প্রথম সপ্তাহের এক একটা নাম দিল। সপ্তম দিনটিকে বলা হতো সাব্বাথ ডে অর্থাৎ শনিবার। চতুর্থ দিনটিকে বলা হতো বুধবার। (৪) মিশরীয়গণ গ্রহের নামানুসারে এক একটি বারের নামকরণ করলো। (৫) রোম্যানরা মিশরীরদের দেওয়া নামগুলিই ব্যবহার করতে লাগলো। সূর্য বা রবি অনুসারে রবিবার ; চন্দ্র উপগ্রহ অনুসারে সোমবার, রণদেবতা মার্সের বা মঙ্গলগ্রহের নামানুসারে মঙ্গলবার, রোমীয় দেবতা বিশ্বকর্মা মার্কারি বা বুধগ্রহ অনুসারে বুধবার, রোমীয় দেবরাজ জুপিটারের বা বৃহস্পতি গ্রহের নামানুসারে বৃহস্পতিবার, সৌন্দর্য ও প্রণয়ের দেবী ভেনাসের বা ভেনাস গ্রহের নামানুসারে শুক্রবার এবং রোমীর কৃষিদেবতা স্যাটার্ণের নামে বা স্যাটার্ন গ্রহের নামে শনিবার। (৬) অ্যাংলো স্যাক্সনরা দেবতাদের নামানুসারে বারের নাম করে। এদের ও রোম্যানদের দেবতা প্রায় এক। (৭) ভারতবর্ষে সূর্যদেবতা বা রবি থেকে রবিবার, চন্দ্রদেবতা থেকে সোমবার, মঙ্গলচণ্ডী থেকে মঙ্গলবার, বুধদেবতা থেকে বুধবার, দেবতাদের গুরু আচার্য বৃহস্পতির থেকে বৃহস্পতিবার, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য থেকে শুক্রবার এবং সূর্য পুত্র ও যমের ছোট ভাই শনিদেবতার নাম থেকে শনিবার।

ধর্মের উৎপত্তি হলো কিভাবে ?

প্রাচীন কাল থেকেই বিশ্বচরাচরে প্রকৃতির বিভিন্ন রকমের প্রকাশ হয়ে আসছে। তখনকার লোকেরা এই সব অবাক হয়ে দেখতো, ভয় পেতো এবং পরে পূজাও করতো। এই ভাবেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হয়। সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম হলো হিন্দুধর্ম। কে যে এই ধর্মের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা, তা কেউ বলতে পারে না। পৃথিবীর সৃষ্টির আদিতে ছিল নিরাকার পরম ব্রহ্ম—তার রূপ ছিল ওঁ (ওংকার)। এই শুদ্ধ পবিত্র শব্দটি থেকে তিন দেবতার উদয় হয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু ও ধ্বংসকর্তা মহাদেব।

পৃথিবীর যতো ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, সব ধর্মেরই প্রবর্তক হলেন—কোনো ঈশ্বরীয় অবতার বা ত্রাণকর্তা বা মুক্তিদাতা বা জীবোদ্ধারকারী কোনো মহামানব। হিন্দুধর্মই এর বাইরে। অনুমান করা হয় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যখন এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন তখন জীব জন্তু পশু পাখীদের সঙ্গে সঙ্গে তিনিই এই

হিন্দুধর্মেরও প্রবর্তন করেছিলেন। হিন্দুধর্ম বিরাট ও বহুব্যাপক, হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখা অনেক—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক, গাণপত্য, সূর্যোপাসক, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, অঘোরপন্থী, শিখ ইত্যাদি। শিবের ভক্তগণ শৈবধর্ম পালন করেন। শাক্তগণ হলেন কালী, চণ্ডী, দুর্গা, প্রভৃতি শক্তিময়ী দেবীর পূজারী। বিষ্ণুর ভক্তরা বৈষ্ণবী নিরাকারবারী হলেন বৈদান্তিক বা ব্রাহ্ম। গণেশের ভক্তরা হলেন গাণপত্য। সূর্যের ভক্তবৃন্দ সূর্যোপাসক। সূর্যোপাসকদের মতে সূর্যই আদি দেবতা—এর থেকে সারাবিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাবীর প্রবর্তন করেন কঠিন অহিংসাবাদীদের ধর্ম-জৈনধর্ম। বুদ্ধদেবের বৌদ্ধধর্ম কোনো দেবদেবীকে বিশ্বাস করে না। সমস্ত কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারলেই দুঃখকষ্টকে জয় করা যায়। জৈনধর্মের প্রধান দু'টি শাখা হলো—দিগম্বর সম্প্রদায় ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়। জৈনধর্মের প্রধান দুটি শাখা হলো—হীনযান সম্প্রদায় ও মহাযান সম্প্রদায়। চীনের বিখ্যাত দার্শনিক কনফুসিয়াস যে ধর্ম চালু করেছিলেন তার নাম হলো কনফুসিয়াস ধর্ম। এই ধর্মের মূল হলো মানুষের সহিত মানুষের মতোই ব্যবহার করা উচিত। মনুষ্যত্বই ধর্মের মূল। যীশুখৃস্টের জন্মের প্রায় ছয় শো বছর আগে এই ধর্ম চালু হয়। ঐ সময়ে চীনে তাও ধর্ম ও চালু হয়। দার্শনিক লাওৎসের লেখা বই ''তাও-তে-কিং'' থেকে এই ধর্মের উৎপত্তি। সরল, স্বাভাবিক ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনই বলে এই ধর্মের সারকথা। জাপানের প্রাচীন ধর্ম হলে শিন্টো ধর্ম। জাপানের শিন্টো ধর্মকে চীনেরা পরে অনেক রূপান্তরিত করে। ইরানের ত্রাণকর্তা জরথুস্ট বাজোরোয়াসটার আহুর মাজ,দাকে (অর্থাৎ জ্ঞানী প্রভু) একমাত্র ঈশ্বর বলে প্রচার করলেন। আরবদেশের মহম্মদ মুসলিম ধর্ম প্রচার করে বললেন আল্লাই মহান দেবতা। প্যালেটাইন থেকে ইহুদী ধর্ম সৃষ্টি হলো—প্রচার করলেন মুসা (মোজেস)। প্যালেস্টাইনের আর একজন ত্রাণকর্তা যীশুখৃষ্ট। ইনি খৃষ্টধর্ম প্রচার করলেন। ভারতে পাঞ্জাবের গুরু নানক শিখধর্মের প্রবর্তন করেন—মুঘল রাজ্যের রাজত্বকালে।

একেশ্বরবাদীদের প্রচলন হল কবে থেকে ?

যারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁরা হলেন একেশ্বরবাদী। আর নানা ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা হলেন বহুঈশ্বরবাদী বা অনেকেশ্বরবাদী। যে সব ধর্মের এখন অস্তিত্ব নেই এবং পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের সবগুলিই বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো। এই সব ধর্ম হলো মিশরীয় ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, গ্রীক, রোম্যান, কেলটিক এবং নরস্। আদিম জাতিরা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস

করতো।

একেশ্বর বাদীর মতবাদ পরে চালু হয়। অনেকের মতে এই একেশ্বর-বাদীর মতবাদই ঠিক পথ। যে সব ধর্মীয় মতবাদ প্রচলিত আছে, এদের মধ্যে এই মতও পথটাই নির্ভুল ও আদর্শমূলক। ভগবান এক এবং তিনিই বহু হয়েছেন। কিন্তু এই মতবাদ বাজারে প্রচলিত হতে বহু বছর কেটে যায়। রাজতন্ত্র থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে। রাজতন্ত্র মানে এক রাজার অধীনে সব প্রজা বাস করে। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও ঠিক তেমনি ধারণা ছিল যে, দেবতাদের মধ্যেও একজন রাজা বা প্রধান আছেন। তিনি হলেন জীয়ুস। মিশরীয়দের দেবতাদের রাজা হলো "রা"। বাবিলনিয়বাসীদের দেবতাদের রাজা "মারতুক"। প্রাচীন পারসিক ধর্ম জরথুস্ট্রের মতে ঈশ্বর দুজন। একজন সৎ অর্থাৎ আহুর মাজদা। একজন অসৎ অর্থাৎ শয়তান বা আহ্রীম্যান। হীব্রুধর্ম থেকে উত্থিত ইহুদী, খৃস্টানধর্ম একেশ্বরবাদী। মুসলিম ধর্মও একেশ্বরবাদী। হিন্দুধর্ম সব মতেই বিশ্বাসী। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা বৈদান্তিক—তাঁরা বলেন ঈশ্বর এক। সাংখ্যবাদীরা বলেন—পুরুষ ও প্রকৃতি থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বর দুই। অনেকেশ্বরবাদীরা বলেন—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি বিশ্বের কল্যাণের জন্য তেত্রিশ কোটি দেব দেবীতে বিভক্ত হয়েছেন। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—পুকুর থেকে জল নিচ্ছে অনেকেই। কেউ বলছে ওয়াটার, কেউ বলছে পানি, কেউ বলছে জল, কেউ বলছে অ্যাকোয়া। নাম বিভিন্ন হলেও জিনিস একই। বালিশের বাইরের খোল নানা রকমের হয়, নানা নামও হয়—কিন্তু ভেতরে সবই সেই এক তুলো। সেই রকম ঈশ্বরের নানা নাম, কিন্তু জিনিস সেই একই।

পদাঘাত অন্যায় কেন ?

কারুর গায়ে যদি হঠাৎ পা লেগে যায়, আমরা সেটাকে অন্যায় বলে মনে করি। আর সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আর ইচ্ছে করে কাউকে পদাঘাত করা বা লাথি মারা—পাপ। আর ক্রোধভরে বা হিংসার আশ্রয় নিয়ে কাউকে বলপূর্বক লাথি মারা বা পদাঘাত করা মহাপাপ।

যার গায়ে পা লাগে, আমরা তাকে কিন্তু প্রণাম করি না। ঈশ্বর সর্বভূতেই বিরাজ করছেন। বিশেষ করে জীব মাত্রই ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির। সুতরাং পা লাগলেই যে প্রণাম করি, তা এই ঈশ্বরকেই করি। যার গায়ে পা লাগলো, সেই লোক যতো ছোটো বা তুচ্ছই হোক, আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি 'সরি' বা 'দুঃখিত' এবং প্রণাম করি। মনে মনে বলি,—ঈশ্বর

আমার অপরাধ ক্ষমা করো।

আর একটি কারণ হলো—পৌরাণিক কারণ। দক্ষিণের দিকপাল হলেন যমরাজ। এঁর পিতা হলেন সূর্যদেব এবং মা হলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা। যমরাজের যমজ বোন হলেন যমুনা এবং বড় দুইভাই হলেন বৈবস্বতমনু ও শ্রাদ্ধদেব। সূর্যের তেজকে সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা নিজের ছায়াকে সূর্যের কাছে রেখে চলে যান। ছায়া সংজ্ঞার সন্তানদের অযত্ন করতেন বলে, যমরাজ রেগে গিয়ে বিমাতা ছায়াকে পদাঘাত করেন। বিমাতা ছায়ার অভিশাপে যমের পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়ে বিষাক্ত ঘা ও পোকায় ভর্তি হয়ে যায়। পিতা সূর্যদেব তখন যমকে একটি কুকুর দান করেন। এই কুকুরই যমের পা থেকে বেরুলো সমস্ত পুঁজ ও পোকামাকড় খেয়ে যমকে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু পা দুটো দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্য মহিষের পিঠে চড়ে ঘোরাফেরা করতে হয়। এই মহিষের পিঠে চড়ে এসেই যমরাজ পতিব্রতা সাবিত্রীর সামনে হাজির হন, তার মৃত পতি সত্যবানকে জীবিত করে তোলেন এবং রাজ্যভ্রষ্ট শ্বশুরকে চক্ষু ও রাজ্য ফিরিয়ে দেন। যমরাজ যদিও স্বর্গের দেবতা তবুও তাঁকে নরকের রাজ্যে থাকতে হয়। এর একমাত্র কারণ, তিনি তাঁর সৎমাকে লাথি মেরেছিলেন।

সূর্যের দ্বিতীয়া স্ত্রী ছায়ার গর্ভে দুই পুত্র সাবর্ণিমনু ও শনিদেব এবং কন্যা তপতীর জন্ম হয়। শনিদেব অত্যন্ত তেজস্বী দেবতা। শনিদেব তাঁর স্ত্রী চিত্ররথের প্রতি দুর্ব্যবহার করায়, স্ত্রী শনিদেবকে অভিশাপ দেন—শনিদেব যার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সেই বিনষ্ট হবে। শনিদেব নির্ভীক হয়ে চলাফেরা করতেন, এসব গ্রাহ্য করতেন না। লোকে তাঁর চলাফেরাকে আজও ভয় করে। কেউ চায় না যে তাঁর পায়ের ধুলো কারুর ঘরে পড়ুক। এই কারণে শনিদেবের পূজা গৃহস্থের বাড়িতে হয় না। বাড়ির বাইরে রাস্তাঘাটে এঁর পূজা হয়। দুর্ভাগ্যের দেবী এবং মহাতপা মুনি দুঃসহের স্ত্রী ও লক্ষীদেবীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী অলক্ষ্মীর পূজাও বাড়ির বাইরে রাস্তাঘাটে হয়।

গণেশের জন্মের পর পার্বতীর অনুরোধে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে শনিদেবও গণেশকে দর্শন করতে যান। দম্ভভরে চলতে থাকেন। প্রতি পদক্ষেপেই শব্দ হতে থাকে। গণেশের মুখদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর অভিশাপ অনুযায়ী, গণেশের মাথা অদৃশ্য হয়ে যায়। পুত্রকে মস্তকহীন দেখে পার্বতীদেবী প্রথমেই শনিদেবের দুটি পায়ের দিকে নজর দেন। এই দুটি পা থেকেই চলার সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ বেরিয়ে আসছিলো। পার্বতীদেবী

এইসব সহ্য করেছিলেন। কিন্তু পুত্রের মস্তকহীন দেহ দেখে দিশেহারা হয়ে যান ও শাপ দেন যে, শনি খোঁড়া হয়ে যাক।

এইসব কারণেই লোকে চায় না যে, নিজের পা অপরের গায়ে লাগুক। অজান্তে লাগলে সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা চেয়ে নেয়।

মানুষ কিভাবে ঘরের মধ্যে বাস করতে শিখল ?

অন্যান্য জীবজন্তুর মতো মানুষও প্রথমে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতো। প্রথমে তারা দুভাবে ঘর করতো। প্রথমে কোনও গর্তের ভেতরে অর্থাৎ গুহাঘর। আর দ্বিতীয় হলো গাছের তলায় অর্থাৎ বৃক্ষগৃহ। গাছের ডালগুলোকে নীচে টেনে নামিয়ে এনে বেঁধে ঘরের ছাদ তৈরি করতো। এই ভাবে তারা সূর্যের আলো, বৃষ্টি ও অন্যান্য বুনো জন্তুদের হাত থেকে বাঁচতে চেষ্টা করতো। পরে যখন বাণ আসতো ও রাস্তাঘাট সব ডুবে যেতো ; তখন এই ঘর তারা গাছের উপরে বানাতে শিখলো।

কিন্তু শীতকালে বৃক্ষগৃহ সুবিধাজনক হতো না। তাই তারা গুহাগৃহতে বাস করতে শিখলো। আর গুহার মুখে ও বাইরে আগুনও জ্বেলে রাখতো। পরে মানুষ পাথরের চাঁই ও টুকরো উপরে উপরে সাজিয়ে শক্ত ও মজবুত ঘর করতে শিখলো। পরে আরো সভ্য হবার পর, পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে, সেইখানে বাড়ি করতো।

আধুনিক সভ্যসমাজে, দেশের আবহাওয়া ও প্রকৃতি অনুযায়ী বাড়ি ঘর তৈরি হয়। যেখানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়, সেখানে কাঠ বাঁশ ও টালির বাড়িঘর হয়। ভেঙে যাবার ভয়ে পাকা বাড়ি হয় না। যেখানে বরফ পড়ে, সেখানে বাড়ির ছাদ ঢালু হয়। সাধারণ ছাদ হলে, বরফ পড়ে ছাদ পূর্ণ হয়ে যায়। সাফ করার অসুবিধা হয় এবং ছাদও বরফের চাপে ভেঙে পড়তে পারে।

ইঁটের প্রচলন কবে থেকে চালু হল ?

পাকা বাড়ি তৈরি করতে হলে যেসব পদার্থের প্রয়োজন হয়, সেই সব পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত, মজবুত ও স্থায়ী হলো ইঁট। পোড়ামাটি পাথর বা লোহা দিয়ে ইঁট তৈরি হয়।

বাড়ি তৈরির আধুনিক কাঠামো হলো—ইঁট। পৃথিবীর সর্বত্রই আজকাল

এই ইঁটের প্রচলন আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হাজার হাজার বছর আগে থেকেই এর ব্যবহার চলে আসছে। ভারতে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় খনন কাজের পর এর প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে। তখনকার যুগে কাঁচা মাটিকেই ইঁট হিসাবে ব্যবহার করা হতো। মাটিতে জল ও খড় মিশিয়ে পা দিয়ে ঠাসা ও চট্‌কানো হতো। তারপরে তাকে দিয়ে নানা আকারের মতন করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হতো। এই ভাবেই বহু বছর চলেছিল।

পরে দেখা গেল এই সাইজ করা ইঁটকে পুড়িয়ে নিলে, আরো মজবুত ও শক্ত হয়—আর জলকেও প্রতিরোধ করতে পারে। তখন থেকে বিনা খড় দিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে ইঁট তৈরি হতে লাগলো। এই ধরনের ইঁট প্রাচীন ব্যাবিলন শহরের অনেক মন্দিরে ব্যবহার করা হতো।

ডিম কিভাবে হয় ?

প্রথমে দেখলেই মনে হবে—ডিম তৈরি হয় খুব সহজ ভাবে। কিন্তু তা নয়। ডিম্বসৃষ্টির কৌশল বড়ই জটিল। পাখীর পেটের মধ্যে যেখানে ডিম হয়, তাকে বলে ডিম্বাশয় বা ইংরাজীতে ওভ্যারি। এখানে ডিমের হলদে অংশটাই প্রথমে জন্মায়। হল্‌দে অংশটা এখান থেকে বেরিয়ে উপর দিকে চলে যায়। এখানে সাদা অংশটা এর চারদিকে জুড়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে পাইপ দিয়ে নীচে নেমে আসে। আসল ডিমটা তৈরি হয়ে গেল। এরপরে বাইরের খোলাটা তৈরি হয়। খোলাটা শক্ত হলেও, এতে ছোট ছোট অনেক ছিদ্র আছে। এইসব ছিদ্রের মধ্যে দিয়েই ডিমের জলীয় ভাগ বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। তখন সেখান দিয়ে শুদ্ধ অম্লজান বা অক্সিজেন গ্যাস ডিমের মধ্যে ঢোকে। এর সাহায্যেই ডিমের ভেতরের বীজাণুটা সুস্থ ও সবল হয়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং তা থেকে বাচ্চার জন্ম হয়। শক্ত খোলার নীচে আর একটি পাতলা আবরণ থাকে। এই দুই আবরণের মাঝে বায়ু-কোষ থাকে। ডিমের সাদা অংশের কোনও স্বাদ বা গন্ধ নেই। এর বেশীর ভাগ জল থাকে এবং খুব ঘন ও থল্‌থলে হয়। এর কাজই হলো—বাইরের কোনও ধাক্কা থেকে হল্‌দে অংশটিকে রক্ষা করা। বীজাণুটির খাদ্য হলো এই হল্‌দে অংশটি। এটি গোলাকার এবং অণুবীক্ষণ (মাইক্রসকোপ্‌) যন্ত্র দিয়ে একে দেখা যায়। পাখী বড়ো হলেই যে ডিমটাও বড়ো হবে, তার কোনও মানে নেই। ডিম হওয়ার পর থেকে কিভাবে ডিমে তা দেওয়া হয়েছে এবং কতো খাদ্য তার ভেতরে ঢুকতে পেরেছে, তারই উপর ডিমের আকার নির্ভর করে। ছোট ডিম থেকে যেসব পাখীর জন্ম হয়, তারা প্রায়ই অন্ধ ও

দুর্বল হয়। অর্থাৎ ডিমের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য মজুত হ'তে পারে নি।

মানুষ কবে থেকে দুধ খেতে শিখলো ?

দুধ বলতে আমরা গোরুর দুধই বুঝি। কারণ বেশীর ভাগ লোকই গোরুর দুধই খেয়ে থাকে। ভারতের লোকেরা গোরুর, মোষের ও ছাগলের দুধই খেয়ে থাকে। মহাত্মা গান্ধী ছাগলের দুধ খেতে ভালোবাসতেন। দক্ষিণ ইউরোপের লোকেরা ছাগলের দুধ, আর উত্তর ইউরোপের লোকেরা বলগা হরিণের দুধ খেয়ে থাকে। ঠিক কবে থেকে দুধ খাওয়ার প্রচলন হয় তা ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে পুরাণে আমরা পাই যে, বশিষ্ঠ মুনির একটি কামধেনু ছিল—নাম নন্দিনী। নন্দিনী হলো সুরভি কামধেনুর কন্যা। দুধ ছাড়াও অন্য যে কোনও জিনিস এদের কাছে চাইলে পাওয়া যেতো। নন্দিনী কামধেনুকে নিয়েই বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল।

ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই দুধ, মাখন, পনীর, ছানা খাওয়ার প্রচলন চলে আসছে।

দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোপবালক হয়ে জন্মেছিলেন। বালক শ্রীকৃষ্ণ নিজে গোরু চরাতেন এবং মাখন, ননী প্রভৃতি খেতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর নামই ছিল ননী চোরা। ভারতের লোকেরা গোরুকে গোমাতা হিসাবে পূজো করে থাকে। অনেক সম্প্রদায় গোমাংসও খেয়ে থাকে।

বাইবেলে বর্ণিত আদম পুত্র আবেল প্রচুর ভেড়া পালন করতো এবং ভেড়ার দুধ খাওয়ার প্রচলন ছিল। যিশু খৃষ্টের আবির্ভাবের দেড় হাজার বছর আগে, 'কানান' বলে একটি জায়গার নাম শোনা যেতো। একে বলা হতো দুধ ও মধুর দেশ।

জমাট দুধ ও গুঁড়ো শুক্‌নো দুধের প্রচলন হয়েছে বর্তমানের আধুনিক যুগে। তাতারদের সময়ে এবং চেঙ্গিস্ খানের রাজত্বকালে আঠার মতো জমাট দুধ ব্যবহার করা হতো। ১৮৫৬ সালে সৈন্যদের ব্যবহারের জন্যে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে ব্যাপকভাবে গুঁড়ো দুধের প্রচলন শুরু হয়। গোরুর দুধের মধ্যে শতকরা ৮৭ ভাগ থাকে জল। বাকি যে ১৩ ভাগ থাকে, তাতেই প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং এ ও বি ভিটামিন থাকে।

মাখনের আবিষ্কারক কে ?

খাদ্য হিসাবে মানুষ যে সব জিনিষ ব্যবহার করে সে সবের মধ্যে মাখন

হলো খুব প্রাচীন। পুরাকালে খাদ্যের চেয়ে ঔষধ হিসাবেই মাখনের বেশী ব্যবহার হতো। মাখন থেকে যে ঘি হতো, তা দিয়েই প্রাচীনকালে যজ্ঞকালে আহুতি দেওয়া হতো। শিবলিঙ্গের গায়ে শুদ্ধ মাখন লাগানো হতো। এতে দূর থেকে শিবলিঙ্গকে খুব উজ্জ্বল দেখাতো। পূজার সময়ে মিছরি ও মাখন প্রসাদের জন্য ভগবানকে ভোগ দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণও মাখন খেতে ভালবাসতেন।

গ্রীক ও রোম্যানরা মাখন খেতো না। চামড়ায় কোন ক্ষত হলে সেখান তারা মাখন লাগাতো। পোড়ামাখনের ভূষি চোখে লাগাতো। মাখনের মলম ব্যবহার করা হত চুলে ও চামড়ায়।

ভারতের মেয়েরাও মাখন গলানো ঘিয়ের ভূষি দিয়ে ছেলে মেয়েদের চোখে কাজল পরিয়ে দেয়। এতে চোখের জ্যোতি বাড়ে। চোখের কোনও রোগ হয় না। চোখের গঠনও সুন্দর হয়—যার নাম পদ্মপলাশ লোচন।

৩০০ বছর আগে, ওষুধের দোকানে মাখন বিক্রি হতো। মাখন খাওয়া যখন চালু হলো, তখন লোকে টাটকা মাখন খেতো না। একে গলিয়ে নিয়ে তবে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতো। পরে স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে সারা ইউরোপে খাদ্য হিসাবে মাখনের প্রচলন ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে মাখন একটি অতীব প্রয়োজনীয় খাদ্য। মাখন প্রচুর শক্তিদায়ী ও সহজ পাচ্য। পাকস্থলীর মধ্যে অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় ও সারা শরীরে শক্তি জোগাতে থাকে।

গোরুর ও মোষের দুধ থেকেই বেশি মাখন হয়। কারণ এই দুধে চর্বি বেশি থাকে। দুধ থেকে ক্রীমটুকু বার করে, ভাল করে মন্থন করে নেওয়া হয়। পরে পাস্তুরাইজ প্রথায় একে জীবাণু মুক্ত করে ফেলা হয়। চর্বি টুকু বার করে নেওয়ার জন্যই মন্থন করা হয়। ক্রীম থেকে চর্বির অংশটুকু বাদ দিয়েই মাখন বার করে নেওয়া হয়। এতে পরে জল মিশিয়ে, আবার মন্থন করা হয়, যাতে চর্বির লেশ মাত্রও না থাকে। জলটুকু বার করে দিলেই খাঁটি মাখন পাওয়া যায়। তখন তাতে প্রয়োজন মত রঙ ও গন্ধ মিশিয়ে বাজারে প্যাক করে ছাড়া হয়।

বেহালার জাদুকর কাকে বলা হয় ?

চার বছরের ছোট্ট ছেলে বায়না ধরল জন্মদিনে তার একটা বেহালা চাই। এক আত্মীয় তাকে ভোলাবার জন্য উপহার দিল টিনের তৈরী একটা খেলনার বেহালা। ব্যস, তাতেই বাধল বিষম গণ্ডগোল। টিনের বেহালা বাজাতে গিয়ে তা থেকে বেরুল বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ—মাথা গরম হয়ে গেল

বাচ্চা ছেলেটার। আছাড় মেরে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে বারোটা বাজিয়ে দিল খেলনার বেহালার। সেই সঙ্গে জুড়ে দিল কান্না—'এ গান গায় না, এ গান গায় না !'

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক ইহুদী মেনুইনের এই হল বেহালা বাজানোর প্রথম অভিজ্ঞতা।

ইহুদীর জন্ম নিউ ইয়র্কে ১৯১৬ সালে। হিব্রু ভাষায় 'ইহুদী' মানে হল 'জ্যু'। ইহুদীর বাবা-মা দুজনেই রাশিয়ান। তাঁরা দেশ ছেড়ে প্যালেস-টাইনে গিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং পরে যান সানফ্রানসিসকোতে। সেখানে এক হীব্রু স্কুলে দুজনেই মাষ্টারী করতেন। ইহুদীর বাবা অল্প বয়সে কিছুটা বেহালা শিখেছিলেন, কিন্তু পয়সার অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। ইহুদীর মা ভাল পিয়ানো আর চেলো বাজাতেন। এক বছরের ইহুদীকে তাঁরা লুকিয়ে-চুকিয়ে কনসার্ট দেখাতে নিয়ে যেতেন, কারণ এতো ছোট ছেলে পাছে গণ্ডগোল করে বলে ঢুকতে দেওয়া হতো না। ইহুদী কিন্তু চুপ করে মা'র কোলে বসে মুগ্ধ হয়ে বাজনা শুনত আর মাঝে মাঝে মুখ্য বেহালাবাদকের দিকে আঙুল দেখাত, কিন্তু মুখে কোন শব্দ করত না।

জন্মদিনের বেহালা ভাঙার কথাটা ইহুদীর মা প্যালেসটাইনে তার দিদি-মাকে হাল্কাভাবে লিখে জানাতে দিদিমা কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই উড়িয়ে দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ ডলার পাঠিয়ে দিলেন নাতিকে একটা সত্যি-কারের বেহালা কিনে দেবার জন্য।

ইহুদীর বাবা-মা ঠিক করলেন ছেলে আর একটু বড় হোক, এখনও তার বেহালা ধরার বয়স হয় নি। তাই টাকাটা যত্ন করে তুলে রেখে দিলেন। যখন ইহুদী পাঁচ বছরে পড়ল, তখন তাঁরা দিদিমার পাঠানো টাকার অর্ধেক দিয়ে ইহুদীকে একটা সত্যিকারের বেহালা কিনে দিলেন আর বাকী অর্ধেক দিয়ে গাড়ীর ভাড়া মেটালেন। এরপর অনেক খুঁজে একজন খুব ভাল বেহালা শেখানোর মাষ্টার জোগাড় করা হল। তারপর শুরু হল ইহুদীর জীবনের সাধনা।

প্রথম কয়েকমাস মোটেই সুখের হল না। মনে প্রচণ্ড ইচ্ছে ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ইহুদী বেহালা নিয়ে মোটেই সুবিধে করতে পারল না। স্বর-কম্পন তার কাছে অসম্ভব মনে হল। একটা বিচ্ছিরি চ্যা-চ্যা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই সে বেহালা থেকে বার করতে পারল না। একদিকে মাষ্টারের ধমকানি, অন্যদিকে বাবার হতাশ মাথা নাড়া আর মার বিষাদমাখা পরাজিত মুখ দেখে বেচারা ইহুদী ডুকরে কেঁদে উঠল।

তারপর হঠাৎ একদিন তার দক্ষতা ফুটে বেরুল এবং তখন থেকেই সে এগিয়ে চলল উল্কার বেগে। এক বছরের মধ্যেই প্রথম সে সবার সামনে বাজিয়ে শোনাল। সেটা ছিল তার মাস্টারের ছাত্রদের বার্ষিক কনসার্ট। তখন তার বয়স মাত্র পাঁচ বছর দশ মাস। এর কিছুদিন পরেই ইহুদী তার মার সঙ্গে Paderewski's Minuet বাজিয়ে শোনাল আর একটা কনসার্টে। আট মাস পরে বাজিয়ে শোনাল Accolay's Concerto in Aminor, তখন তার বয়স সাত বছরও হয়নি। একজন সঙ্গীত সমালোচক তা শুনে বলেছিল 'এ ছেলে একদিন শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ হবে।'

জীবনের সবকিছুতেই যে ইহুদী একেবারেই সফল হয়েছে তা নয়। বেশ কিছু অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জন করে ইহুদী বার্ষিক Gold Medal প্রতি-যোগিতায় নাম দিল। কিন্তু একটি বার বছরের মেয়ে প্রথম হল। ইহুদী হল দ্বিতীয়। মন ভেঙে গেল তার। অভিমান হল প্রচুর। Beethoven Minuet in G বাজান সে ছেড়ে দিল। কিছুতেই সে এটা বাজাত না—অভ্যাসও করত না। কারণ এটা বাজিয়ে সে প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পারে নি। পরবর্তী তিরিশ বছরে ইহুদী Beethoven Minuet in G মোটেই বাজায় নি। পরে অবশ্য রেকর্ড করেছিল।

এই সময় ইহুদীকে ছোট্ট গোলগাল দেখতে ছিল। বয়স সাত বছর। এই বয়সের অন্যান্য ছেলেদের মত সাঁতার কাটতে, বেড়াতে আর আইসক্রীম খেতে খুব ভালবাসত। কিন্তু ইহুদীর বাবা বলতেন, 'হাতে বেহালা নিলেই ও পাল্টে যায়, আমাদেরকেও যেন চিনতে পারে না। মনে হয় কিছু যেন একটা ওর ওপর ভর করে।'

ইতিমধ্যে ইহুদী শেখা শুরু করছিল সেই মুখ্য বেহালাবাদকের কাছে যার দিকে শিশু বয়সে মায়ের কোলে বসে সে আঙুল দেখাত। ইনি হলেন প্রখ্যাত বেহালাবাদক লুই পারসিঙ্গার। পারসিঙ্গার বলেন, 'যখন ইহুদী প্রথম আমার কাছে আসে, আমি তার বাজনা একটুখানি শুনেই থামিয়ে দিয়েছিলাম—কারণ যা শুনেছিলাম তাইতেই তার অঙ্কুরিত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছিল। কিন্তু মাঝখানে বাধা দেওয়াতে তার চোখে যে ক্রোধ জ্বলে উঠেছিল তা আমি কোনদিন ভুলব না।' ইহুদীর বাবার মত তিনিও বলতেন, 'বাজনার সময় ইহুদী অন্য মানুষ হয়ে যায়।'

আট বছর বয়সে ইহুদী প্রথম নিউইয়র্কে অনুষ্ঠান করে। কনসার্টে তেমন ভীড় ছিল না। কিন্তু যারা সেদিন উপস্থিত ছিল তারা অনুভব করে-ছিল যে একটা খুব উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান তারা উপভোগ করল। নিউ-

ইয়র্কের এক ধনী আইনজীবী ইহুদীর বাজনা শুনে যতদিন পর্যন্ত দরকার ততদিন পর্যন্ত তাকে সঙ্গীত শিক্ষা ও পড়াশুনার জন্য সাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু ইহুদীর মা তখনও মন ঠিক করতে পারছিলেন না বিস্ময়কর প্রতিভা-ধারী ছোট্ট ইহুদীকে এই কঠোর জীবনে ঠেলে দিতে। তাই তিনি মত দিলেন না।

পরে অবশ্য তিনি রাজী হন। তখন পরিবারে সবাই মিলে, অর্থাৎ বাবা, মা, ইহুদী এবং ইহুদীর দুই বোন, প্যারিসে চলে আসেন। ইহুদীর এক বোন, হেফজিবা, পরবর্তী জীবনে নামকরা কনসার্ট-পিয়ানো বাজিয়ে হয়ে উঠেছিল। অন্য বোন, ইয়ালটা, ষোল বছর বয়সে বিয়ে করে সঙ্গীত জীবনের সম্ভাবনায় ইতি টানে।

প্যারিসে এসে ইহুদী দুজন বিখ্যাত বেহালাবাদকের কাছে শেখা আরম্ভ করল। একজন রুমানিয়ার জর্জেস এনেসকো। অপরজন অ্যাডলফ্ বুশ। এরপর দশ বছর বয়সে লামুরিউক্স সিমফনি অর্কেস্ট্রার সঙ্গে ইহুদী প্রথম প্যারিসে অনুষ্ঠান করল। তারপর এগারো বছর বয়সে নিউইয়র্কের কার্ণেজি হলে, বার বছর বয়স বার্লিনে, তের বছর বয়সে লণ্ডনে। কোথাও বোন হেফজিবার সংগে, কোথাও স্যার এডওয়ার্ড এলগারের সাথে, কোথাও বা টসকানিনির সংগে। শুরু হল অবিচ্ছিন্ন সাফল্যের সীমাহীন যাত্রা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন আমেরিকা জড়িয়ে পড়ল, তখন আমেরিকার নাগরিক হিসেবে পঁচিশ বছরের ইহুদী গেলেন সৈন্যদলে নাম লেখাতে। কিন্তু দুই শিশুর বাবা বলে তাঁকে মুলতবী রাখা হল। তখন তিনি সৈন্যদের বেহালা শোনাবার কাজে ডুবে গেলেন। যুদ্ধ শেষ হবার আগে পর্যন্ত তিনি পাঁচশরও বেশী কনসার্ট বাজিয়ে শুনিয়েছেন। প্রায়ই সৈন্যরা নানারকম জনপ্রিয় সুর বাজাতে অনুরোধ করত যা ইহুদী জীবনে কোন দিন শোনেননি। কিন্তু কেউ যদি সুরটা শিস্ দিয়ে শোনাত (প্রায় সব সৈনিক শ্রোতাই শিস্ দিতে শুরু করত) তিনি সংগে সংগে তা বেহালায় তুলে নিতেন এবং এত সুন্দরভাবে বাজাতেন যেভাবে এর আগে আর কেউ বাজাতে পারে নি।

অল্পবয়স্ক সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের তিনি বরাবর সাহায্য করে এসেছেন। প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীত ছাত্রদের জন্য ১৯৬৩ সালে লণ্ডন থেকে তিরিশ কিলো-মিটার দূরে সারে গ্রামাঞ্চলের স্টোক ডাবারনন-এ তিনি 'ইহুদী মেনুহিন স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা আছে এই স্কুলে। আট বছর থেকে সতেরো বছরের মধ্যে বয়সের চল্লিশ জন ছাত্র এখানে থাকতে পারে। সকাল সাতটায় স্কুল আরম্ভ হয়। স্কুলের সময়ের অর্ধেকটা কাটে সঙ্গীতচর্চায়,

বাকীটা সাধারণ লেখাপড়ায়। ইহুদী মেনুইন নিজে যখনই সময় পান, কনসার্ট আর রেকর্ডিংয়ের ফাঁকে এসে ছাত্রদের ক্লাস নেন।

আমেরিকার অধিবাসী হয়েও ইহুদী ও তাঁর পরিবার বেশীর ভাগ সময়েই কাটান বৃটেনে কনসার্ট করে। বৃটিশ সঙ্গীতমহলে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনেক সম্মান ও উপাধি পেয়েছেন ইউনিভার্সিটি ও অন্যান্য সংস্থা থেকে। ১৯৬৫ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'নাইট' উপাধি লাভ করেন।

প্রথম শ্রেণীর বেহালাবাদক ইহুদী মেনুইন নানা জায়গায় রেডিও-টেলি-ভিশনে শুধু যে বাজান তা নয়, সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও সাক্ষাৎকারও করেন লণ্ডনের হ্যাম্পস্টিড-এ তাঁর বাসভবনে। নিজের বউ আর বাচ্চাদের নিয়ে 'an evening of talk and music' টেলিভিশন অনুষ্ঠান-টিও তিনি করেন।

১৯৬১ সালে E M I রেকর্ড কোম্পানিতে তাঁর রেকর্ডিংয়ের ত্রিশতম বর্ষ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম রেকর্ড অবশ্য বেরোয় তারও তেত্রিশ বছর আগে ১৯২৮ সালে যখন তাঁর বয়স ছিল মোটে বারো বছর—খেলার বেহালা ভাঙার ঠিক আট বছর পর। পাঁচশরও ওপর রেকর্ড তিনি করেছেন। West Meets East (record no ASD 2294) লং প্লে রেকর্ডে তিনিই প্রথম দুই ধারার সঙ্গীতের মিলন ঘটিয়েছেন। বোন হেফজিবার সঙ্গে বাজিয়েছেন Sonata No 3 in A minor, Op 25, আল্লারাখার সঙ্গে বাজিয়েছেন গুণকেলী রাগের ওপর রচিত 'প্রভাতী', রবিশঙ্করের সঙ্গে বাজিয়েছেন তিলং রাগের ওপর 'স্বর কাকলী'। West Meets East, Vol. II (Record no. EASD 1346) লং প্লে রেকর্ডে রবিশঙ্কর ও আল্লা-রাখার সংগে বাজিয়েছেন রাগ পীলু ও ধুন এবং নেল গটকভ্স্কির সংগে দ্বৈত বেহালায় : বাজিয়েছেন Bartok ও 6 Duos; 'Instruments of the Orchestra' রেকর্ডটাতে তিনি সুন্দরভাবে উদাহরণ দিয়ে অর্কেস্ট্রার প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় অতি সহজ অথচ নিখুঁতভাবে দিয়েছেন।

আরও কত কিছু তিনি জানিয়ে যাবেন—শুনিয়ে যাবেন—উপহার দেবেন সংগীত পিপাসুদের, চার বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছে যাঁর পথ চলা, শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ সেই ইহুদী মেনুইন।

সূর্যাস্তকে লাল দেখায় কেন ?

সূর্য যত হেলে পড়ে পশ্চিমে, ততই তার রশ্মিকে আরও অনেক বেশী বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতে হয়। বাতাসের মধ্যে ধুলো রয়েছে, বাষ্প

রয়েছে এবং অজস্র নোংরা রয়েছে বাতাসের অণুর সঙ্গেই। এরা সূর্যরশ্মির রঙগুলোকে ভেঙে ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। বেগুনী, নীল, আর সবুজ রঙকে যতটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়, লাল আর হলুদ রঙকে ততটা পারে না। তাই সূর্য দিগন্ত ছুঁই ছুঁই করলেই আমাদের চোখে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে লাল আর হলুদ রঙ দুটোই বেশী করে পড়ে—সূর্যাস্ত তাই লালচে দেখায়।

ঠিক এই কারণেই আকাশকেও নীল দেখায়। বেগনী আর নীল রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম বলে বায়ু মণ্ডল লাল রঙকে যতটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে পারে, তার দশগুণ বেশী বিক্ষিপ্ত করে বেগনী আর নীল রঙকে। তার, মানে লাল রঙ সটান বায়ু মণ্ডল ভেদ করে নেমে আসে, কিন্তু নীল রঙটা সরাসরি আসতে পারেনা—বাতাস জল আর ধুলোর কণারা তাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। বিক্ষিপ্ত এই আলোর জন্যই আকাশকে নীল দেখায়।

টাইডাল ওয়েভ কাকে বলে ?

ইংরাজিকে যাকে বলে টাইডাল ওয়েভ বাংলায় তাকেই বলা হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস। টাইড মানে জোয়ারভাঁটা। কিন্তু বিশাল এই তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সঙ্গে জোয়ার ভাঁটার কোন সম্পর্ক নেই। আচমকা সমুদ্রের ঢেউ বহুতল সৌধের আকারে ধেয়ে আসে—জনপদের পর জনপদ ভাসিয়ে দেয়। সর্বনাশা এই জলস্ফীতিই ইংরাজিতে টাইডাল ওয়েভ। কিন্তু জিনিসটা কী?

১৮৮৩ সালের ২৭শে আগষ্ট ভয়ংকর আগ্নেয়গিরি-বিস্ফোরণে ক্র্যাকাতোয়া দ্বীপটা বলতে গেলে ফুটিফাটা হয়ে উড়ে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের ফলে প্রায় একশো ফুট উঁচু ঢেউ ঠেলে উঠেছিল শূন্যে। ধুইয়ে নিয়ে গিয়েছিল কয়েকশ গ্রাম, ঘন্টায় ৭০০ মাইল বেগে সমুদ্র দিয়ে তেড়ে গিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরের অষ্ট্রেলিয়া আর ক্যালিফোরনিয়ার উপকূলে আছড়ে পড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল সেখানেও!

১৯৪৬ সালে অ্যালুইসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে সমুদ্রতলে একটা ভূমিকম্প হয়েছিল। একটা দানবিক তরঙ্গ ঠেলে উঠে পাঁচ ঘন্টারও কম সময়ে ২০০০ মাইল পেরিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। বাড়ি আর ব্রীজ শূন্যে তুলে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করেছিল কয়েকশ ফুট দূরে। ডুবে মরেছিল ১৭০ জনের বেশী মানুষ।

এই দুই সুবৃহৎ তরঙ্গকেই বলা হয় টাইডাল ওয়েভ বা জলস্ফীতি বা জলোচ্ছ্বাস। সমুদ্রে বা তীরের কাছে যে ঢেউ দেখা যায়, এ ঢেউ সে ঢেউ

জোয়ারা ভাঁটা বা হাওয়ার বেগের সঙ্গেও এ ঢেউয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।

জাপানীরা এই ঢেউকে বলে tsunami, বৈজ্ঞানিকরা এই জাপানী নাম করণই করেছেন জলস্ফীতির। সমুদ্রতল কোনো কারণে অস্থির হলেই tsunami দেখা যায়। সাধারণতঃ সমুদ্রতলের ভূমিকম্পই এর উৎপত্তির কারণ।

শব্দ যেমন ঢেউয়ের আকারে বাতাসের মধ্যে দিয়ে ধেয়ে যায়, সমুদ্রতলের ধাক্কাও তেমনি জলের মধ্যে দিয়ে শব্দের গতিবেগেই ধেয়ে যায়। চলার পথে জাহাজ পড়লে, থরথর করে কেঁপে ওঠে গোটা জাহাজটা—মনে হয়, যেন পাথরে ধাক্কা লেগেছে!

সমুদ্রতলে ভূমিকম্প হলেই সেখানকার সমুদ্রতল সরে যায় বা বসে যায়। জলস্ফীতি জেগে ওঠে তৎক্ষণাৎ।

জলস্ফীতি ডাঙার দিকে ধেয়ে আসার সময়ে কিন্তু সাধারণ ঢেউয়ের মতই জলপৃষ্ঠ ফুলে ওঠে। তারপর সমুদ্রপৃষ্ঠ মিনিট কয়েকের জন্যে নেমে যায়—যেন দারুণ ভাঁটা শুরু হয়েছে। উপকূলের কাছে বেশ খানিকটা জায়গা অনাবৃত হয়ে পড়ে। তারপরেই সুবিশাল জলোচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ে সংহার মূর্তি নিয়ে!

ঘূর্ণি কেন হয়?

ঘূর্ণি বললেই আমাদের অনেকেই মনে করেন এমন একটা ঘূরপাক খাওয়া জলরাশি যার মধ্যে জাহাজ পর্যন্ত গিয়ে পড়লে টানের চোটে তলিয়ে যায়—মানুষ মারা যায়। ঘূর্ণিপাক বিপজ্জনক বহুক্ষেত্রে সন্দেহ নেই, কিন্তু খোলা সমুদ্রে ঘূর্ণিপাকের তলার দিকে কোনো টান থাকে না।

ঘূর্ণি জিনিসটা কি, এবার তা দেখা যাক। ছোট নদীতে ঘূর্ণিপাক অনেকেই দেখে থাকতে পারো। নদীর পাড় যেখানে জলের মধ্যে ঠেলে এগিয়ে গেছে, গোল হয়ে জল ঘুরতে থাকে সেখানে। ঘুরতে ঘুরতে জলটা ঘূরপাকের কিনারার দিকে ঠেলে ওঠে, মাঝের দিকে ধেয়ে যায়—ঠিক ফানেলের মত। এক বালতি জল নিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘোরালে ঠিক এই রকমটি দেখা যায়। এটি হয় কেন্দ্রাতীগ শক্তির জন্যে—যে শক্তি কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ছুটে যেতে চায়।

বড় বড় ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হয় জোয়ারের জল ঠেলে আসার সময়ে সরে যাওয়া ভাঁটার জলে ধাক্কা খেয়ে। দুটো দ্বীপের মাঝখানে সঙ্কীর্ণ জায়গায় বা উপকূলের কাছে এমনটা হামেশাই ঘটে।

সঙ্কীর্ণ অঞ্চলটা যদি খুব গভীর হয়, জোয়ারের জল সেখান দিয়ে যেতে গিয়ে ভাঁটার জলে ধাক্কা খেয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে ক্রমশঃ গভীর কেন্দ্রের দিকে নেমে যেতে থাকে। এই ঘুর্ণিপাক অনেক সময়ে বিপদের সৃষ্টি করে—কিন্তু খোলা সমুদ্রে এদের দেখা যায় না। সেখানে শুধু জল গোল হয়ে ঘোরে, ঘুরপাক খেয়ে নিচের দিকে নেমে যায় না।

পৃথিবীর নানান জায়গায় ঘুর্ণিপাক আছে। তিনটে বিখ্যাত ঘুর্ণিপাকের নাম সবাই জানে। নরওয়ে উপকূলের মেলস্ট্রম, ইটালি আর সিসিলির মাঝের সঙ্কীর্ণ খাড়ির চ্যারিবডিস, আর নায়গারা জলপ্রপাতের তলায় ঘুর্ণিপাক।

গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীম কাকে বলে ?

গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীম হল গিয়ে একটা সমুদ্র স্রোত—সবচেয়ে নাম করা সমুদ্র স্রোত। ডাঙায় যেমন নদী, সমুদ্রে তেমনি এই স্রোত নদীর মতই বয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীতে যে কটা নদী আছে, সব পাশাপাশি রাখলেও গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমের সমান হবে না!

পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল বরাবর উত্তর দিকে এগিয়েছে গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীম, উত্তর আটলান্টিক মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে গিয়েছে, তারপর গেছে উত্তর পশ্চিম ইউরোপের দিকে।

গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমের রঙ পরিষ্কার নীল রঙের—কাপড় কাচার নীল রঙের যে রঙের—সেই রঙের। সমুদ্রের সবুজ বা ধূসর জলের মধ্যে দিয়ে এই টলটলে নীল জল যাওয়ার সময়ে তফাৎটা তাই সহজেই চোখে পড়ে।

নিরক্ষবৃত্তের কাছে আটলান্টিকের জলপৃষ্ঠ গতিশীল হয়ে গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমকে জল দেয়। গতিবেগ থাকে 'পশ্চিম দিকে'। তাই গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীম শুরু হয় দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর দিক দিয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরের দিকে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল বরাবর যাওয়ার সময়ে সত্যিকারের গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীম হয়ে দাঁড়ায় বিপুল এই সমুদ্র স্রোত।

গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমের জন্ম পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলে, তাই এই স্রোতও উষ্ণ জলের স্রোত। ফলে, উষ্ণ জলের বিপুল এই স্রোত পৃথিবীর নানান অঞ্চলের জল-বায়ু পর্যন্ত পাল্‌টে দেয়!

কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। এই স্রোতের ওপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গিয়ে উত্তর ইউরোপে ঢুকে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ড্‌স্‌ আর বেলজিয়ামকে উষ্ণ করে তোলে। তাই, অত উত্তরে থেকেও সেখানকার শীত তেমন জবরদস্ত নয়! এই একই কারণে নরওয়ের

উপকূলের বন্দরগুলো সারা বছর বরফ শূন্য থাকে।

গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমের দৌলতেই লণ্ডন আর প্যারি শহরে শীতের দাপট মৃদু—অথচ দক্ষিণ ল্যাব্রাডরের মতই ভূগোলকের অতখানি উত্তরে রয়েছে দুটি শহরই। দক্ষিণ ল্যাব্রাডরের শীত বড় ভয়ংকর। গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে বাতাস উষ্ণ আর আর্দ্র হয়ে যায়। সেই বাতাস নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয়। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কের বিখ্যাত বিপজ্জনক কুয়াশার সৃষ্টি এই কারণেই।

উত্তর আমেরিকার শীতের জলবায়ুর ওপর গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমের প্রভাব নেই।—যে প্রভাব আছে ইউরোপের জলবায়ুর ওপর। কেননা, ইউরোপের শীতের বায়ু গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে ডাঙার ওপর বয়—উত্তর আমেরিকায় এভাবে সে বাতাস গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমের ওপর দিয়ে আসে না।

রঙের হিসেবে মানুষ ক' শ্রেণীর ছিল ?

পাঁচ শ্রেণীর। এশিয়ায় হলদে, আফ্রিকায় কালো, ইউরোপে সাদা, অস্ট্রেলিয়াতে বাদামী, আর আমেরিকায় তামাটে-হলদে। বৈজ্ঞানিকরা এদের নাম দিয়েছিলেন মঙ্গোলিয়ান (হলদে চামড়া), নিগ্রো (কালো চামড়া), ককেশিয়ান (সাদা চামড়া), অস্ট্রালয়েড (বাদামী চামড়া) আর আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান (তামাটে-লাল)।

ডারউইন কি আবিষ্কার করে বিশ্ববিখ্যাত ?

মানুষ প্রথমে কি করে এল পৃথিবীতে, এই নিয়ে কত রকম কথাই লেখা ছিল দেশ বিদেশের পুরাণে। হিন্দুদের শাস্ত্র অনুযায়ী প্রথম মানুষ ছিলেন মনু। ইনি ব্রহ্মার দেহ হতে উদ্ভূত, তাই তাঁর নাম স্বায়ম্ভুব মনু। এঁর পুত্রকন্যা থেকে মনুষ্য জাতির বিস্তার—তাই ওরা 'মানব'। আবার অন্য ধর্মশাস্ত্রে প্রথম মানুষকে বলা হয় 'আদম'। তাই থেকেই বোধহয় মানুষের আর এক নাম 'আদমী'। খৃস্টানরা বলেন, তাঁদের শাস্ত্রে লেখা আছে, পৃথিবীর ধুলো থেকেই প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন ভগবান—তাই তার বাবা মা ছিল না। 'মনু'-ও তো 'স্বায়ম্ভুব'। সত্যি কোনটা ?

১৮৫৯ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার ধার দিয়েও গেলেন না। 'অরিজিন অফ্‌ স্পিসিস্‌' নামে একটা বইতে তিনি লিখেলেন, মানুষ বা কোনো প্রাণীই ভুঁইফোড় নয়। আজকে তাদের যেভাবে দেখা যাচ্ছে, সেভাবে তারা চিরকাল ছিল না। যুগযুগ ধরে প্রাণী বা উদ্ভিদরা একটু

একটু করে পালটে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যারা চলতে পারে নি, তাদের লোপ পেতে হয়েছে। ১৮৭১ সালে 'ডিসেন্ট অফ ম্যান' নামে আর একখানা বই লিখে তিনি দেখালেন যে লক্ষ লক্ষ বছর আগে আজকালকার মানুষের মত কোনো প্রাণীই ছিল না—একেবারে অন্য ধরনের প্রাণী একটু একটু করে পালটে গিয়ে আজকের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ধরনের প্রাণীদেরই কিছু আবার যুগযুগান্তর ধরে পালটাতে পালটাতে বানর আর বনমানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ মানুষের পূর্বপুরুষ বানর।

জার্মান গবেষক দানিকেন অবশ্য একটা চাঞ্চল্যকর সায়েন্স-ফিকশনের মত তত্ত্ব হাজির করেছেন। মানুষ নাকি অন্য গ্রহের জীব!

মানুষের পূর্বপুরুষ গাছ থেকে কবে মাটিতে নামে?

মানুষের পূর্বপুরুষরা গাছে চড়ে লাফালাফি করত। এক সময়ে একদল গাছেই থেকে গেল—আর একদল মাটিতে হাঁটাচলা আরম্ভ করল। গাছে যারা রইল, তাদের থেকেই এল বানর আর নরবানর (যেমন—গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংউটান ইত্যাদি)। এদের ল্যাজ নেই। এদের আর মানুষদের একসঙ্গে বলা হয় প্রাইমেট্স্ (Primates)। প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে মানুষের পূর্বপুরুষরা প্রথম গাছ থেকে মাটিতে নামে। তখন তাদের দেখতে ছিল গরিলার মত। এদের বলা হয় 'প্রোকনসাল'। এদের থেকেই 'প্রায়-মানুষ' প্রাণীদের সৃষ্টি।

মন্বন্তর মানে কী?

মন্বন্তর শব্দের মানে মনুর রাজ্য শাসন কাল। ১৪টি মন্বন্তরে একটা কল্প হয় এবং এই এক কল্পকাল ব্রহ্মার একটিমাত্র দিন!

এই একটা দিনের মধ্যেই পরের পর ১৪টা মনুর অধিকার কাল ফুরিয়ে যায়। এক এক মনুর অধিকার কাল বা রাজত্বকালকে মন্বন্তর বলে। মনুদের নিজেদের নাম অনুসারে ১৪টি মন্বন্তরের ১৪টি নাম। প্রত্যেক মন্বন্তরের ভগবানের আলাদা আলাদা অবতার, এক-একজন ইন্দ্র, আলাদা আলাদা দেবতা, সপ্তর্ষি, মনু আর মনুপুত্ররা আবির্ভূত হন। এক মন্বন্তর মানে ৪,৩২০,০০০ বছর।

গায়ত্রী কাকে বলে?

বেদের ছন্দোবদ্ধ কবিতা। পৈতে গ্রহণের পর ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন জপ করেন।

দেবতাদের বাহনদের নাম কী?

শিবের বাহন ষাঁড়, দুর্গার বাহন সিংহ, কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর, লক্ষীর পেঁচা, সরস্বতীর হাঁস, নারায়ণের গরুড়, অগ্নির ছাগল, শীতলার গাধা, ষষ্ঠীর বেড়াল, নারদের ঢেঁকি আর ইন্দ্রের ভেড়া এবং ঐরাবত।

পুষ্পক কাকে বলে?

ব্যোমযানকে বলে পুষ্পক। হাঁস মহাবেগে উড়িয়ে নিয়ে যায় এই বিমানকে। পুষ্পক রথ কুবেরের সম্পদ। কুবের উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন ব্রহ্মার কাছে থেকে। লঙ্কার রাক্ষসরাজা রাবণ কুবেরকে যুদ্ধে হারিয়ে পুষ্পক রথ দখল করে। এতে আছে দামী পাথরের পাখী, সোনার সাপ আর প্রাণময় ঘোড়া। পাখীর পাখা একটু সঙ্কুচিত এবং বাঁকানো। এই রথ আরোহীদের ইচ্ছা অনুসারে যে দিকে খুশী যেখানে খুশী চালিত হত। নিশাচর ভূতেরা বয়ে নিয়ে যেত এই রথ। দেবতাদের ইঞ্জিনীয়ার বিশ্বকর্মা বানিয়েছিলেন আশ্চর্য এই রথ।

ব্রহ্মার মুখনির্গত শাস্ত্রের নাম কী?

শ্রুতি, ধর্ম আর ব্রহ্মার মুখ নির্গত ধর্মজ্ঞাপক শাস্ত্রের নাম বেদ। বেদ সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। মোট চারটি বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। ঋগ্বেদই সবচেয়ে প্রাচীন। প্রথমে ঋক্, যজুঃ সাম বেদ বলে প্রসিদ্ধ ছিল। অতি প্রাচীনকালে অথর্ববেদ সংজ্ঞাভুক্ত ছিল না। কিন্তু পরে অথর্ববেদ বেদ সংজ্ঞা পায়।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদমন্ত্রগুলোকে চার ভাগে ভাগ করেন। সেই কারণে এর নাম বেদব্যাস।

অনেকের মতে বেদ ব্রহ্মার নিঃশ্বাস হতে নিঃসৃত। বেদের সূত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষির মনীষায় আবির্ভূত হয়েছিল। এই সব মনীষী মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি নামে খ্যাত। তাঁরা মনের চোখে মন্ত্র দেখতে পেয়ে গান গেয়ে তা প্রকাশ করতেন। ঋষি পরিবারের লোকেরা শুনে শুনে তা মনে রাখতেন

বলে বেদের আর এক নাম 'শ্রুতি'। ঋষিদের কাছ থেকে এই বেদ মৌখিক ভাবে প্রকাশ হয়েছিল বলে সমস্ত বেদকে 'শ্রুতি' বলা হয়।

ঋগ্‌বেদের, দশম মণ্ডলে পরমপুরুষ সম্বন্ধে একটু আভাষ দেওয়া হয়েছে : প্রাকৃতিক ঘটনা যাঁরা ঘটাচ্ছেন—তাঁরাই ছিলেন হিন্দুদের উপাস্য দেবতা। মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, তুফান, বজ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়কে হিন্দুরা পূজনীয় মনে করতেন। তাই প্রত্যেকটা ঘটনার পেছনে এক-একজন দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করে নিয়েছিলেন। বাতাস, আগুন, জল, আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে এক-একজন দেবতা আছেন এবং হিন্দুরা এই সব কল্পিত দেবতাদের পূজা আরাধনার বিবিধ ব্যবস্থাও করেছেন। প্রাকৃতিক শক্তিদের তুষ্ট রাখার জন্যে সবচেয়ে বেশী স্তব লেখা হয়েছে অগ্নি, ইন্দ্র আর সূর্যকে লক্ষ্য করে।

শূওরের পায়ে ক'টা আঙুল ?

কিছু স্তন্যপায়ী পায়ের তলায় ভর দিয়ে হাঁটে—যেমন, ভালুক, ভোঁদড়, বেজি আর শজারু; আবার কুকুর, বেড়াল, এবং অন্যান্য অনেকে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটে। এই দুই শ্রেণীকে যথাক্রমে বলা হয় প্লান্‌টিগ্রেড (ল্যাটিন ভাষায় প্লান্‌টা মানে পায়ের তলা আর গ্র্যাডি মানে হাঁটা), এবং ডিজিটিগ্রেড (ল্যাটিন ভাষায় ডিজিটাস মানে আঙুল)। স্তন্যপায়ীদের একটা বড় দল পায়ের নখের ওপর ভর দিয়ে হাঁটে—এদের মধ্যে আছে ঘোড়া, হরিণ, ষাঁড়, ভেড়া আর শূওর। এদের পায়ের নখ বাড়তে বাড়তে আঙুলের ডগা ঘিরে ধরে—তখন এদের বলা হয় পায়ের খুর। স্তন্যপায়ীদের পায়ে আঙুলের সংখ্যা মোট পাঁচটা। কিন্তু অনেক প্রজাতির আছে আরও কম। শূওর আর হরিণের আছে চারটে,—কিন্তু এরা কাজে লাগায় মাত্র দুটোকে (খণ্ডিত খুর—দু'ভাগে ভাগ করা থাকে খুর)। স্লথের আছে দুই বা তিন; ষাঁড় আর ভেড়ার আছে দুটো, আর ঘোড়ার আছে মোটে একটা।

কোন্ মাছ জলের বাইরে অনেকদিন থাকতে পারে ?

এই শ্রেণীর মাছেদের বলা ফুস্‌ফুস-মাছ (লাঙ-ফিশ) অথবা কাদা-মাছ (মাড-ফিশ)। সাধারণ মাছেরা জলের বাইরে এলে অক্কা পায়। কিন্তু ফুসফুস-মাছ বা কাদা-মাছেরা জলের বাইরে এলেও বেঁচে থাকে বাতাসের

থলির দৌলতে। জলের মধ্যে এরা নিঃশ্বেস নেয় কান্‌কোর সাহায্যে সাধারণ মাছের মত। কিন্তু জলের বাইরে এলেই বাতাসের থলির মধ্যে সোজাসুজি বাতাস টেনে নিয়ে বেঁচে থাকে। ডাঙার প্রাণীদের ফুসফুস যেমন, এদের এই বাতাসের থলিও ঠিক তেমনি ফুসফুসের মত কাজ করতে থাকে।

দুভাবে নিঃশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা এদের মধ্যে না থাকলে দারুণ গ্রীষ্মকালে জলাভূমির জল উড়ে গিয়ে কাদা ভূমি হয়ে যাওয়ার সময়ে এরা কেউ বাঁচত না। মধ্য আফ্রিকার এই শ্রেণীর মাছেদের নাম প্রোটোপটেরাস অ্যানেকটান্স—লম্বায় প্রায় ছ'ফুট; বিষুব অঞ্চলের দক্ষিণ আমেরিকায় এদের নাম লেপিডোসাইরেন পারাডোক্সা—লম্বায় প্রায় চার ফুট। জল যেই শুকোতে আরম্ভ করে, কাদায় ছটফটানি আরম্ভ হলেই এরা কাদার মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একদম তলায় ঢুকে যায়। সুড়ঙ্গের তলদেশে পৌঁছোলেই চালু হয়ে যায় ডবল ফুসফুস—নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় কানকো। বৃষ্টি না আসা পর্যন্ত শুরু হয় কুম্ভকর্ণের ঘুম। এই সময়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে বাতাস পৌঁছোয় ডবল ফুসফুসে—গরমে খাড়াই সুড়ঙ্গ শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায় বলেই বাতাস যাওয়ার পথ খোলা থাকে। বর্ষা নামলেই ঘুম ভাঙে মাছ মহাশয়ের। জল ঠেলে উঠে আসে ওপরে এবং চালু হয়ে যায় কানকোর কাজ—এইভাবেই চলে পরের বিপজ্জনক গ্রীষ্ম না আসা পর্যন্ত।

অস্ট্রেলিয়ার ফুসফুস মাছকে বলা হয় সেরাটোডাস ফর্সটারি ওরফে বারামুণ্ডা। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট এই মাছেরা থাকে বদ্ধ পুকুরে। গ্রীষ্মকালে এরা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমোয় না। কিন্তু জলের ঘাটতি দেখা দিলেই একটা ফুসফুস দিয়ে জলপৃষ্ঠে এসে ঘোঁৎ—ঘোঁৎ শব্দে এমন ভাবে নিঃশ্বেস নিতে থাকে যে দূর থেকে শোনা যায় সেই শব্দ।

এই তিন প্রজাতির মাছকে বলা হয় ডাইপন শ্রেণীর মাছ। ডাইপন মানে যারা দুভাবে নিঃশ্বেস নেয়। এদের পাখনাও আদিম শ্রেণীর। রঙ ঘন ধূসর থেকে কুচকুচে কালো।

নভেল শব্দটা এল কোত্থেকে?

নভেল শব্দটা এসেছে নভেলা শব্দ থেকে। ইটালি ভাষায় নতুন ধরনের (নভেল) গল্পকে বলা হয় নভেলা। নাইট আর লেডীদের নিয়ে রোমান্টিক গল্প নয়—এমন গল্প যা সাধারণ মানুষদের সাধারণ জীবনযাত্রা নিয়ে লেখা। আজকাল যাকে ছোট গল্প বলা হয়, আদি ইটালিয়ান নভেলা ছিল তাই—'নভেল' অর্থাৎ নতুন ধরনের বলতে বোঝাতো গল্পের বিষয় বস্তুকে।

কোন্ পোকাদের চিন্তাশক্তি আছে বলে মনে হয় ?

পিঁপড়েদের। এমন আশ্চর্যভাবে এরা দল বেঁধে থাকে, কলোনী সৃষ্টি করে, বাড়ীঘরদোর তৈরীর পদ্ধতির মধ্যে এমন বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ পায়, খাবার সংগ্রহের মধ্যেও সামঞ্জস্য দেখা যায়, এমন কি নিজেদের মধ্যে লড়াই করার সময়েও যে কায়দাকানুন দেখায়, তা পর্যবেক্ষণ করে অনেকেরই ধারণা পিঁপড়ে নামক এই পোকারা যেন চিন্তা করতে সক্ষম।

প্রায় ৬,০০০ রকমের প্রজাতি আছে বিস্ময়কর এই ক্ষুদে পোকাদের। তার মধ্যে ২৭ রকমের আছে গ্রেট বৃটেনে। ৬০০০ রকমের এই পোকারা সবাই কিন্তু একই শ্রেণীর—যার নাম হাইমেনোপ্‌টেরা (গ্রীক ভাষার এই শব্দের মানে ঝিল্লীওলা ডানা)। মৌমাছি আর বোলতারাও পড়ে এই শ্রেণীর কীটেদের মধ্যে। তবে বোলতা আর মৌমাছিদের প্রত্যেকেরই পাখা থাকে। পিঁপড়েদের সবার থাকে না। যাদের থাকে তারা প্রকৃত পুরুষ এবং নারী। অধিকাংশই কর্মী অথবা সৈন্য; অধঃপতিত মেয়েরাই কর্মী অথবা সৈন্য হয়ে যায়—পাখা কখনোই গজায় না এদের। উইপোকারা অন্যজাতের হলেও এই দিক দিয়ে এই পিঁপড়েদের সঙ্গে তাদের মিল আছে।

একজন স্বাভাবিক পুরুষের দাড়িতে ক'টা চুল আছে ?

একজন স্বাভাবিক পুরুষের দাড়িতে চুল থাকে প্রায় ২৫,০০০ এবং এই ২৫,০০০ চুলের প্রতিটি ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি পায় এক ইঞ্চির একশ ভাগের এক-ভাগ (মোটামুটি হিসেবে)। কাজেই পরিষ্কার ভাবে দাড়ি গোঁফ কামানো মানুষটি প্রতিদিন ২৫০ ইঞ্চি (প্রায় ২১ ফুট) দাড়ি কামিয়ে ফেলে!

দাড়ি রাখা কি আভিজাত্যের ব্যাপার ?

একসময়ে তাই ছিল বই কি! দাড়ির কথা ভাবলেই সাধারণতঃ মনের পর্দায় ভেসে ওঠে পণ্ডিত, প্রফেসর অথবা শিল্পী অথবা ফাদার খৃষ্টমাসের ছবি; ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় এককাল দাড়ি জিনিস-টার বিস্তর গুরুত্ব ছিল এবং তাই নিয়ে অনেক আইন কানুনেরও সৃষ্টি হয়েছিল, এমন দিনও গেছে যখন গালে দাড়ি না থাকলে তাকে নিম্ন স্তরের মানুষ ভাবা হয়েছে, যেমন—তুর্কীরা গোলামদের দাড়ি কামিয়ে দিত সমাজের মানী গুণীদের থেকে তাদের তফাৎ করে রাখার জন্য। সেই

সময়ে কারুর দাড়ি কেটে ফেলার চাইতে ভয়ানক অসম্মান আর ছিল না। অপরাধীর দাড়ি কেটে ফেলে শাস্তি দেওয়া হত এই ভাবে যাতে পাঁচজন সেই দাড়িহীন মুখ দেখেই বুঝত লোকটা নিশ্চয় কোনো পাপ কাজ করেছে—দাড়ি না গজানো পর্যন্ত বেচারীকে মাথা হেঁট করে ঘুরে বেড়াতে হত সমাজে। ভারতবর্ষের শিখ সম্প্রদায়ের দাড়ি কামানোর রীতি নেই। খুব লম্বা হয়ে গেলে দাড়ি গুটিয়ে রাখে চিবুকের তলায়—পিন দিয়ে আটকে রাখে, মাথার লম্বা লম্বা চুল গুটিয়ে ঢেকে রাখে পাগড়ির তলায়।

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটই প্রথম সেনাপতি যিনি সৈন্যদের দাড়ি কামানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে শত্রুপক্ষ দাড়ি খামচে ধরে বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে না পারে।

রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট দাড়ির ওপর কর বসিয়ে ছিলেন। শহরে ঢুকতে গেলেই দাড়িওলাদের কর গুণে দিয়ে ঢুকতে হত। পেরু-তে ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন ইঙ্কারা। এঁরাও দাড়ি রাখার বিরুদ্ধে কঠোর আইন জারি করেছিলেন। পেরুভিয়ান অ্যাণ্ডিজের আদিবাসীরা অবসিডিয়ান নামক এক ধরনের সবুজ পাথর দিয়ে দাড়ি কামাতো। ভাঙা কাঁচের মত ধরধরে ধারালো সেই পাথরে দাড়ি কামাতে গিয়ে গাল নিশ্চয় ছড়ে যেত বেচারাদের। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো ক্ষুর সম্ভবত এই সবুজ পাথর। বয়স কম করেও পাঁচ হাজার বছর। কোনো কোনো মিউজিয়ামে এখনও দেখতে পাওয়া যায় বিশ্বের প্রথম এই ক্ষুরকে। অস্বস্তিকর দাড়ি কামানোর অনান্য পন্থার মধ্যে আছে চিমটে দিয়ে একটা একটা করে দাড়ি উৎপাটন অথবা লাল টকটকে আগুন-গরম লোহার পাত গালের খুব কাছে রেখে দাড়ি পুড়িয়ে খসিয়ে দেওয়া। পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে কষ্টকর এইসব পদ্ধতি চালু আছে আজও।

মিশরের রাণীর কি দাড়ি ছিল?

মজা হচ্ছে যে প্রাচীনতম দাড়ির যে সব ছবি আমরা দেখি, তা আসল নয় মোটেই। সে সময়ে স্নান করার মতই দাড়ি কামানোটাও অত্যাবশ্যক ছিল। মিশরে তাই বিশেষ অনুষ্ঠানে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে অথবা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নকল দাড়ি লাগানো হত গালে। আসল দাড়ির মত দেখতে হত না মোটেই সেইসব নকল দাড়ি। লম্বাটে ফিতের মত অদ্ভুত—কখনো সখনো ধাতু দিয়ে তৈরী। এমন কি রানীও পরতেন নকল দাড়ি—তবে তাঁর দাড়ি তৈরী হত সোনা দিয়ে!

দাড়ি দেখে কোন্ সময়ের মানুষ বলা যায়?

যুগে যুগে জামা-কাপড়ের ফ্যাশনের মত দাড়ি রাখার ফ্যাশনও পালটেছে। যেমন, পোশাক জিনিসটার ওপর যখন কোনো গুরুত্ব ছিল না, যা হয় করে কিছু একটা পরলেই চলত—তখন দাড়িও হত উস্কখুস্ক এবং উদ্দাম, কিন্তু ফোতো বাবুরা যখন পোশাক নিয়ে বড্ড বেশী সময় দিতে লাগল দাড়ির দিকেও নজর দিল সমানভাবে। দাড়িকে কেটে ছেঁটে, পালিশ করে,, পাউডার মাখিয়ে সে এক কাণ্ড করে ছাড়ত! ইতিহাসের বইতে দাড়িওলা পুরুষদের ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, এক-এক সময়ে এক-এক-রকম দাড়ি রাখার রেওয়াজ ছিল। বিষয়টা নিয়ে যারা ভেবেছেন, তাঁরা কিন্তু শুধু দাড়ির চেহারা দেখেই বলে দিতে পারেন কোন সময়ে মানুষটি এমন দাড়ি নিয়ে বিচরণ করেছেন পৃথিবীতে!

দাড়ি রাখার রেওয়াজ আবার ফিরে আসছে পৃথিবীর সর্বত্র। হাক্সলী সাহেব বলেছেন, দাড়ির অ্যাফরোডিসিয়াক প্রপার্টি অর্থাৎ যৌন উত্তেজক ক্ষমতা আছে!

সিংহের দলকে এক কথায় কি বলা হয়?

একই ধরনের জন্তুজানোয়ার পাখীর কোনো দলের বর্ণনা দিতে গেলে আমরা নানা রকম শব্দ ব্যবহার করি। যেমন—এক পাল গরু, এক ঝাঁক পাখী। কখনোই বলি না এক ঝাঁক গরু অথবা এক পাল পাখী! ইংরেজী ভাষাতেও মাছ, পাখী, পশুর দলকে সঠিকভাবে বোঝানোর জন্যে বিশেষ সমষ্টিবাচক বিশেষ্য আছে।

বিশেষ্যগুলো শুনতে অদ্ভুত, কিন্তু ইংরেজী ভাষায় মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসেছে। বিশেষ করে দেশ পাড়াগাঁর মানুষরা এই বিশেষ্যগুলোর সঙ্গে সমধিক পরিচিত।

Swarm of bees (or other insects)
Herd of deer or cattle
Sounder (or herd, or drift) of swine
Mute (or pack) of hounds
Nest of rabbits
Pride of lions
Fall of woodcocks
Flight of doves or swallows

Murmuration (or flock) of starlings
Building (or clamour) of rooks
Covey of Partridges
Bevy of quails
Skulk of foxes
Tribe of goats
Pack of dogs
Troof of monkeys
Drove of bullocks
Mob of sheep (Australia)
Clowder of cats
Kindle of Kittens
Host of sparrows
Game (or herd) of swans
Charm of goldfinches
Congregation (or stand) of plovers
Exaltation of larks
Watch of nightingles
Wisp (or walk) of snipe
Sege (or serge) of herons
Muster of peacocks
Padding (or team) ef ducks
Brood (or pepe) of chickens
Skein (or gaggle) of geese
School of whales, porpoises
Herd (or rookery, or plump) of seals.
Bind of salmon
Swarm of eels.

কোন্ তীরের বিষ থেকে ওষুধ তৈরী হয় ?

অ্যাডভেঞ্চার গল্পে প্রায়ই শোনা যায় দক্ষিণ আমেরিকার জংলীদের গল্প। তাদের তীরের ডগায় কুরারি নামে মারাত্মক বিষ মাখানো থাকে। কিন্তু এবার যা বলা হচ্ছে, তা গল্প নয়—সত্যি। মারাত্মক এই বিষকে যথেষ্ট পরিমাণে পাতলা করে নিয়ে খুব হাল্কা অ্যানেস্থেটিক হিসেবে ব্যবহার করেন ডাক্তাররা।

অ্যানেস্থেটিক হল সেই সব ওষুধ যাদের প্রয়োগে জীবদেহ অসাড় ও অনুভূতি শূন্য হয়। জীবদেহে অ্যানেস্থেসিয়া বা অসাড়তার অবস্থা স্থান বিশেষে সামগ্রিক হতে পারে ; ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে জীবদেহ সমগ্রভাবে

অসাড় অচেতন হয়ে পড়ে ; আবার কোকেন প্রভৃতি ইন্‌জেকসন্ করে দিয়ে দেহের স্থান বিশেষ অনুভূতি শূন্য করা যায়।

পার্শিরা আগে কোন্ দেশে থাকতেন ?

আরবরা ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পারস্য জয় করে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে। সে সময়ে পারস্যের অধিকাংশ লোক জরথুস্ত্র প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। 'জেদাবেস্তা' তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ; উপাস্য দেবতা—আহুর-মাজদা। প্রাকৃতিক শক্তিদের মধ্যে তাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র অগ্নি।

জরথুস্ত্রের অনুগামী বলে জরথুস্ত্রীয় বলা হত তাদের। এদেরই একটা দল ঠিক করলে, স্বধর্ম ত্যাগ করার চেয়ে স্বদেশ ত্যাগ করাই বরং ভাল। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে তারা দেশ ছেড়ে চলে আসতে থাকে। গুজরাটের উপকূলে দিউ নামে একটা জায়গা আছে। সেখানকার রাজা ছিলেন জয়দেব। প্রথম দলটা এই দিউ-তে এসে পৌঁছোলে জয়দেব তাদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পারস্যের মানুষ বলে ভারতবর্ষে এসে তাদের নাম হল পার্শি। আজও তারা পার্শি নামেই পরিচিত—কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে জরথুস্ত্রীয়। গুজরাতের উপকূল থেকে পার্শিদের উপনিবেশ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে এবং এই মহারাষ্ট্রই তাদের বাসস্থান হয়ে দাঁড়ায়। পার্শি-রা ভারতকেই তাদের মাতৃভূমির মত দেখে। শিল্পে, বাণিজ্যে, শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনীতিতে পার্শিদের ভূমিকা সবার আগে। জামসেদজি টাটা, দাদাভাই নৌরজি, ফিরোজ শাহ মেহতা, জেনারেল মানেকশ;—এঁরা সবাই পার্শি।

কোন্ সম্রাটের ব্রোঞ্জমূর্তিতে মুণ্ড পাওয়া যায়নি ?

সম্রাট কণিষ্কের। মথুরায় সম্রাট কণিষ্কের যে মুণ্ডহীন ব্রোঞ্জমূর্তিটি পাওয়া গেছে, সেটি গান্ধার শিল্পের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। কণিষ্কের আমলে গ্রীক ভাস্কর্যের অনুকরণে যে ভাস্কর্য শিল্প প্রবর্তিত হয়, তা গান্ধার শিল্প নামেই পরিচিতি লাভ করেছে। কণিষ্কের মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। সম্ভবত বিয়াল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর ১৬২ খৃষ্টাব্দে প্রজাদের হাতে খুন হন তিনি। কুষাণ সাম্রাজ্যের ভাঙন আর পতন শুরু হয় তখন থেকেই।

প্রসঙ্গতঃ, কনিষ্ক নামে আরও একজন কুষাণবংশীয় নৃপতি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজত্ব করেছিলেন।

আড়াই হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের সবচেয়ে সভ্য জাত ছিল কারা ?

দ্রাবিড়রা। আড়াই হাজার বছর আগে আর্যরা যখন ভারতে ঢোকে, তখন কিন্তু এই দ্রাবিড়রাই ছিল এদেশের সবচেয়ে সভ্য জাত। যুদ্ধবিদ্যা জানত খুব ভাল ভাবে। বেদ এবং অন্যান্য অনেক পুরাণ-গ্রন্থে দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের সুদীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী আছে। আর্যদের আক্রমণে পিছু হটে দ্রাবিড়রা উত্তর ভারত থেকে চলে আসে দক্ষিণ ভারতে—পাকাপাকিভাবে বাস করতে থাকে সেখানেই।

বৈদিক যুগে নানারকম ধাতুর ব্যবহার জানত দ্রাবিড়রা। ধাতুর তৈরী নানারকম বাসনপত্র ব্যবহার করত। চাষবাসের পদ্ধতিও ছিল উন্নত ধরনের। নদীকে ব্যবহার করত যাতায়াতের পথ হিসাবে, মালপত্র বওয়ার কাজে এবং চাষবাসের কাজে। বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল দেশবিদেশে। হাতীর দাঁত, কাঠ, মসলিন প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য রপ্তানি করত বিদেশে। পূজো করত সূর্য, সাপ, গাছ, মাতৃদেবী প্রভৃতিকে। বহু দ্রাবিড় সমাজ ছিল মাতৃ-প্রধান। আজও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতার মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যে ভাবে বজায় আছে এবং উত্তর ভারতের আর্য সভ্যতাকে উপেক্ষা করে চলেছে, তাতে সুপ্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার ভেতরকার শক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। ঋগ্‌বেদে আর্যরা স্থানীয় বাসিন্দাদের 'দস্যু' বলে বর্ণনা করেছে। খুব সম্ভব দ্রাবিড়দেরকেই তারা দস্যু বলতে চেয়েছে—অথচ তারাই এদেশের আদি বাসিন্দা।

ঝর্ণা থেকে জল বেরোয় কেন ?

সব ঝর্ণার জলই কিন্তু কোনো এক সময়ে বৃষ্টির জল হয়ে পড়েছিল আকাশ থেকে। মাটি সেই জলকে শুষে নিয়েছে, পাথরের ফাটলে ঠাঁই দিয়েছে। বৃষ্টির জলের বেশীর ভাগই অবশ্য ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থেকেছে, উঠে গিয়ে বাতাসে মিশেছে, অথবা শেকড়ের মধ্যে দিয়ে গাছপালা সেই জল টেনে নিয়েছে।

বৃষ্টির জলের বাকী অংশ মাধ্যাকর্ষণের টানে নেমে গেছে নিচের দিকে

এবং পাথরের ফাটল যদ্দূর নেমেছে, তদ্দূর নেমেছে এই জল। ভূপৃষ্ঠের নিচে, কিন্তু প্রতি অঞ্চলেই বিভিন্ন গভীরতায় এমন একটা অঞ্চল আছে, যেখানে সব কটা পাথরের খোলা মুখই পুরোপুরি জলে ভরে গিয়েছে। ভূতলের জলময় এই অঞ্চলের নিচের দিকে যদি পাথরের গায়ে ছেঁদা দেখা যায়, জল সেইখান দিয়ে বেরিয়ে যায় ঝর্ণার আকারে। ছেঁদাটা যদি ভূতলের জলময় অঞ্চলের একেবারে নিচের দিকে থাকে, তাহলে ঝর্ণার জল বারোমাস অব্যাহত থাকে, যদি ওপরের দিকে থাকে, তাহলে ভূতলের জলপৃষ্ঠ সেই ছেঁদার নিচে নেমে গেলেই ঝর্ণার জল শুকিয়ে যায়—আবার বর্ষাবাদলায় ভূতলের জলপৃষ্ঠ ছেঁদার ওপরে উঠে এলেই হুড়হুড় করে ঝর্ণার জল নামে।

ভূতলের পাথরের মধ্য দিয়ে এই জল যায় বলে অনেক খনিজ পদার্থ মিশে থাকে ঝর্ণার জলের সঙ্গে—যেমন, গন্ধক, চুন। খনিজ পদার্থ যদি অস্বাভাবিক মাত্রায় থাকে কোনো ঝর্ণার জলে, তখন সেই ঝর্ণাকে বলা হয় 'খনিজ ঝর্ণা'।

কোথাও কোথাও, বিশেষ করে যে সব জায়গায় এক কালে আগ্নেয়গিরি ছিল, ঝর্ণার জল ভূতলের উত্তপ্ত পাথরের সংস্পর্শে থাকে বলে জল হয় গরম। এই ধরনের ঝর্ণাদের বলা হয় 'উষ্ণ' প্রসবণ।

আর্টেজীয় কূপ কিন্তু অন্য জিনিস—তাকে ঠিক ঝর্ণা বলা যায় না। আর্টেজীয় কূপের জল আভ্যন্তরীন চাপে বাইরে বেরিয়ে আসে। বৃষ্টির জল ভূতলে ঢুকে ছিদ্রময় পাথর বা বালির স্তরে ঠাঁই পায়--এই স্তরের ওপরের আর নিচে কিন্তু নিরেট পাথর থাকে। জলের চাপ বাড়তেই থাকে। তারপর ওপর ফুটো করে সেই পর্যন্ত বেরোবার পথ করে দিলেই তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে জল। জল যেখান দিয়ে ভূতলে ঢুকেছে, কূপ খনন করতে হবে তার তলার দিকে।

পাহাড় সৃষ্টি হয়েছিল কিভাবে?

পাহাড় পর্বত এতই বিরাট জিনিস যে মানুষের ধারণা তারা বুঝি কখনো পালটায় না এবং চিরকালই একভাবে থাকবে, কিন্তু ভূতাত্ত্বিকরা এবং সেই সব বিজ্ঞানীরা যারা পাহাড় পর্বত নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন, তাঁরা প্রমাণ করে দিতে পারেন যে পাহাড়ও পালটায়—চিরস্থায়ী তারাও নয়।

ভূস্তরের পরিবর্তনের ফলেই পাহাড় পর্বত তৈরী হয়েছে এবং বিরামবিহীন এইসব পাহাড় ধ্বংস হচ্ছে, পালটেও যাচ্ছে। জল জমে বরফ হয়ে গেলেই পাহাড়ের গা থেকে বড় বড় চাঁই খসে গড়িয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টির জলে

আর ঝর্ণার জলে মাটি আর পাথরের টুকরো ধুয়ে নেমে যাচ্ছে। অনেক···অনেক দিন পরে উচ্চতম পর্বত পর্যন্ত টিলা বা সমতলভূমিতে পরিণত হচ্ছে।

পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে যেভাবে, তার ভিত্তিতে ভূবিজ্ঞানীরা পাহাড়পর্বতকে চারভাগে ভাগ করেছেন। সব পাহাড়ই কিন্তু ভূস্তরের প্রবল আক্ষেপের ফলেই, পরিবর্তনের ফলেই গড়ে উঠেছে, এই বিপুল এবং ভয়ানক পরিবর্তনের বেশীর ভাগই ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে।

পাথুরে স্তর থেকে ভাঁজওলা পাহাড়ের সৃষ্টি। দারুণ চাপে বিরাট বিরাট ভাঁজ খেয়েছে পাথুরে স্তর। এই ধরনের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, ভূস্তরের চাপে আর ঠেলায় পাথুরে স্তর কখনো বেঁকে খিলেনের আকার নিয়েছে, কখনো খাদের মত নিচে নেমে গিয়েছে। ভাঁজওয়ালা পাহাড়ের উত্তম নিদর্শন হল ইউরোপের আল্পস আর আপ্পালাচিয়ান পর্বত।

গম্বুজ পাহাড় তৈরী হয়েছে পাথুরে স্তর চাপের চোটে ফোস্কার মত ফুলে উঠে গম্বুজের আকার নেওয়ায়। অনেক ক্ষেত্রে গলিত লাভা ভূস্তরের তলদেশ থেকে প্রচণ্ড চাপে ঠিকরে এসে পাথুরে স্তরকে ফুলিয়ে গম্বুজ বানিয়ে দিয়েছে। গম্বুজ পর্বতের ভালো উদাহরণ হল দক্ষিণ ডাকোটার ব্ল্যাক হিল্‌স্।

চাঁই পাহাড় গড়ে ওঠে ভূস্তরের ফাটল বা ভাঙন থেকে। কোনো এক সময়ে ভূস্তরের বিরাট একটা অংশ, একটা বিরাট পাথরের 'চাঁই', ঠেলে উঠে এসেছিল আকাশের দিকে। ক্যালিফোরনিয়ার সিয়েরা নেভাদা রেঞ্জ এই ধরনের চাঁই পাহাড় বা ব্লক মাউন্‌টেন। একখানা মাত্র চাঁই—লম্বায় ৪০০ মাইল আর চওড়ায় ৮০ মাইল।

আগ্নেয়-পাহাড় গড়ে ওঠে ভূগর্ভ থেকে ঠেলে-ওঠা অঙ্গার, ছাই আর লাভা জমে জমে। সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির চেহারাটা হয় শঙ্কুর মত—চূড়ায় থাকে একটা বড় ফুটো বা জ্বালামুখ। বিখ্যাত আগ্নেয়-পাহাড় হিসেবে নাম করা যায় এই ক'টাকে : মাউন্টস্ রেনিয়ার, শাস্তা হুড, যুক্তরাষ্ট্র ; ফুজিয়ামা, জাপান ; ভিসুভিয়াস, ইটালি।

ওপরে যে ক'ধরনের পাহাড় সৃষ্টির পন্থা দেখানো হল, অনেক পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে এই সব কটা পন্থা মিলিয়ে। যেমন রকিজ পাহাড় গড়ে উঠেছে, ভাঁজ খাওয়া, ভাঙন ধরা, গম্বুজ হওয়া, এমন কি লাভা জমা থেকে।

পাথর এত রকমের কেন ?

পৃথিবীর সব ছেলেই কোনো না কোনো সময়ে অদ্ভুত পাথর কুড়িয়ে পকেট বোঝাই করেছে। পাথর কুড়োনো এবং জমিয়ে রাখার বাতিক অনেক বড়দের মধ্যেও আছে। কোনো পাথর মসৃণ, কোনোটা খড়খড়ে, এক-একটার আকার আর আয়তন এক-এক রকমের, রঙও তাদের হরেকরকমের, কাউকে কাউকে দেখে মনে হয় দামী রত্ন বুঝি—তাই বিচিত্র পাথর দেখলেই না কুড়িয়ে পারা যায় না।

পাথরদের এই চিত্ত-চাঞ্চল্যকর চেহারার প্রধান কারণেই হচ্ছে অনেক রকমের খনিজ পদার্থ সেই পাথরের মধ্যে থাকে বলে। ভেতরকার এই খনিজ বস্তুটার জন্যেই প্রায়ই পাথরদের এইভাবে বিচিত্র রঙীন হতে হয়, অথবা চিক-মিক করতে থাকে মণিমাণিক্যের মত।

সব পাথর কিন্তু একইভাবে তৈরি হয় না, এক রকম পাথরকে বলা হয় সেডিমেন্টারি রক (পাললিক শিলা), পলি থেকে এদের সৃষ্টি। এর মানে এই যে অনেক…অনেক বছর আগে জল, বাতাস, বরফ বা উদ্ভিদ অথবা প্রাণীদের দ্বারা বস্তুসমূহ মাটিতে রাখা হয়েছিল। স্তরে স্তরে তাদের রাখা হয়েছিল বলে তাদের নাম স্ট্র্যাটিফায়েড বা স্তরীভূত শিলা (স্ট্র্যাটা মানে স্তর)। এই ধরনের পাথরের পুঁচকে পুঁচকে কণাগুলো হয় সাধারণতঃ গোলাকার, হাওয়ায় উড়তে উড়তে, ঢেউয়ের ধাক্কায়, নদীতল দিয়ে গড়িয়ে যেতে যেতে খোঁচাগুলো এক সময়ে মসৃণ হয়ে যায়। বালি পাথর আর চুনা-পাথর পাললিক শিলার উত্তম নিদর্শন।

অন্যান্য পাথররা এক সময়ে পৃথিবীর গভীর অঞ্চলে গলিত ধাতু অবস্থায় ছিল। ভেতর থেকে ঠেলা খেয়ে এইসব পাথর উঠে এসেছে ভূস্তরে অথবা জমে গিয়েছে অন্যান্য পাথরের খাঁজে খাঁজে এই পাথরকে বলে ইগ্‌নিয়াস্ রক বা আগ্নেয়শিলা। যেমন, গ্র্যানাইট আর ব্যাসাল্ট।

তৃতীয় শ্রেণীর পাথররা এক সময়ে অন্য পাথরই ছিল (পাললিক বা আগ্নেয়), কিন্তু উত্তাপ আর চাপের ফলে বর্তমান চেহারা নিয়েছে। এদেরকে বলা হয় মেটামরফিক রক বা রূপান্তরিত শিলা। যেমন, মার্বেল আর স্ফটিক মণি (কোয়ার্ট্‌জাইট)।

কিছু পাথরে অন্যান্য পাথুরে বস্তুর সঙ্গে বিভিন্ন ধাতু-বাহী খনিজ পদার্থ মিশে থাকে। ধাতু যদি এমন বেশী পরিমাণে থাকে যে তাকে আলাদা করে করে নেওয়া সম্ভব, তখন সেই পাথরকে বলা হয় 'ওর' অর্থাৎ যে খনিজ পদার্থ থেকে ধাতু পাওয়া যায়।

গুহা সৃষ্টি হয় কি করে ?

মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে গুহা সৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক পন্থায়। প্রাচীন প্রস্তর যুগে যে সব মানুষদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই থাকত না, গুহায় বাস করত তারা দারুণ শীতের সময়ে।

কিন্তু তার অনেকদিন পর মানুষ যখন গুহাকে বাড়ী হিসেবে ব্যবহার করা ত্যাগ করল, তখন থেকেই গুহা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ধারণা এল প্রাচীন মানুষদের মাথায়। গ্রীকরা ভাবত গুহা হল গিয়ে তাদের দেবতাদের মন্দির। জিয়াস, প্যান, ডায়োনিসাস আর প্লুটো ছিল তাদের সেই দেবতা, রোমানদের ধারণা ছিল গুহাতে থাকে পরী, বনদেবী আর ডাইনিরা। প্রাচীন পারশ্য বাসীরা এবং অন্যান্য অনেক জাতি ভাবত গুহার সঙ্গে পৃথিবীর আত্মার সর্দার মিথ্রাস-এর পূজোর সম্পর্ক আছে।

আজকাল কিন্তু সারা পৃথিবীর বিশাল এবং সুন্দর গুহাগুলো টুরিস্টদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড় বা টিলার গায়ে গভীর শূন্যগর্ভ জায়গাকেই বলে গুহা। বড় গুহাকে বলে ক্যাভার্ন্ বা বৃহৎ অন্ধকার গুহা।

গুহার সৃষ্টি অনেক কারণে। পাথরের গায়ে অবিরাম সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ায় তৈরি হয়েছে অনেক গুহা। কিছু গুহাকে দেখা যায় ভূস্তরের নিচে। ফল্গু নদী বা ভূগর্ভস্থ নদী চুনাপাথরের মত নরম শিলার স্তর বইয়ে একদা বয়ে গিয়েছিল বলেই সৃষ্টি এই ধরনের গুহাদের। অন্যান্য গুহারা জন্ম নিয়েছে আগ্নেয় উৎপাতে ভূস্তরের পাথর সরে যাওয়ার ফলে, অথবা উত্তপ্ত লাভার অগ্ন্যুৎপাতে।

চুনাপাথরের পুরু স্তর ক্ষয়ে যাওয়ার ফলেই বেশীর ভাগ গুহা জন্ম নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। কার্বন-ডায়-অক্সাইড সমন্বিত জলের ক্রিয়ার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ইনডিয়ানা, কেনটাকি আর টেনেসিতে চুনাপাথরের বিপুল স্তর আছে—গড়ে ১৭৫ ফুট পুরু এই সব স্তর। কাজেই এই ধরনের গুহা সে জায়গায় বিস্তর দেখা যায়।

কিছু গুহার ছাদে 'সিঙ্ক হোল্' নামে ফুটো থাকে, জল সেখানে প্রথমে সঞ্চিত হয়ে পরে চুঁয়ে পড়েছিল বলেই এই গর্তের সৃষ্টি। কিছু গুহার মধ্যে সুড়ঙ্গপথ থাকে সারি সারি বা স্তরে স্তরে সাজানো অবস্থায় একটার ওপর থাকে আর একটা। ভূগর্ভের স্রোতস্বিনী এই সব গুহার মধ্যে দিয়ে বইতে থাকে। যদিও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা গুহা তৈরী হয়ে যাওয়ার পর, যে নদী প্রবাহের ফলে গুহাটির জন্ম, তা তলাকার স্তরে গিয়ে

পৌঁছোয় এবং ওপরকার গুহাকে শুকনো খট খটে অবস্থায় ফেলে যায়।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় গুহার ছাদ থেকে টপ টপ করে পড়া জলের মধ্যে চুন বা অন্যান্য খনিজ পদার্থ রয়েছে। জলের খানিকটা উবে গেলে পড়ে থাকে এই পদার্থটা। আস্তে আস্তে তা স্ট্যালাকটাইটের চেহারা নেয়—সম্বাটে কোণাকৃতি তুষার-কণার মত ঝুলতে থাকে ছাদ থেকে। বড় সুন্দর সেই দৃশ্য। স্ট্যালাকটাইট থেকে জল চুঁয়ে পড়ে মেঝের ওপর যে স্তম্ভ গড়ে তোলে তার নাম আবার স্ট্যালাগ্‌মাইট।

জীবাশ্ম কাকে বলে ?

মানুষের অতীত সম্বন্ধে এবং যেসব জীবজন্তুরা লক্ষ লক্ষ বছর আগে বিচরণ করে গেছে এই পৃথিবীতে—তাদের সম্বন্ধে জানবার জন্যে জীবাশ্ম গবেষণা এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে বিষয়টা একটা আলাদা বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে ; এ বিজ্ঞানের নাম প্যালিওন্টোলজি। প্যালিও মানে প্রাচীন বা পুরাতন। এককথায় প্যালিওন্টোলজি মানে পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব ও বংশধারা নির্ণয় সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

অনেকের ধারণা যুগ যুগ আগে মাটির তলায় সমাধিস্থ দেহাবশেষই ফসিল বা জীবাশ্ম। ধারণাটা ভুল। প্রকৃত পক্ষে, ফসিল বা জীবাশ্ম তিনরকমের। প্রত্যেকটা আর একটা থেকে আলাদা। প্রথমটা জীবদেহের আসল দেহ ; যে দেহের ক্ষয় হয়নি এবং সংরক্ষিত থেকেছে। আসল দেহ যেমনটি ছিল—জীবাশ্ম দেখে মনে হয় অবিকল সেই রকমই। কিন্তু এ ছাড়াও দেহের আকারের ছাঁচ-ও জীবাশ্ম হয়ে যেতে পারে ; জীব বা উদ্ভিদের দেহ ছাঁচের মধ্যে থেকে সরে গেলেও ছাঁচ-রূপ জীবাশ্ম থেকে যায়। এর পরেও একরকমের জীবাশ্ম দেখা যায়—এ জীবাশ্ম জীবদের পায়ের ছাপ। নরম মাটি বা কাদার ওপর দিয়ে দেহটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছাপ।

জীবদেহের কিছু অংশ যখন কোনো জীবাশ্মের মধ্যে থেকে যায়, তখন সাধারণতঃ সেই অংশ হয় জীবাশ্মের কঠিন দেহাংশ—যেমন শক্ত খোলা বা কংকাল। শক্ত অংশটুকু সংরক্ষিত হয়—নরম অংশটুকু ক্ষয় হতে হতে লোপ পায়। তা সত্ত্বেও দেখা গেছে জেলী মাছের মত কোমল-দেহী জীবদের (যাদের দেহের শতকরা নিরানব্বই ভাগই জল) পাথরের মধ্যে নিজেদের নিখুঁত জীবাশ্ম রেখে গিয়েছে! আরও দেখা গেছে, বরফের মধ্যে আটক থাকা কিছু জীবাশ্মের মধ্যে শুধু যে কংকালই সংরক্ষিত থেকেছে তা নয়—হাড়ের ওপর চামড়া আর মাংস পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে।

আয়তনের সঙ্গে জীবাশ্মের কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ, লক্ষ লক্ষ বছর আগে বিচরণশীল ক্ষুদে পিঁপড়েদের জীবাশ্ম নিখুঁত ভাবে সংরক্ষিত থাকতে দেখা গেছে তৈলস্ফটিকের মধ্যে। জীবটি কোথায় বাস করত, তার ওপরেই খুব বেশী নির্ভর করত তার জীবাশ্ম হয়ে থাকার সম্ভাবনা। জীবাশ্মদের মধ্যে সবচেয়ে অগণিত হল জলজ প্রাণী ; কেননা এরা মারা গেলেই তাড়াতাড়ি কাদা চাপা পড়ে যায়—ক্ষয়প্রাপ্ত ও ধ্বংস হওয়ার সুযোগ পায় না। ডাঙার জীব আর উদ্ভিদের ক্ষয়ক্রিয়া চালায় বাতাস আর আবহাওয়া—ধ্বংস করে ফেলে অল্প সময়ের মধ্যেই।

মূলতঃ জীবাশ্ম গবেষণা করেই আমরা জেনেছি লক্ষ কোটি বছর আগে পৃথিবীর জীবজগৎ সম্বন্ধে নানান খবরাখবর। উদাহরণ স্বরূপ, কিছু পাথর থেকে সংগৃহীত জীবাশ্ম দেখে আমরা জেনেছি লক্ষ লক্ষ বছর আগে সরীসৃপ যুগ ছিল এই পৃথিবীতে—আশি ফুট লম্বা আর চল্লিশ টন ওজন ছিল সেই দানব প্রাণীদের। এদের বলা হয় ডাইনোসর। আদিমতম পক্ষী 'আর্কেঅপটেরিক্স' সম্বন্ধেও আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের ভিত্তি মোটে দুটি জীবাশ্ম—আজ পর্যন্ত এই দুটি ফসিলের বেশী আর পাওয়া যায় নি!

বরফ যুগ শেষ হল কখন ?

বেশীর ভাগ মানুষেরই ধারণা বরফ যুগ এমনই একটা জিনিস যা এত আগে ঘটেছে যে চিহ্ন পর্যন্ত আর পড়ে নাই। কিন্তু তুমি কি জানো, ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন বরফ যুগের শেষে আমরা এই সবে পৌঁছোচ্ছি! গ্রীনল্যাণ্ডের মানুষদের কাছে বরফ যুগ কিন্তু এখনো টিঁকে আছে—বরফ যুগের মধ্যেই তারা রয়েছে।

প্রায় পঁচিশ হাজার বছর আগে উত্তর আমেরিকার মাঝামাঝি অঞ্চলে মানুষ থাকলে দেখত সারা বছর ব্যাপী তুষার আর বরফ প্রাচীর বিস্তৃত ছিল এক উপকূল থেকে আরেক উপকূল পর্যন্ত—সীমাহীন ভাবে বরফ এগিয়ে গিয়েছিল উত্তর দিকে। সর্বশেষ বরফ যুগ বলতে বোঝাই এই যুগটাকেই যখন পুরো কানাডা, যুক্তরাস্ট্রের বেশীর ভাগ, ইউরোপের অধিকাংশ উত্তর পশ্চিমাংশ কয়েক হাজার ফুট পুরু বরফে ঢেকে গিয়েছিল।

এর মানে এই নয় যে জায়গাটা বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডা ছিল বারো মাসই। এখন উত্তর যুক্তরাষ্টে যে তাপমাত্রা তার চাইতে মাত্র দশ ডিগ্রী কম ছিল তখনকার হিমযুগের তাপমাত্রা। হিমযুগ হওয়ার কারণ গরমকালে গরম না পড়া। গরমকালে ঠাণ্ডা পড়ায় শীতকালের, বরফ আর তুষার গলে যেতে পারত না। জমাই হত। ওপর ওপর জমতে জমতে পুরো উত্তর অঞ্চলটা ঢেকে দিত।

হিমযুগ প্রকৃত পক্ষে কিন্তু চার ভাগে বিভক্ত, এক-এক ভাগ বরফ জমা হয়, এগিয়ে যায়, তারপর বরফগলার পর্ব একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকে উত্তর মেরুর দিকে। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস এই কাণ্ড ঘটে চারবার। শীতল সময়-ভাগকে বলা হয় 'গ্লেসিয়েশন' এবং উষ্ণ সময়-ভাগকে বলা হয় 'ইন্টারগ্লেসিয়াল' পিরিয়ড।

বৈজ্ঞানিকদের আরো বিশ্বাস, উত্তর আমেরিকায় প্রথম বরফ যুগ এসেছিল প্রায় বিশ লক্ষ বছর আগে; দ্বিতীয়টা এসেছিল সাড়ে বারো লক্ষ বছর আগে; তৃতীয়টা পাঁচ লক্ষ বছর আগে; এবং সর্বশেষটা এক লক্ষ বছর আগে।

সর্বশেষ হিমযুগ সমান হারে সব জায়গায় গলে যায়নি। উদাহরণ স্বরূপ, এখন যে জায়গাটার নাম উইস্‌কন্‌সিন, বরফ গলতে শুরু করে সেখানে চল্লিশ হাজার বছর আগে। কিন্তু নিউইংল্যাণ্ডকে যে বরফ ঢেকে রেখেছিল সেটা গলেছে প্রায় আটাশ হাজার বছর আগে। এখন যে জায়গার নাম মিনেসোটা, প্রায় পনের হাজার বছর আগেও বরফ বিরাজ করত সেখানে।

ইউরোপে, সতেরো হাজার বছর আগে বরফের তলা থেকে বেরিয়ে আসে জার্মানী এবং তেরো হাজার বছর আগে পর্যন্তও বরফে ঢাকা ছিল সুইডেন!

সাপ কি খায়?

'নিরামিষাশী' সাপ এ পৃথিবীর কোথাও নেই। প্রত্যেকেই মাংসাশী এবং কোনো না কোনো রকমের জন্তু দিয়ে উদরপূজা করে।

সাপেদের পাচক-রস বড় কড়া—অতিশয় শক্তিশালী; তার দরকারও আছে। কেমনা, সাপেরা যা খায়, তা আস্ত গিলে খায়। দাঁত নেই যে খাবারকে কেটেকুটে টুকরো করে নেবে—যা করে বেড়ালরা এবং অন্যান্য অনেক দাঁতালো প্রাণীরা। কচ্ছপ আর পাখীদের আছে ধারালো চঞ্চু। কিন্তু সাপেদের আছে কেবল ছুঁচের মত দাঁত যা দিয়ে শিকারকে পাকড়াও করে মুখগহ্বরে ঠেলে দিতেই কেবল পারে। চিবোতে পারে না।

সাপেদের চোয়ালের গড়ন অসাধারণ রকমের—সেই কারণেই সাপেদের খাওয়ার ধরনটা অসাধারণ এবং সাপেরাও অসাধারণ। করোটির অন্যান্য হাড়ের সঙ্গে চোয়াল দুটো অত্যন্ত আলগা ভাবে লাগানো থাকে। চোয়ালের কিনারায় আছে সারি সারি দাঁত এবং অধিকাংশ সাপের মুখবিবরের ছাদেও থাকে দুসারি দাঁত। এই সব দাঁতই যে-সব হাড়ের ওপর বসানো, তাদেরকে নড়ায় বিশেষ ধরনের পেশী।

সাপের খাওয়ার ধরনটা এই রকম : একটা চোয়ালের দাঁত খাবারের ওপর চেপে বসে, আরেকটা চোয়ালের হাড় খাবারের ওপর দিয়ে এগিয়ে যায়। তারপরেই এগিয়ে যাওয়া চোয়ালের দাঁত খাবারের ওপর চেপে বসে —অন্য চোয়ালটা তখন খাবারের ওপর দিয়ে এগিয়ে যায়। এইভাবে একটু একটু করে টানের চোটে নেমে যেতে থাকে সাপের গলা দিয়ে।

চোয়ালদের এই বিচিত্র গঠনের জন্যে আশ্চর্য রকমের বড় জন্তুদের খেতে পারে সাপেরা। উদাহরণ স্বরূপ, কখনো-সখনো চিতাবাঘ আর হরিণকে পর্যন্ত খেয়ে ফেলে ময়াল বা পাইথন সাপ! ছোট সাপেরা অবশ্য ছোট জন্তু খায়। বেশীর ভাগ সাপই খায় মাঝারি আয়তনের জীব : গঙ্গাফড়িং, ব্যাঙ, মাছ, ইঁদুর এবং পাখী। কিছু ক্ষুদে অন্ধ সাপ খায় শুধু উইপোকা। এমন সাপও আছে যারা অন্য সাপকে গিলে খায়।

খাওয়া নিয়ে বাছ-বিচার রাখার চেষ্টা করে সাপেরাও। সবুজ সাপ মাকড়শা, মাছ, পাখী, শুঁয়োপোকা খেলেও খেতে পারে, কিন্তু টিকটিকি ইঁদুর কখনোই গিলবে না। জলের সাপ কেবল ব্যাঙ আর মাছই খাবে, পোকা বা ইঁদুর গিলবে না। ফিতের মত গার্টার সাপেরা অবশ্য যেন অনেক রকমের জন্তুকেই আহার করতে পারে—এদের খাবারের তালিকায় কেঁচো, কৃমি, মাছ, ব্যাঙ ছুঁচো, ইঁদুর, পাখীরাও থাকে।

পিঁপড়েদের গন্ধ অনুভূতি থাকে ?

পিঁপড়েরা বড় বিচিত্র কীট। এত বিচিত্র যে এদের সম্বন্ধে সব কথা লিখতে গেলে এইটুকু জায়গায় কুলোবে না। অদ্ভুত সেই কাহিনী তোমরা বড় হয়ে পড়বে। পিঁপড়ে পুরাণের দু-চারটে ঘটনা শুধু এখানে বলা যাক।

পিঁপড়েদের তুমি পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় পাবে—শুধু উচ্চতম পর্বতদের চূড়ায় ছাড়া! মরু ভূমির বালিতে, ঘাস ছাওয়া বিশাল মাঠে, সমুদ্রের তীরে, পাহাড়ের গায়ে, জঙ্গলে, বাড়ীতে সব রকমের আবহাওয়াও সইতে পারে পিঁপড়েরা।

কয়েকহাজার প্রজাতির কিন্তু পিঁপড়ে আছে এই পৃথিবীতে, প্রত্যেকেই কিন্তু মৌমাছি আর বোলতার সঙ্গে সম্পর্কিত। তার মানে একই শ্রেণীর পোকাদের পর্যায়ে পড়ে এরা সবাই। সব পিঁপড়েই কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব। মানে কলোনীর মধ্যে দল বেঁধে থাকে। প্রত্যেক কলোনীতে থাকে তিন শ্রেণীর পিঁপড়ে, পুরুষ, স্ত্রী, অথবা রানী আর কর্মী।

অধিকাংশ প্রজাতির পুরুষ আর স্ত্রী পিঁপড়ের ডানা থাকে। থাকে না

কেবল কর্মীদের। সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যে পুরুষ পিঁপড়ের সঙ্গে এক চক্কর উড়ে আসার পর স্ত্রী পিঁপড়ের ডানা খসে যায়। পিঁপড়েদের কলোনীর আয়তন হরেকরকম হয়। কোনো কলোনীতে থাকে মোটে কয়েক ডজন পিঁপড়ে, কোনোটায় থাকে হাজারে হাজারে লাখে লাখে—সদাব্যস্ত প্রত্যেকেই!

পিঁপড়েদের আয়তন রকমারি হলেও দেখতে মোটামুটি সবাইকেই একরকম। এক জোড়া লম্বা শুঁয়ো, বা অ্যান্টেনা, দুলতে থাকে মাথার ওপরে। শুঁয়ো দুটো নড়েই চলেছে, এরা শুধু স্পর্শ অনুভূতির শুঁয়োই নয়—গন্ধ অনুভূতি শুঁয়োও বটে। সেই কারণেই পিঁপড়ের 'নাক' নেই বটে গন্ধ শোঁকার জন্যে, কিন্তু গন্ধ অনুভূতি আছে। এই শুঁয়োর সাহায্যেই এক পিঁপড়ে থেকে আরেক পিঁপড়ের তফাৎ ধরতে পারে শুঁয়োর মালিক এবং পরস্পরের মধ্যে মত বা ভাবের আদান প্রদানও চালায় শুঁয়োর সাহায্যে।

পিঁপড়ের মাথায় শুঁয়ো ছাড়াও থাকে তার মস্তিষ্ক, একজোড়া পুঞ্জচক্ষু, শক্তিশালী একজোড়া চোয়াল আর মুখ। পুঞ্জচক্ষু ছাড়াও দেখবার জন্যে পিঁপড়েদের আরও একজোড়া চক্ষুযন্ত্র থাকে—সরল চক্ষু বা stemata বলা হয় এই চোখকে।

পিঁপড়েদের জীবন চক্র চাঞ্চল্যকর। কলোনীর মেয়েরা শূন্যে অনেক উঁচুতে উড়ে যায়—পেছনে পেছনে যায় ছেলেরা। সন্তান জন্মের জন্য আকাশে ওড়ার পর্ব সাঙ্গ হলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পায় ছেলেরা, মেয়েরা বা রানীরা একা-একা এক-একটা নতুন কলোনী গড়ে তোলে। বাসা খুঁড়ে নিয়ে এক গাদা ডিম পাড়ে, ডিমগুলোর তা দেওয়ার পর তা থেকে পা-হীন ছানা বেরোয়। রাণী পিঁপড়ে সাহায্য করে প্রত্যেকটার চারদিকে গুটি জড়িয়ে নিতে। ক্ষুদে পিঁপড়ে আর একটু বড় হলে গুটির এক প্রান্ত কাটিয়ে নেয় রাণী পিঁপড়ে এবং খোলার মধ্যে থেকে টেনে বার করে ক্ষুদে বাচ্চাকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সবে জন্ম নেওয়া কর্মী পিঁপড়ে কাজ আরম্ভ করে দেয় মা এবং কলোনীর অন্যান্যদের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে।

সাপ বিষ পায় কোত্থেকে ?

বৈজ্ঞানিকদের ধারণা প্রায়ঃ দু হাজার চারশ রকমের সাপ আছে এখন পৃথিবীতে। এদের মধ্যে বিষধর বলা যায় শতকরা ৮ ভাগকে—যাদের ছোবলে শিকার অবশ হয় অথবা অক্কা পায়। বিষধরদের মধ্যে অনেকেরই বিষ মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হওয়ার মত মারাত্মক বা যথেষ্ট নয়।

সব সাপের মুখেই স্যালাইভা বা মুখের লালা থাকে প্রচুর পরিমাণে — শিকারকে গিলতে সুবিধে হয় বলে এবং হজম করার কাজে সাহায্য করার জন্যে। বিষধর সাপদের ক্ষেত্রে মুখের লালানিস্রাবী একটা গ্রন্থিতে যে বস্তুটির উৎপাদন ঘটে, তা সাপের শিকারের পক্ষে বিষাক্ত। এই বস্তুটিকেই বলা হয় সাপের বিষ।

হাতীকে মেরে ফেলার মতও মারাত্মক বিষ থাকে কোনো কোনো সাপের। আবার কারও বিষ এত মৃদু যে শুধু টিকটিকি মারতেই সক্ষম। মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক বিষধর সাপের সংখ্যা সম্ভবতঃ দুশ রকমের।

বিষধর সাপের প্রজাতিদের আজ পর্যন্ত যে সব খবর জানা গেছে, তার ভিত্তিতে বলা যায়, কোবরা আর তার আত্মীয়স্বজন একটা শ্রেণী ভুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ছে ভাইপার। এ ছাড়াও কলুব্রিড (colubrid) নামক সবচেয়ে বৃহৎ শ্রেণীর সাপেদের মধ্যেও কয়েক ধরনের সাপ বিষধর হয়।

কোবরা (কেউটে, গোখরো) আর তার আত্মীয়স্বজনদের মুখে বড় বিষ-দাঁত থাকে—ওপর চোয়ালের দুপাশে দুটো। বিষদাঁতে খাল কাটা থাকে। অধিকাংশ কোবরার বিষদাঁতের খাল ঢাকা থাকে বলে ভেতরে ফাঁপা নল তৈরী হয়ে যায়। বিষগ্রন্থি ঘিরে থাকে একটা পেশী। সাপ কামড় বসালেই গ্রন্থির ওপর চেপে বসে এই পেশী। চাপ পেয়ে হু-উ-উ-স করে বিষ নেমে আসে বিষদাঁতের মধ্যে দিয়ে এবং ডগার ফুটো দিয়ে ঢুকে যায় সরাসরি শিকারের দেহে।

এক ধরনের থুথু-ছিটিয়ে কোবরা আছে যারা বিষদাঁতের মধ্যে দিয়ে বিষ স্প্রে করে দিতে পারে। যাকে দেখে ভয় পেয়েছে, এমনি কোনো জানোয়ারের (যেমন হরিণ বা মোষ) চোখের দিক তাগ করে বিষ ছুঁড়ে দেয় কোবরা! বিষ ছুটে যায় আট ফুট পর্যন্ত—জানোয়ার বেচারা অন্ধ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

সাধারণতঃ, কোবরার বিষে শিকারের স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং তার চলৎশক্তি থাকে না। শ্বাসপ্রশ্বাস আর হৃদ্‌ঘাত নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুকেন্দ্রে বিষ পৌঁছোলে ছোবল খাওয়া জীবকে অক্কা পেতে হয়।

ভাইপারদের বিষদাঁত খুব লম্বা হয়। এদের বিষ প্রধানতঃ শিকারের রক্তবাহ আর রক্তকোষকে আক্রমণ করে। খুব ফুলে উঠতে পারে এবং ভীষণ রক্তপাত ঘটতে পারে।

সরীসৃপ বলতে কি শুধু সাপ বোঝায় ?

রহস্যময় ভঙ্গিমায় পা-হীন একটা সাপ ঘাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে এঁকে বেঁকে। চার পায়ের ওপর ভর দিয়ে বদখৎ ভাবে হেঁটে চলেছে একটা বৃহৎ কচ্ছপ—কাদায় যার নিবাস এবং যার পিঠ আর পেট হাড়ের খোলায় মোড়া। এক গাছ থেকে আরেক গাছে বাতাসে ভর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে উজ্জ্বল রঙে রঙীন একটা গিরগিটি—ডানার মত চামড়া ছড়িয়ে আছে দু'পাশে। বাদামী নদীর কাদায় নিথর দেহে পড়ে রয়েছে কুড়ি ফুট লম্বা এবড়োখেবড়োদেহী একটা কুমীর। চার রকমের চারটে প্রাণী—চার রকম বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু চেহারায় যতই অমিল থাকুক না কেন, এরা সবাই একই শ্রেণীর জন্তু—যাদের এক কথায় বলা হয় সরীসৃপ।

বিভিন্নদেহী সরীসৃপদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা কিসের ?

সাপকে বাইরে থেকে ঈল অথবা কেঁচো বা কৃমির মতই মনে হয়—কুমীরের মত নয়। লম্বা-ল্যাজ, থ্যাবড়া পা, ভোঁতা-নাক গিরগিটিকে দেখতে লম্বা-ল্যাজ, থ্যাবড়া-পা, ভোঁতা-নাক, সালামাণ্ডারের মত—বেঁটে, পিঠে-খোলা-ওয়ালা কচ্ছপের মত নয় মোটেই। তা সত্ত্বেও সাপ, কুমীর, গিরগিটি বা টিকটিকি আর কচ্ছপ বা কাছিমরা 'রক্ত সম্পর্কিত'—অন্যান্যেরা একেবারেই আলাদা প্রাণী। সরীসৃপ তাহলে সরীসৃপ হচ্ছে কেন ?

প্রথমেই দেখা যাক, প্রত্যেক সরীসৃপের একটা কংকাল থাকে। কৃমি বা কেঁচোর থাকে না। কাজেই বাইরে থেকে সাপ আর কেঁচো বা কৃমিকে এক রকম দেখতে হলেও কোনোক্রমেই তাদের এক শ্রেণীর জীব বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, সব সরীসৃপই বাতাস নিঃশ্বাস নেয়। সাগরের বালুতলে এঁকে বেঁকে পিচ্ছিল ভঙ্গিমায় এগিয়ে যাওয়া ঈল-কে সাপের মত দেখতে লাগলেও, আসলে সে মাছ এবং কানকোর সাহায্যে নিঃশ্বাস নেয় জলের মধ্যে। সরীসৃপদের ফুসফুস আছে—সে ফুসফুস শুধু বাতাসে নিঃশ্বেস নিতেই পারে ; সমুদ্রের সাপ আর কাছিমদের সারা জীবন জলেই কাটে—তবুও তাদের ফুসফুস থাকে বাতাস থেকে নিঃশ্বেস নেওয়ার জন্যে। কাজেই, ঈল আর সাপকে আকারের দিক দিয়ে এক রকম মনে হলেও প্রাণী হিসেবে তারা আলাদা শ্রেণীর।

তৃতীয়তঃ, এক রকমের আঁশ দিয়ে প্রত্যেক সরীসৃপের শুকনো চামড়া ঢাকা থাকে। সালামান্ডারকে গিরগিটির মত দেখতে বলে অনেক জায়গায় তাকে গিরগিটিই বলা হয়। কিন্তু আসলে সে ব্যাঙের মত উভচর প্রাণী। এর চামড়া পাতলা এবং ভিজে-ভিজে। চামড়ার মধ্যে দিয়ে সালামান্ডারের দেহের ভেতরকার জল বেরিয়ে যায় বলেই চামড়া ভিজে-ভিজে থাকে। অধিকাংশ উভচর পুকুরে বা নদীর জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকে হারিয়ে যাওয়া জলকে দেহের ভেতরে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে। বেশী শুকিয়ে গেলে মরণ অনিবার্য বলে। তাই উভচররা মূলতঃ জলের জীব, এবং কয়েক ধরনের উভচর জল থেকে বেরোয় না বললেই চলে। কিন্তু সরীসৃপের আঁশযুক্ত শক্ত চামড়ার দৌলতে দেহের জল বাইরে বেরোতে পারে না। পান করার সময় ছাড়া জলের আর দরকার হয় না। তাই গিরগিটি আর সালামান্ডারদের আভ্যন্তরিক 'যন্ত্রপাতি' একেবারেই আলাদা।

উভচর এবং অধিকাংশ সরীসৃপ ডিম পাড়ে (কিছু সাপ আর গিরগিটি বাচ্চা পাড়ে)। উভচরদের ডিম নরম আর জেলীর মত। চট করে শুকিয়ে যেতে পারে এবং তা দিয়ে ডিম ফুটোনো সম্ভব হবে না বলে ডিম পাড়তে হয় জলে বা ভিজে জায়গায়। অধিকাংশ শিশু উভচর ডিম ফুটে বেরোয় জলের মধ্যে, মাছের মতই নিঃশ্বেস নেয় কানকো দিয়ে।

কিন্তু সরীসৃপের ডিম মোড়া থাকে শক্ত খোলায়। মুগরীর ডিমের মত শক্ত আর ভঙ্গুর সব সময় হয় না—হয় চামড়ার মত বা রবারের মত। কিন্তু ডিমের ভেতরটা আগলে রেখে দেয় বলে শুকিয়ে যেতে পারে না। সরীসৃপের ডিম ডাঙার যেখানে খুশী পাড়া চলে—এমন কি রৌদ্রদগ্ধ শুষ্ক মরুভূমিতেও। কাজেই, সরীসৃপরা ডাঙার জীব। এমন কি যে সব সরীসৃপ জলে বাস করে, তাদেরকেও আসতে হয় ডিম পাড়ার জন্যে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, চারটে ব্যাপারে একটা সরীসৃপকে সরীসৃপ বলা যায় —কংকাল ; ফুসফুস (সারা জীবন ধরে বাতাস নিঃশ্বেস নেওয়ার জন্যে) ; শুকনো আঁশযুক্ত চামড়া ; আর শক্ত খোলার ডিম—যে ডিম ডাঙায় পাড়া হয়। চেহারার দিক দিয়ে যতই আলাদা হোক না কেন, এই চার ব্যাপারে মিল থাকায় সরীসৃপরা অন্য জীবদের থেকে পৃথক শ্রেণীর।

সরীসৃপদের রক্ত কি ঠাণ্ডা হয় ?

সরীসৃপদের কংকালের অংশ বিশেষ অন্য জীবদের কংকালের মত তো হয়ই না, উপরন্তু পালকওলা পাখী আর লোমওলা স্তন্যপায়ীদের মত এরা

'উষ্ণরক্ত' সম্পন্ন হয় না—হয় মাছ আর উভচরদের মত 'শীতল রক্ত' সম্পন্ন। তার মানে এই নয় যে এদের রক্ত হাতে-ঠাণ্ডা মনে হবে। এর মানে, আশপাশের জল বা বাতাস থেকে এদের দেহ তাপমাত্রা টেনে নেয়। বাতাস যদি কনকনে ঠাণ্ডা হয়, অধিকাংশ সরীসৃপের দেহ আড়ষ্ট হয়ে যায় এবং নড়তে চড়তে কষ্ট হয়। সহজে যাতে নড়াচড়া করতে পারে তাই সরীসৃপরা হরবখৎ রোদ পোহায়। পক্ষান্তরে, গরমের মধ্যেও অনেকক্ষণ থাকতে পারে না—থাকলে শরীর এত গরম হয়ে যাবে যে মারা পড়বে।

উভচররা কি সরীসৃপদের পূর্বপুরুষ ?

উভচরদের মতই সরীসৃপরা 'শীতলরক্ত' সম্পন্ন এবং চেহারার দিক দিয়েও উভচর আর সরীসৃপদের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে। তার কারণও আছে। উভচররাই সরীসৃপদের পূর্বপুরুষ। বত্রিশকোটি বছর আগে সরীসৃপ বলে কোনো প্রাণী পৃথিবীতে ছিল না। ছিল অসংখ্য উভচর। এ পৃথিবী ছিল তখন তাদের স্বর্গরাজ্য। জলাভূমিপূর্ণ বিশাল জঙ্গল ছিল আদিম পৃথিবীর বহু অঞ্চলে—উষ্ণ, স্যাঁতসেঁতে আর কাদা বোঝাই সেই সব অঞ্চলে ছিল বিস্তর বদ্ধ জলাশয় আর ধীরগতি নদী; উভচররা পালে পালে বাস করেছে সেই সব অঞ্চলে। খাবারের অভাব কখনো ঘটেনি—খেয়ে শেষ করতে পারেনি মাছ, পোকা এবং প্রাণীদের। ডিম পাড়বার উপযোগী প্রচুর আদ্রর্তাও পেয়েছিল তারা। আজকালকার ব্যাঙ এবং অন্যান্য উভচরদের মত সে যুগের উভচরদের অনেকেও বুক ঠুকে উঠে এসেছিল ডাঙাতেও—কিন্তু সাময়িকভাবে—কৌতূহল চরিতার্থ করে সর্বদাই ফিরে যেতে হয়েছে জলের রাজ্যে।

কিন্তু ফাঁক পেলেই প্রাণ ঢুকে পড়ে সেখানে। বেশ কিছু কৃমি আর কেঁচো জাতীয় জীব, পোকামাকড় আর বহুপদ জীব ছাড়া ডাঙাতে তখন আর কোন প্রাণী বাস করত না। কাজেই, থাকবার জায়গার অভাব ছিল না।

তাই, কিছু শ্রেণীর উভচর খোলা দুনিয়ায় চলে আসতে শুরু করেছিল। পুরুষানুক্রমে চামড়া আর বপুকে সামান্য পালটে নিয়ে ক্রমশঃই আরও বেশী সময় কাটাতে শুরু করে ডাঙায়। ডাঙায় থাকার ক্ষমতা বাচ্চারাও পেতে থাকে এবং লক্ষ লক্ষ বছরে পরিবর্তন আরও বৃদ্ধি পাওয়ার পর এই-দুইয়ের মাঝে কিছু শ্রেণীর জীব জলাভূমিপূর্ণ জঙ্গলে বসবাস আরম্ভ করে। সম্ভবতঃ বেশীর ভাগ সময় এরা জলেই কাটাত, কিন্তু শক্ত চামড়ায় মোড়া ডিম পাড়ত ডাঙায়।

পরিবর্তন সম্পূর্ণ হল প্রায় একত্রিশ কোটি বছর আগে। আবির্ভূত

হল আনকোরা নতুন এক শ্রেণীর জীব। খুব সম্ভব এদের দেখতে ছিল উভচরদের মতই, চামড়া ছিল শক্ত আর আঁশযুক্ত এবং অনেক বেশী চটপটে আর ক্ষিপ্রগতি ছিল উভয়চরদের চেয়ে। এরা ছিল একেবারেই ডাঙার জীব—সরীসৃপদের আদিমতম পুরুষ। আজ পর্যন্ত আদিমতম যে সরীসৃপ আবিষ্কৃত হয়েছে, লম্বায় ছিল দু-ফুট—পৃথিবীতে বিচরণ করেছে আজ থেকে তিরিশ কোটি বছর আগে। বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড রোমার-য়ের নামানুসারে এদের নাম রাখা হয়েছে রোমারিসকাস।

গেল আরো লক্ষ লক্ষ বছর। আদিমতম সরীসৃপরা একটু একটু করে পালটে গিয়ে ভাগ হয়ে গেল নানা ধরনের সরীসৃপে। কেউ থেকে গেল বাদাপূর্ণ বনে, কেউ বেরিয়ে এল সমতল প্রান্তরে, কেউ গেল মরুভূমিতে। কেউ কেউ 'অ্যাবাউট টার্ন' করে ফিরে গেল জলের রাজ্যেই—মানিয়ে নিল সেইখানেই।

আবির্ভূত হল প্রথম কচ্ছপ, প্রথম গিরগিটি, প্রথম কুমীর, এবং আরো অনেক শ্রেণীর সরীসৃপ। এদের মধ্যে ছিল ডাইনোসর—যাদের অনেকেই স্থলভাগের বৃহত্তম প্রাণী হয়ে দাপিয়ে বেরিয়েছে বনে জঙ্গলে মাঠে পাহাড়ে। এমন কি আকাশপথে আর জলের রাজ্যেও আধিপত্য বিস্তার করেছিল দানবিক সরীসৃপকুল। তাই এই যুগকে বলা হয় সরীসৃপদের মহান্ যুগ।

আজ থেকে বিশকোটি বছর আগে থেকে শুরু হয়ে সাত কোটি আগে পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল সরীসৃপ যুগ। তারপর কি কারণে জানা নেই, মরতে লাগল সরীসৃপরা। লোপ পেয়ে গেল অনেক জীব।

সে যুগে যে সব সরীসৃপ রাজত্ব করে গেছে ধরণীতে, তাদের মধ্যে থেকে টিঁকে রয়েছে মোটে চারটে শ্রেণী বা দল।

সব শেষে বলি, রেপটাইল (সরীসৃপ) শব্দটা ল্যাটিন ; মানে, 'গুঁড়ি মেরে চলা'।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে কুমীর ছিল ?

জলার ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল বালক কারিথ্ অসরাস। প্রাগৈতি-হাসিক যুগের ডাইনোসর। চঞ্চুটা পাতিহাঁসের চঞ্চুর মত। মাথায় চাকতির মত ঝুঁটি। উচ্চতায় দশ বারো ফুটের বেশী নয়। এদের সবাই মাথায় তিরিশ ফুট এবং বয়স্ক। সে শুধু বালক বলেই বেঁটে। দলছাড়া হয়ে একা একা ঘুরছে জঙ্গলে। জল ফুঁড়ে বাদামী ঘাসের গুচ্ছের

আকর্ষণেই বোধহয় জলের ধারে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে সেদিকে। ঘাসের আড়ালে অর্ধেক ডোবা অবস্থায় পড়ে রয়েছে বিশাল একটা কাঠের গুঁড়ি—সবজে বাদামী রঙ—কারিথ্ অসরাসের নজর কিন্তু সেদিকে নেই।

নজর দিলেই ভাল করত। মস্ত ভুল করল সেইখানেই। ঘাসের দিখে চোখ রেখে ঝপাস করে জলে পা দিয়ে সেই দিকে এগুতেই সহসা জীবন্ত হয়ে উঠল কাঠের গুঁড়িটা। পঞ্চাশফুট লম্বা একটা দেহ বিদ্যুৎবেগে ছিটকে এল তার দিকে, হাঁ হয়ে গেল ছ-ফুট লম্বা একটা চোয়াল। সাঁড়াশির মত শক্ত কামড় বসিয়ে চোখের নিমেষে বালক কারিথ্ অসরাসকে টেনে নিয়ে গেল জলের মধ্যে—নিয়ে যে গেল, তার নাম ফোবোসুকআস্—আট কোটি বছর আগেকার ভয়ংকর বিপুলকায় মাংসাশী ডাইনোসর।

সুদূর অতীতের সেই পঞ্চাশ ফুট লম্বা কুমীরের মত বিশাল কুমীর আর নেই এখনকার পৃথিবীতে। কিন্তু সব দিক দিয়েই আজকের ক্রাকাডিলঈয়া (Crocodilia) শ্রেণীর সরীসৃপরা (crocodile, alligator, caiman আর gavial) সুপ্রাচীন তুতো ভাইয়ের মত দেখতে—বসবাসও করে সেইভাবে। পৃথিবীতে যখন আঁশদেহী দানব সরীসৃপরা দাপিয়ে বেরিয়েছে, সেই যুগে আদিম কুমীরদের জীবন কেটেছে কিভাবে, সে খবর পাওয়া যায় আজকের যুগের এই চার শ্রেণীর কুমীরের জীবনযাপনের ধরন লক্ষ্য করলে।

পূর্বপুরুষের মত এ যুগের কুমীরদেরও দরকার গরম ভিজে-ভিজে নিবাস। পৃথিবীর উষ্ণতম অঞ্চলে থাকে এরা। ধীর-গতি নদীর আনাচে কানাচে, বিশাল বাদা আর জলাভূমিতে এদের বাস। কেউ কেউ থাকে সমুদ্র-উপকূলে। ক্রোকোডাইল পাওয়া যায় আফ্রিকায়, এশিয়ার কিছু অংশে, এবং ফ্লোরিডার দক্ষিণ ডগা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ পর্যন্ত অঞ্চলে। অ্যালিগেটর থাকে যুক্তরাস্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাংশে আর চীন দেশের কিছু অংশের ঘাস ছাওয়া জলাভূমিতে। প্রায় অ্যালিগেটরের মতই দেখতে কেম্যান থাকে মধ্যে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় গেভিয়াল থাকে ভারতে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে আর ব্রহ্মদেশে।

এই সব কটা সরীসৃপকেই দেখতে মোটামুটি একরকম। দাঁত দেখে তফাৎটা ধরতে পারেন বৈজ্ঞানিকরা। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, ক্রোকোডাইলের চেয়ে অ্যালিগেটরের লম্বা নাক-মুখ অনেক চওড়া। গেভিয়ালের অত্যন্ত লম্বা লম্বা আর সরু নাক মুখ দেখলেই চেনা যায়। বাংলায় একে আমরা বলি ঘড়িয়াল বা মেছো-কুমির।

জলেই পরম শান্তি পায় সব কুমীর। প্রত্যেকেই অতি দক্ষ সাঁতারু। শরীরে পা চেপে ধরে লম্বা আর চ্যাপ্টামত ল্যাজ নেড়ে মসৃণ ভঙ্গিমায় সাঁতরায় প্রত্যেকেই। শুধু চোখ, নাক আর কানের ফুলো অংশটা জলের ওপর জাগিয়ে ভেসে থাকতে পারে বলে চট করে দূর থেকে বোঝা যায় না কুমীর রয়েছে জলে। এক ঘন্টারও বেশী জলের নিচে ডুব দিয়ে থাকতে পারে বৃহৎ কুমীররা—নিঃশ্বেস নেওয়ার দরকার হয় না। তখন তারা চোখ আর নাকের ফুটোও বন্ধ রাখতেও পারে।

অধিকাংশ কুমীর সাধারণতঃ রাতটা জলে কাটিয়ে সূর্য উঠলে ডাঙায় আসে রোদ পোহাতে। হাঁটবার সময়ে পা-গুলো দেহের তলায় খাড়া করে নেয়। অন্যান্য কুমীরের মত গেভিয়াল অথবা মেছো কুমীর ডাঙায় বড় একটা আসে না পায়ের জোর কম বলে—হাঁটতে পারে না।

আফ্রিকার নাইল ক্রোকোডাইল এ যুগের সবচেয়ে বড় কুমীর। লম্বায় প্রায় কুড়ি ফুট। অসতর্ক অবস্থায় যে কোনো আয়তনের জন্তু শিকার হতে পারে এই কুমীরের—সিংহ, বাচ্চা জলহস্তী, মোষ পর্যন্ত বাদ যায় না। জন্তুদের জল খাওয়ার প্রিয় জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে নাইল কুমীর। বিরাট অলস ভঙ্গিমায় পড়ে থাকলেও ঠিক সময়টিতে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর—কামড়ে ধরে বিশাল দাঁতালো চোয়াল দিয়ে। অনেক সময়ে জন্তুদের মুখ বা পা কামড়ে ধরে অথবা ল্যাজের ঝাপটা মেরে জলে টেনে নেয় কুমীর। মানুষও বাদ যায়না!

কুমীর কি চিবিয়ে খায় ?

কুমীর শ্রেণীর কেউই চিবিয়ে খেতে পারে না। জলের মধ্যে শিকারকে টেনে নিয়ে 'ছিঁড়ে' টুকরো টুকরো করে নেয়। সাঁড়াশির মত ভয়ংকর চোয়ালে শিকারকে চেপে ধরে জলের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে পাকসাট খেতে থাকে —শিকারকে এমন জোর বন্ বন্ করে ঘোরাতে থাকে যে খানিকটা টুকরো থেকে যায় মুখের মধ্যে। তখন জল থেকে মাথা ঠেলে তুলে এক ঝটকায় মাংসের টুকরোটা চালান করে গলার মধ্যে। মিনিট কয়েক পরে ফের নেমে যায় জলের মধ্যে আর এক গরস মাংস ছিঁড়ে নেওয়ার জন্যে।

কুমীরদের খাদ্য কী ?

কুমীররা সব সময়ে ডাঙার জন্তুদের আক্রমণ করে না আহারের জন্যে। জলের মধ্যে থেকেই বেশীর ভাগ খাদ্য সংগ্রহ করে। যেমন—মাছ, কচ্ছপ। ঘড়িয়ালদের সরু লম্বা চোয়ালের গড়ন এমনই যে কেবল মাছ ধরতেই পারে।

সারি সারি দাঁত বসানো আছে এই চোয়ালের ওপর নিচে। তাই খালি মাছই খায়। চুপ করে বসে থাকে জলের মধ্যে। পাশ দিয়ে মাছ গেলেই ঘাড় ঘুরিয়ে ঘপাৎ করে চোয়াল বন্ধ করে মাছ ধরে নেয় দাঁতের ফাঁকে।

কুমীর পাখি খায় ?

বড় কুমীর ডাঙার প্রায় সব জীবের পক্ষেই মারাত্মক বিপজ্জনক—কিন্তু কয়েক শ্রেণীর পাখীর সে বিপদ নেই। শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য ডাঙায় এসে চোয়াল ফাঁক করে কাঠের গুঁড়ির মত পড়ে থাকে কুমীর। কাদাখোঁচা পাখী, সারস পাখী এবং অন্যান্য পাখীরা নির্ভয়ে নিথর-দেহ কুমীরদের হাঁ-করা চোয়ালের পাশে এসে দাঁড়ায়, এমন কি চোয়ালের মধ্যেও উঠে বসে—তারপর ঠুকরে ঠুকরে দাঁতের ফাঁক, মুখের ভেতর এবং সারা গা থেকে জোঁক ইত্যাদি বার করে নিয়ে মুখ আর গা পরিষ্কার করে দেয়। কুমীর হয়ত চায় পাখীরা এইভাবে সাফ করে দিক তাদের মুখ আর গা—অথবা আমোলই দেয় না। কিন্তু কখনোই চড়াও হতে দেখা যায় না পাখীদের ওপর।

কুমীররা ডিম পাড়ে কি ভাবে ?

সব কুমীর-মায়েরাই প্রায় মুরগীর ডিমের সাইজের শক্ত খোলার সাদা ডিম পাড়ে ডাঙায়। কুমীর-বাচ্চারা এই ডিম ফুটে বেরোয় বাইরে। এক-এক জাতের মায়েরা ডিম পাড়ে এক-এক রকম ভাবে। আমেরিকান অ্যালিগেটর মুখভর্তি কাদা উদ্ভিদ মিশিয়ে নিয়ে তিন ফুট উঁচু গম্বুজাকারের বাসা বানিয়ে নেয়। বাসার মাঝে ফোকর খুঁড়ে তার মধ্যে রাখে কুড়ি থেকে সত্তরটার মত ডিম। তারপর ফোকরের মুখ বন্ধ করে দেয় গাছপালা আর কাদার মিশেল দিয়ে। নাইল ক্রোকোডাইল দু ফুট গভীর গর্ত খোঁড়ে ডিম রাখবার জন্যে। এশিয়ার কুমীররা পাতার স্তূপ সাজিয়ে বানায় ডিম পাড়বার বাসা।

ডিম পাড়বার পর কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে ডিম পাহারা দেয় মা-কুমীর—দরকার হলে ডিম চোরদের ঘায়েল করার জন্যে। গরমে তা দেওয়া হয়ে যায় ডিমে। তারপর ডিমের খোলা ভাঙে কুমীর-বাচ্চারা মুখের 'ডিম-দাঁত' দিয়ে—সব বাচ্চারই থাকে এই ডিম ভাঙার দাঁত। কিঁচমিচ আওয়াজ করতে থাকে বাসার মধ্যে। মা তা শোনে। ছুটে এসে বাসা ভেঙে মুক্তি দেয় বাচ্চাদের। মা-হাঁসের পেছনে বাচ্চাহাঁসের দল যে ভাবে যায়, সেইভাবেও নিজের পায়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত বাচ্চারা

দিন কয়েক মায়ের পেছন পেছন ঘোরে ন্যাওটার মত। বিপদ তো কম নয় বেচারীদের। বহু জন্তুর প্রিয় খাদ্য এই বাচ্চা কুমীর—এমন কি বড় কুমীররাও মওকা পেলে কপাকপ গিলে নেয় বাচ্চাদের!

ডাইনোসরদের মত দেখতে এই কুমীরদের মেরে মেরে মানুষ প্রায় শেষ করে আনছে স্রেফ তাদের চামড়ার লোভে। চমৎকার এই চামড়ার তৈরী বেল্ট, জুতো আর ম্যানিব্যাগ কে না চায়! অথচ কুমীররা অনেক সময়ে আমাদের উপকারও করে। আমেরিকার অ্যালিগেটর যে ধরনের মাছ খেতে ভালবাসে, সেই ধরনের মাছ (gar) আবার খেতে ভালবাসে মানুষের প্রিয় মাছেদের। কাজেই লুঠেরা মাছদের খেয়ে সাবাড় না করলে এরাই বংশবৃদ্ধি করতে করতে মানুষের আহার্য মাছেদের খেয়ে সাবাড় করে দিত। এদের খোঁড়া গর্তে জমা জল খেয়ে অনাবৃষ্টির সময়ে বাঁচে বহু জানোয়ার। গাছপালা আর জীবজন্তুর জগতে ভারসাম্য বজায় রাখে এই কুমীরকুল। তবুও তাদের ধ্বংস করা চাই স্রেফ চামড়ার জন্যে। অন্যায় নয় কী?

ড্রাগনকে বাহন করা যায়?

জলন্ত সূর্যের নিচে ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে ছাওয়া শুকনো খটখটে মাঠে মুখোমুখি হয়েছে দুটো বিরাটকায় সরীসৃপ। ল্যাজের ডগা থেকে শুরু করে নাক-মুখের ডগা পর্যন্ত ছ'ফুট লম্বা এক-একজন। ছিপছিপে বপু হলদে-বাদামী রঙের, তাতে কালচে ফুটকি। একজোড়া পুরুষ বেঙ্গল মনিটর গিরগিটি শক্তির মহড়া দেওয়ার জন্যে মুখোমুখি হয়েছে নিভৃত প্রান্তরে।

মুখ খুলে, গলা ফুলিয়ে দুজনেই ফোঁস ফোঁস শব্দ ছাড়ছে পরস্পরকে লক্ষ্য করে। একজন সাবধান করছে—খবরদার আমার তল্লাট মাড়িও না। অপরজন তোয়াক্কা করছে না—দখল করতেই তো এসেছি তোমার রাজ্য!

আচমকা পেছনের দুপায়ের ওপর দাঁড়িয়ে উঠল দুজনেই। মল্লবীরের মত সামনের দু'পা দিয়ে জড়িয়ে ধরল দুজনকে। চলল ঠেলা-ঠেলি, কোস্তাকুস্তি—কিন্তু কামড়াকামড়ি নয়। আচমকা একজন পেছনের পা প্রতিদ্বন্দ্বীর পেছনের পায়ে গলিয়ে দিয়ে ল্যাং মেরে জোরসে তাকে ঠেলে দিল সামনে। আচমকা ল্যাং আর ধাক্কা খেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিটকে গেল মাটিতে। পরক্ষণেই তেড়ে এসে ফের দুপায়ে দাঁড়িয়ে উঠে জড়িয়ে ধরল প্রতিদ্বন্দ্বীকে। কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর ওজনে ভারী একজন

ওজনে হাল্কাকে আবার ল্যাং মেরে ঠেলে ফেলে দিল মাটিতে। এবার আর রুখে না। দাঁড়িয়ে চম্পট দিল পরাজিত গিরগিটি।

অঞ্চল দখল নিয়ে মনিটর গিরগিটিদের মারপিট হয় এই ভাবেই—কেউ কাউকে জখম করে না। কিন্তু খাবার দখল নিয়ে মারপিট হলে কামড়া কামড়ি আঁচড়া আঁচড়ি পর্যন্ত গড়ায়—রক্তপাত ঘটেই।

গিরগিটিদের বেশ একটা বড় গোষ্ঠীকে বলা হয় মনিটর। রঙ আর আর আয়তনের ফারাক ছাড়া দেখতে সবাইকে একই রকম। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ইন্দো-অস্ট্রেলিয়া আর এশিয়ার নানান উষ্ণ অঞ্চলের বাসিন্দা এরা। কিছু মনিটর আকারে গিরগিটিদের মধ্যে বৃহত্তম—পাঁচ থেকে দশ ফুট পর্যন্ত লম্বা।

বেশীর ভাগ জীব বিশেষ জায়গায় বিশেষ ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত। কুমীর সচরাচর জল ছেড়ে বেরোয় না—গাছে চড়তেও পারে না। আবার বহুরূপী গিরগিটি (ক্যামীলিয়ন) গাছের বাসা ছেড়ে মাটিতে বড় একটা নামে না, সাঁতারও কাটে না। কিন্তু বেশীর ভাগ মনিটর প্রায় সব কিছুতেই চোস্ত—গাছে চড়া, নদী সাঁতরানো, মাঠে দৌড়োনো আর গর্ত খুঁড়ে বাসা বানানো—কিছুতেই পেছপা নয়। প্রত্যেকেরই শরীর লম্বা আর ছিপছিপে—সাপের মত চেরা সকলকে জিভ। সাপেরা যে ভাবে শিকার অন্বেষণে গন্ধসূত্র খুঁজে বার করে জিভের সাহায্যে—এরাও লম্বা চেরা জিভ কাজে লাগায় সেইভাবে। সাপেদের সঙ্গে মনিটরদের মিল আছে অনেক দিক দিয়ে। যে কারণে বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, এরা উভয়েই একই গিরগিটি পূর্বপুরুষের বংশধর।

মনিটরদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যারা তাদের প্রকৃতই দানব আখ্যা দেওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়ার কোমোদো দ্বীপ এবং অন্যান্য আরো কয়েকটা দ্বীপে এদের নিবাস বলে এদের বলা হয় কোমোদো ড্রাগন গিরগিটি। পুরুষ কোমোদো ড্রাগন লম্বায় ছ' ফুট পর্যন্ত এবং ওজনে ৩০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। বাদামী হলদেটে চামড়ায় নুড়ির মত আঁশ আর চামড়ার মোটা মোটা ভাঁজ। পুরাকালের ডাইনোদের চামড়া কি রকম হত, তা খানিকটা আন্দাজ করা যায় এদের চামড়া দেখলে।

যে কোনো মরা প্রাণী পেলে খেয়ে নেয় কোমোদো ড্রাগন—আবার জ্যান্ত প্রাণী শিকার করতেও বিলক্ষণ পটু। ওৎ পেতে বসে থাকে বুনো শুওর বা হরিণের জন্যে। শিকার কাছাকাছি এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, কামড়ে ধরে অ্যায়সা আছাড় মারে যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখানোর জন্যে। তারপর

ধারালো দাঁত আর থাবা দিয়ে খতম করে শিকারকে। টুকরো টুকরো মাংস ছিঁড়ে চালান করে মুখের মধ্যে এবং গিলে ফেলে চুল আর হাড় সমেত। কখনো সখনো সামনের একটা পা দিয়ে বাড়তি মাংসের ডেলা ঠেলে নামিয়ে দেয় গলার মধ্যে।

বুনো কোমোদো ড্রাগন বিপজ্জনক নিঃসন্দেহে কিন্তু চিড়িয়াখানায় এমনি বিরাট ভয়ংকর ডাইনোরসম সরীসৃপদেরও দিব্বি পোষ মানানো যায়! তাদের নাম ধরে ডাকলে ছুটেও আসে—অবশ্য পোষ যে মানিয়েছে, তার ডাকেই আসে। এর চাইতেও বিস্ময়কর ঘটনা হল, লণ্ডন চিড়িয়াখানায় দুটো কোমোদো ড্রাগন এমন ভালবেসে ফেলেছিল দু'পেয়ে মানুষদের যে বাচ্চাকাচ্চাদের পিঠে চাপিয়ে বাহন হতে দ্বিধা করত না, কুকুরদের পিঠ চাপড়ালে যেমন চুপ করে থাকে, ঠিক সেইভাবেই আদর খেত পরম আয়েজে! পক্ষান্তরে, মানুষদের ওপর চড়াও হওয়ার ঘটনাও আছে বুনো কোমোদো ড্রাগনের ক্ষেত্রে।

চার পাঁচ ফুট লম্বা কোমোদো ড্রাগনরা গাছে চড়তে পোক্ত, বড়রা শরীর ভারী হয়ে যাওয়ার দরুন তা পারে না। কিন্তু ছোট বড় প্রত্যেকেই থাবা দিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে রাত কাটায় তার মধ্যে, দিনের বেলা গরম পড়লে সেঁধিয়ে যায় সেই গর্তের মধ্যে।

দ্বিতীয় বৃহত্তম মনিটররা জলের মনিটর, থাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানান অঞ্চলে। লম্বায় আট ন' ফুট পর্যন্ত হয়। ধীরগতি নদীর জলে এরা বেশ আরামেই থাকে। কুমীরের মতই দেহের তলায় পা চেপে ধরে সাঁতার কাটে এবং বিস্ময়কর দীর্ঘ সময়ের জন্যে জলের তলাতেও থাকতে পারে। চ্যাপ্টা ধরনের ল্যাজ নাড়ে সাঁতরানোর সময়ে অবিকল কুমীরের মতই। আবার, জল ছেড়ে প্রায়ই গাছে চড়ে বসে এবং লম্বা ডালে শুয়ে রোদও পোহায়। কোমোদো ড্রাগনের মত যে কোনো জন্তু খায়—মরা অথবা জ্যান্ত। কিন্তু জলের মধ্যেই বেশীর ভাগ সময় থাকে বলে মূলতঃ খায় জলের জীব; যেমন মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ। স্রেফ গিলে নেয় খোলা-টোলা সমেত।

অস্ট্রেলিয়ার মনিটর তৃতীয় বৃহত্তম মনিটর—লম্বায় প্রায় সাত ফুট। অন্যান্য মনিটররা লম্বায় ৬ ফুট পর্যন্ত হয়! যেমন, নাইল মনিটর—থাকে আফ্রিকার নাইল নদীতে। এরা জলের তলায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত ডুব দিয়ে থাকতে পারে। আবার ডাঙায় আর গাছেও পরম আরামে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়ে যেতে পারে।

সব মনিটরেরই লোভ ডিমের ওপর। পাখী আর কচ্ছপের ডিম লুঠ

করে। নাইল মনিটর কুমীরের ডিম পর্যন্ত চুরী করে খায়। ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক। তাই এমনও দেখা গেছে যে একটা মনিটর কুমীর-মাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেছে বাসা থেকে দূরে—সেই ফাঁকে তার দোস্ত মনিটর ডিম আহার আরম্ভ করে দিয়েছে। আগের মনিটরটাও ফিরে এসে বখরা নিয়েছে। তারপর কুমীর-মা ফিরে এলেই দুজনেই চম্পট দিয়েছে। কখনো কখনো ডিম লুঠ করে নিয়ে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখে এরা—পরে অল্প সল্প করে খায় তারিয়ে তারিয়ে।

সব মনিটরই গর্ত খুঁড়ে ডিম পেড়ে মাটি চাপা দিয়ে দেয় যাতে কেউ খুঁজে না পায়। কিন্তু নাইল মনিটররা আরো চালাক, তারা বৃষ্টিতে ভেজা নরম মাটির উইঢিপির গা খুঁড়ে ভেতরে ডিম পাড়ে! উইরাই ঢিপির ফুটো বন্ধ করে ফ্যালে ঝটপট। রোদ্দুরে পাথরের মত শক্ত হয়ে যায় উইয়ের ঢিপি এবং গর্তের মুখ। রোদ্দুরের তাতে ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরোয় প্রায় পাঁচ মাস পরে, ডিমের ভেতরকার জলের মত তরল পদার্থে উইঢিপির দেওয়াল নরম হয়ে যায়। বাচ্চা মনিটররা থাবা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে বেরিয়ে আসে বাইরে।

সাত কোটি বছর আগে যে ডাইনোসররা পৃথিবীতে বাস করেছে, সেই সরীসৃপদের শ্রেণীতেই পড়ে মনিটররা। মনিটরদের সেই আদিম পূর্বপুরুষের নাম ছিল মেসোসরাস—লম্বায় পঁয়ত্রিশ ফুট!

সমুদ্রের দানব ছিল এই বিশাল গিরগিটিরা!

কোন সরীসৃপের 'তৃতীয় নয়ন' আছে?

প্রশান্ত মহাসাগরে নিউজিল্যাণ্ডের সুবৃহৎ সাউথ আয়ল্যাণ্ডের কাছে একটা ছোট্ট খাড়াই পাথুরে দ্বীপ আছে। সমুদ্রের তলায় একটা পাহাড়ের চুড়ো—সেই হল দ্বীপ। দ্বীপের ওপর দিকে মাটি জমেছে, বড় বড় গোলাকার পাথরের ফাঁকে কর্কশ ঘাসও আছে। মাঝে মাঝে গোলাকার পাথরের কিনারায় ঘাস উপড়ে যেন গর্ত করে নেওয়া হয়েছে। ধূসর আর সাদা রঙের ডোভে পেট্রেল পাখীদের বাসা এই গর্তগুলো—তারাই মাটি খুঁড়ে বানিয়েছে নিজেদের আস্তানা।

গর্তের মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাবে একটি মাত্র বাচ্চা নিয়ে উপবিষ্ট মা পেট্রেলের পাশেই পরম নিশ্চিন্তে আয়েশ করছে বিচিত্র এক অতিথি—একটি সরীসৃপ!

পাখীর বাসায় অতিথি এই সরীসৃপের বৈজ্ঞানিক নাম স্ফীনোডন। যার

মানে,, গোঁজদন্ত'। কিন্তু মাওরীরা এদের যে নাম দিয়েছিল, সেই নামেই এই সরীসৃপরা এখন সমধিক পরিচিত—টুয়াটারা! মাওরীরাই নিউজিল্যাণ্ডে প্রথম বসবাস শুরু করে। তাদের ভাষায় টুয়াটারা মানে 'যার মেরুদণ্ড আছে'। :কেন না, টুয়াটারার পিঠে খোঁচা খোঁচা ফলক আছে একসারি—মনে হয় লাইন বেঁধে দাঁত নেমে গেছে ঘাড় থেকে ল্যাজ পর্যন্ত পিঠের ওপর দিয়ে। আসলে আঁশগুলোই এভাবে ঠেলে উঠেছে।

যত রকমের গিরগিটি আছে আজকের পৃথিবীতে, টুয়াটারাকে দেখতে তাদের মত হলেও টুয়াটারা গিরগিটি নয় মোটেই—অত্যন্ত বিশেষ ধরনের জীব তারা! অন্যান্য সরীসৃপদের থেকে তার শরীর আলাদা, মস্তিষ্ক মটর দানার চেয়ে বড় নয় মোটেই। ২২ কোটি বছর আগে যে সরীসৃপরা পৃথিবীতে বাস করে গেছে, টুয়াটারা তাদের মতই এক সরীসৃপ—আদিম সরীসৃপ!

কচ্ছপ, কুমীর, সাপ, গিরগিটিরা তখনো আসে নি। এমন কি ডাইনোসরদেরও আবির্ভাব ঘটেনি ; রিঙকোসাফেলয়ান (Rhynchocephalion) নামে এক ধরনের বৃহৎ সরীসৃপ দেখা দিয়েছিল পৃথিবীতে। রিঙকোসাফেলয়ান মানে 'চঞ্চুমাথা'। এদেরই একটা শ্রেণীকে এখন আমরা টুয়াটারা বলছি! ওদের অন্যান্য সব জ্ঞাতিভাই লোপ পেয়েছে—ডাইনোসরদের মতই—কিন্তু যে ভাবেই হোক টিকে গেছে টুয়াটারা। প্রাচীনতম সরীসৃপদের অন্যতম এই টুয়াটারা আজও সম্ভবত: ২০ কোটি বছর আগেকার সরীসৃপদের মতই একই ঢংয়ে জীবন যাপন করে চলেছে। বৈজ্ঞানিকদের কাছে টুয়াটারা তাই একটা চাঞ্চল্যকর গবেষণার বিষয়—প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীরা বেঁচে থাকত কিভাবে, টুয়াটারার বেঁচে থাকার ধরনটা পর্যবেক্ষণ করে তা আন্দাজ করার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

বিশ কোটি বছর আগেকার টুয়াটারদের কেউ কেউ ছ'ফুট পর্যন্ত লম্বা ছিল। টুয়াটারারা কিন্তু মোটে দু'ফুট লম্বা। পেট্রেল পক্ষীদের মাটির তলার বাসায় তারা মাঝে মাঝে সহাবস্থান করে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের বাসাও তারা খুঁড়ে নিতে পারে এবং প্রায়ই তাই করে। কুকুরের মত সামনের দু'পা দিয়ে গর্ত খোঁড়ে। থাবায় আছে পাঁচটা আঙুল, দেখতে মোটাসোটা মানুষের বাচ্চার হাতের মত। পেছন দিকে মাটি ছুঁড়ে দিয়ে গর্ত বানিয়ে শুকনো ঘাসপাতা সার দিয়ে রাখে গর্তের দুপাশে। একলাই থাকে গর্তের মধ্যে। সারাদিন গর্তে কাটায়। শুধু সকালে আর বিকেলে গর্তের মুখে বেরিয়ে গায়ে রোদ্দুর লাগায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামলেই বেরিয়ে পড়ে শিকারে। দিনের বেলায়

গর্তের মধ্যে টুয়াটারাকে টেনে বার করলে দেখা যাবে সে নড়তেই পারছে না—কিন্তু রাত্রেই এই টুয়াটারাই ক্ষিপ্র এবং অতি তৎপর। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার—কেননা, দ্বীপের তাপমাত্রা রাত্রে নেমে আসে ৪৫ ডিগ্রীতে—এত কনকনে ঠাণ্ডায় যে কোন সরীসৃপই আড়ষ্ট হয়ে যায়—নড়াচড়া করতে পারে না। টুয়াটারাদের কিন্তু এই ঠাণ্ডায় কিচ্ছু যায় আসে না। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকদের ধারণা রিঙকোসাফেলয়ানদের আবির্ভাবের সময় পৃথিবীটা অনেক ঠাণ্ডা ছিল।

টুয়াটারা শিকার করে প্রধানতঃ গুবরে পোকা, মাকড়শা আর ইঞ্চি তিনেক লম্বা এক ধরনের গঙ্গাফড়িং—নিউজিল্যাণ্ডে এ ফড়িংয়ের নাম ওয়েটাস। কেঁচো, শামুক, গেঁড়ি গুগলিতেও তাদের আপত্তি নেই, পাখীর ডিম, বাচ্চা পাখী, এমন কি ছোটখাট টিকটিকি গিরগিটি পর্যন্ত উদরে চালান করতে অভ্যস্ত তারা।

টুয়াটারাদের সম্বন্ধে সবচেয়ে অদ্ভুত খবরটা এই : এদের 'তিনটে' চোখ আছে, যদিও মাথার দুপাশে বসানো দুটো চোখই কাজ করে। কিন্তু মাথার ওপর দিকে আছে আর একটা চোখ। চামড়া দিয়ে ঢাকা একটা শুধু লেন্স—কিন্তু একটা স্নায়ু দিয়ে লেন্সটা যুক্ত আছে মস্তিষ্কের সঙ্গে। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, টুয়াটারাদের পূর্বপুরুষরা নিশ্চয়ই তৃতীয় নয়ন ব্যবহার করত। (বেশ কিছু গিরগিটিরও এই ধরনের তৃতীয় 'নয়ন' আছে)।

টুয়াটারাদের কাজের চোখের ওপর থাকে তিনটে চক্ষু-পল্লব। দুটো ওপরে আর নীচে—মানুষের আর গিরগিটির মত। কিন্তু তৃতীয়টা আসে টুয়াটারার চোখের কোণ থেকে—মাঝে মাঝেই মুছে দেয় চক্ষু-গোলক। মুছে দিয়েই সরে যায়, চোখের কোণে। গিরগিটি টিকটিকিদের এরকম চোখের পাতা নেই—কিন্তু কুমীরের আছে।

অধিকাংশ সরীসৃপের মত টুয়াটারাও ডিম পাড়ে। মা-টুয়াটারা পাঁচ ইঞ্চি গভীর গর্ত খোঁড়ে মাটিতে, তারপর আট থেকে পনেরোটা চামড়ার মত খোলাওলা ডিম রাখে তার ভেতরে। তারপর মাটি চাপা দিয়ে চলে যায় সেখান থেকে—ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় আপনা থেকেই। অধিকাংশ সরীসৃপের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে—টুয়াটারার বাচ্চা বেরোয় এক বছর কি তারও বেশী সময় পরে! বাচ্চার রঙ বাদামী গোলাপী—লম্বায় সাড়ে চার ইঞ্চি। নিজেরাই মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে আসে গর্তের বাইরে, তারপর খুঁজতে থাকে খাবার। শরীর বাড়তে থাকে খুব ধীর গতিতে এবং পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এইভাবে বেড়ে চলে একটু একটু করে! বৈজ্ঞানিকদের

বিশ্বাস, টুয়াটারা একশ কি তার বেশী বছর বাঁচে।

এত কোটি বছর বেঁচে থাকার পর টুয়াটারা প্রায় লোপ পেতে বসেছিল ধরাধাম থেকে। নিউজিল্যাণ্ডে এত কোটি বছর থেকেছে তারা—কোনো বিপদ দেখা যায় নি। কিন্তু গত দুশ বছরের মধ্যে বহু মানুষ বসতি করেছে সেখানে। সঙ্গে নিয়ে গেছে বেড়াল, কুকুর, শূওর—যারা ওখানে আগে ছিল না। কাজেই এসব জন্তুর আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচানোর পন্থাও জানা নেই টুয়াটারাদের। ওরা দিনের বেলা হাঁটে আস্তে আস্তে—কাজেই দলে দলে মারা পড়েছে এবং কুকুর, শূওর, বেড়ালের পেটে গেছে। গোদের ওপর বিষ ফোড়ার মত, ভেড়ার পালদের যখন ছেড়ে দেওয়া হল মাঠে মাঠে ঘাস খাওয়ার জন্যে—টুয়াটারারা আর কীটপতঙ্গও পেল না পেটের জ্বালা মিটোতে। গত একশ থেকে দেড়শ বছরের মধ্যে মারা পড়ল নিউজিল্যাণ্ডের সমস্ত টুয়াটারা।

কাছাকাছি ছোটখাট কয়েকটা দ্বীপে টি ঁকে গেল কয়েকটা। কিন্তু বিপদ থেকে মুক্তি পেল না। কপাল ভাল ওদের, তাই বৈজ্ঞানিকরা উঠে পড়ে লেগে নিউজিল্যাণ্ড সরকারকে দিয়ে এই সব দ্বীপগুলোকে টুয়াটারাদের উদ্বাস্তু এলাকা বলে ঘোষণা করালেন। বৈজ্ঞানিক ছাড়া এই দ্বীপে কোনো মানুষ যেতে পারবে না—অন্য কোনো বহিরাগত জানোয়ারকেও সেখানে রাখা যাবে না। ফলে, বেঁচে গিয়েছে ক্ষুদে সরীসৃপরা। সংখ্যায় এরা এখন প্রায় দশ হাজার। ডাইনোসরদের যুগ গিয়েছে—কিন্তু তাদেরও আগেকার এই ক্ষুদে সরীসৃপরা আজও খুব বেশী পালটায়নি, তাই এদের পর্যবেক্ষণ করলে জানা যায় বিশ কোটি বছর আগে :সরীসৃপরা কিভাবে বেঁচে ছিল এই পৃথিবীতে।

কোষকে প্রাণের মূল উপাদান বলা হয় কেন?

মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখতে হয় যাদের এবং ভেতরকার এলাহি কাণ্ডকারখানা দেখতে হলে মামুলী অনুবীক্ষণেও যখন হয় না—তখন দরকার হয় সুপারমাইক্রোসকোপ—নগন্য সেই কোষকে হামেশা বলা হয় প্রাণের মূল উপাদান। কেন?

একটা নরদেহে কোষ আছে ৬০ মহাপদ্ম; ইংরেজিতে ৬০ বিলিয়ন। ১ য়ের পিঠে ১২টা শূন্য চাপালে হয় এক বিলিয়ন বা মহাপদ্ম; অর্থাৎ নরদেহে কোষের সংখ্যা ৬০,০০০,০০০,০০০,০০০!

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঠিক যেন ৬০ মহাপদ্ম ইঁট দিয়ে গড়ে উঠেছে একটা মানুষের শরীর। সেই কারণেই হামেশাই বলা হয়, প্রাণের মূল উপাদান কোষ ; আরও সাচ্চাভাবে বলতে গেলে প্রাণ তো কোষরা নিজেরাই।

আশমান জমিন ফারাক রয়েছে এই ষাট মহাপদ্ম কোষের মধ্যে। একটা জিরাফ আর ইঁদুরের চেহারা আর কাজকর্মে যেমন তফাৎ, ঠিক তেমনি বিপুল প্রভেদ রয়েছে নরদেহের বিভিন্ন শ্রেণীর কোষেদের মধ্যে। হরেকরকম আয়তন তাদের। সবচেয়ে বড় আয়তনটা অস্‌ট্রিচ পাখীর ডিমের মত পেল্লায়। বৃহত্তম এই কোষ থেকে আয়তন কমতে কমতে এত ছোট আকারে, পৌঁছেছে যে ক্ষুদ্রতম কোষেদের দশ লক্ষ জনকে অনায়াসে রাখা যায় একটা আলপিনের ডগায়!

শুধু আয়তন নয়, আকারেও রকমারি এই কোষরা। কেউ রডের মত, কেউ চ্যাপ্টা চাকতির মত, কেউ গোল বলের মত। তা সত্ত্বেও এরা সবাই কোষ—একই দেহের কোষ।

নরদেহের সব কাজকর্মেই অংশ নেয় এই কোষেরা। ধরো, তুমি একটা ভারী থলি টেনে তুললে। কাজটা কিন্তু তুমি করলে না—করল তোমার হাতের পেশীর কোষ। নিজেরা সংকুচিত হয়ে টেনে তুলল ভারী থলিটাকে। আবার কালিপূজোয় আতসবাজির দোকানে গিয়ে ফাঁপড়ে পড়েছো কোন্ বাজি রেখে কোন্ বাজি কিনবে—এই সমস্যা নিয়ে। তখনও কিন্তু ভাবনা-চিন্তার কাজটা করছে তোমার মগজের কোষ। অথবা ধরো তোমার বাবা দাড়ি কামাতে বসেছেন। তখনও স্নায়ু আর পেশীর কোষেরাই মিলেমিশে তুলে দেয় কাজটা। গালের চুলগুলো পর্যন্ত উৎপাদন করেছে অন্য কোষেরা।

রড কোষ চোখে থাকে। এদের কাজের ঝামেলা কি কম। ক্ষীণতম আলোও কোথাও দেখা গেলে, যেমন তারার ঝিকিমিকি, সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাকড়াও করে, বাড়িয়ে নিয়ে এবং একটা সংকেতে পরিণত করে পাঠিয়ে দেয় মস্তিষ্কে। এই রকম সংকেত বা সিগন্যাল :যদি বেশ কিছু পৌঁছোয় মগজে, তাহলেই 'তারা' টাকে 'দেখতে' পায় মস্তিষ্কের অধিকারী। নরদেহে এই রড কোষেদের সংখ্যা ২৫ কোটি! এই ২৫ কোটির মধ্যে রয়েছে আলো পাকড়াও করার রঞ্জকদ্রব্য সমন্বিত তিন কোটি অণু। ফলে যে বিপুল শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে, সেই শক্তি উৎপাদন করার জন্য আছে কয়েক হাজার মাইটোকনড্রিয়া—সসেজ আকারের অতি-ক্ষুদে পাওয়ার স্টেশন যেখানে জ্বালানি (শর্করা) পুড়িয়ে এনার্জি উৎপাদন করে ফেলা যায় 'ছাই' (জল আর কার্বনডায় অক্সসাইড্)।

অত্যন্ত জটিল এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অ্যাডেনোসিন ট্রাই-ফসফেট (সংক্ষেপে A T P) নামে একটা বস্তুর সংযোগসাধন ঘটায় এরা। রেউচিনি গাছ থেকে মানুষ পর্যন্ত ত্বনিয়ার সবকিছু সজীব বস্তুর সার্বজনীন শক্তির উৎস হল এই জিনিসটাই।

যখনি এনার্জির দরকার হয়—যখনি হৃদযন্ত্রকে স্পন্দিত হতে হয়, নিঃশ্বেস নিতে গিয়ে বুকের খাঁচাকে ফুলে উঠতে হয়, চোখের পাতা ফেলতে হয় —A T P ভেঙে গিয়ে সহজতর উপাদান হয়ে যায়—শক্তিকে ছাড়তে থাকে নিজে ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। জীবদ্দশায় এই এনার্জির আর A T P-র চাহিদাও থেকে যাবে। এমন কি অকাতরে নিদ্রা যাওয়ার সময়ে নরদেহের তৎপরতা থেকে যায় প্রপাতের মতই—স্বপ্ন দেখার জন্যে মস্তিষ্কের কোষকে এনার্জি যোগাতে হয়, রক্ত প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্যে হৃদযন্ত্রের কোষকে স্পন্দিত হতে হয়। A T P-র এই ভাঙা এবং গড়া তাই বিরামহীন।

মাইটোকনড্রিয়া আছে নরদেহের সব কোষের মধ্যেই—উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম রয়েছে শুধু এক জায়গায় লাল রক্ত কণিকায় এরা থাকেনা। কেন থাকে না? কারণ, লাল রক্ত কণিকারা কিছুই উৎপাদন করছে না। রক্ত-প্রবাহে গা ভাসিয়ে শুধু ভেসেই যায়—শক্তির কোনো দরকার হয় না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ঢিলেঢালা হয়ে যায় কেন ?

যে কোষ বিভাজনের ফলে একটি নরদেহের সৃষ্টি, তা কিন্তু অব্যাহত থাকে সারা জীবন। প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ কোষ মরছে—আবার লক্ষ লক্ষ কোষ জন্মাচ্ছে। যে-কোষগুলো আছে, তারাই ভেঙে ত্বটো হচ্ছে—হুবহু একই রকমের ত্বটো—যা থেকে ত্ব'ভাগ হল—ঠিক সেই রকমই। তাদের প্রত্যেকে আবার ত্ব'ভাগ হচ্ছে। চলছে এইভাবে—বিরাম নেই—মৃত্যু যতক্ষণ না হচ্ছে। এদের মধ্যে চর্বিকোষরা নিজেদের নকল বানায় ধীর গতিতে। এদেরকে শুধু ভাঁড়ার কোষ বললেই চলে। কিন্তু চামড়ার কোষরা নকল বানাচ্ছে দশ ঘন্টা অন্তর। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল মস্তিষ্কের কোষ। অন্য সব কোষ মরছে, তাদের জায়গা দখল করছে নতুন কোষ। কিন্তু ব্রেনের কোষ একবার মরলে সে জায়গায় আর নতুন কোষ আসছে না। একটি নরদেহ তার জন্ম মুহূর্তে সারা জীবনের উপযুক্ত মস্তিষ্ক-কোষ নিয়েই জন্মায়। যা পায়, তখনি পায়। যারা জখম হয়ে বা ব্যবহারের ফলে

অক্কা পাচ্ছে, তাদের জায়গায় নতুন কেউ আর আসছে না। তা সত্ত্বেও তা টের পাওয়া যায় না। কেননা, প্রথম বারেই একটি নরদেহ যা পেয়েছে, তা সংখ্যায় এত বেশী যে সারা জীবন ধরে মস্তিষ্কের কোষ নিয়মিত মরলেও অভাবটা চট করে ধরা পড়ে না। বাড়তি কোষ দিয়েই কাজ চলে যায়।

মস্তিষ্কের এই নতুন কোষের জন্ম-দান বিষয়ে অক্ষমতা আজও একটা প্রহেলিকা। যকৃতের টিশু, চামড়া, রক্তের কোষ প্রত্যেকেই নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতি সামলে নিতে পারে পুনরুৎপাদনের দৌলতে। জখম হলে ম্যানেজ করে নেয়। কিন্তু মস্তিষ্ক পারে না—অথচ এই মস্তিষ্কটাই চালাচ্ছে দেহটাকে। ফলে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে একটি নরদেহ প্রতিদিন এক হাজারের বেশী স্নায়ু কোষ হারিয়ে চলেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ওজনও কমে আসে। ভাঁড়ার থেকে বাড়তি কোষের যোগান আসে বলেই রক্ষে—হাজার কোষ মরে তো আর এক হাজার কোষ এসে তাদের কাজ চালিয়ে নেয়।

দিনকে দিন এই ভাবে লোকসান হতে হতে মস্তিষ্কের কোষ ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসে একটু একটু করে। খুব বেশী কোষ হারানোর পর একদিন মানুষটার টনক নড়ে। গন্ধ অনুভূতি কমে আসতে পারে। স্বাদ গ্রহণ করার অনুভূতি ততটা তীক্ষ্ম আর নাও থাকতে পারে। কানে শোনার ব্যাপারটাও কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা হয়ে যায়—পরিষ্কার ভাবে সব শব্দ ধরা যায় না। তখনই মানুষটার খেয়াল হয়। তাই তো, আগের মত সব ব্যাপারে আর তো সজাগ থাকা যাচ্ছে না—সবই যেন ঢিলেঢালা হয়ে যাচ্ছে। নাম মনে থাকছে না—মনে রাখতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। তারিখ আর টেলিফোন নাম্বার চট করে আর মনে পড়ছে না।

মানুষের মস্তিষ্কের ওজন কত ?

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবচেয়ে বড় বিস্ময় কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক। ওজন মোটে তিন পাউণ্ড (১.৪৬ কিলোগ্রাম)। জিলেটিনের মত দেখতে ধূসর আর সাদা টিশুর একটা ব্যাঙের ছাতা যেন। প্রায় দেড় কিলো ওজনের এই মস্তিষ্কের মধ্যে যে অদ্ভুত কর্মকাণ্ড চলছে, তার নকল হওয়ার মত কমপিউটর, মানে, যন্ত্রমস্তিষ্ক আজও বেরোয়নি। এই দেড় কিলোর মধ্যেই আছে তিনকোটি নিউরোন (স্নায়ু কোষ), আর তার পাঁচ থেকে দশগুণ গ্লাইয়াল কোষ।

মাকড়শার মত দেখতে স্নায়ুকোষের কাজ কী ?

মাঠ থেকে এক চাপড়া ঘাস তুলে নিলে দেখা যায়, শেকড়গুলো জট পাকিয়ে আছে—ছাড়ানো যায় না। ঠিক তেমনি ভাবে জট পাকিয়ে রয়েছে মস্তিষ্কের কোটিকোটি স্নায়ুকোষ বা নিউরোন—অন্যান্য যাদের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে রেখেছে, সংখ্যায় তারা ৬০,০০০ গুণ তো বটেই !

প্রত্যেকটা স্নায়ুকোষকে দেখতে অনেকটা মাকড়শার মত।—সরু সরু সুতো বা তন্তুর গায়ে যেন আটকে আছে। মাকড়শার পা হল ডেনড্রাইট—যার মধ্যে দিয়ে স্নায়ুকোষে খবর যাচ্ছে ; আর সরু তন্তু হল অ্যাক্সন—যার মধ্যে দিয়ে স্নায়ুকোষের খবর বাইরে যাচ্ছে। লাগোয়া নিউরোনের সিগন্যাল তুলে নেয়—পাঠিয়ে দেয় কোষদেহে, কোষদেহের সিগন্যাল নেমে আসে তন্তু বেয়ে—ঘন্টায় ২২৫ মাইল বেগে !

এক একটা সিগন্যাল যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সেকেণ্ডের দু'হাজার ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে নতুন করে রাসায়নিক পন্থায় নিজেকে শক্তিমান (রিচার্জ) করে নেয় তন্তু। কখনোই কোথাও একটা নিউরোনের সঙ্গে আর একটা নিউরোনের ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে না ; সিগন্যালগুলো যাচ্ছে—ফাঁকের মধ্যে দিয়ে স্ফুলিঙ্গের (স্পার্ক গ্যাপ) লাফিয়ে যাওয়ার কায়দায়, প্রতিবার ফায়ারিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক ভাবে (কেমিক্যালি) একটা স্নায়ু যোগাযোগ করছে আর একটা স্নায়ুর সঙ্গে।

সবচেয়ে লম্বা গাছ কোনটা ?

গাছ হল সবুজ উদ্ভিদ। তাদের শেকড় আছে, গুঁড়ি আছে, পাতা আছে, আর আছে বীজ—অন্যান্য সবুজ উদ্ভিদের মতই। সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এই গাছেরা। উত্তর পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের কিছু সিকোইয়া (Sequoia) গাছের বয়স চার হাজার বছরেরও বেশী। তার মানে, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার আগেই পুরোপুরি বৃদ্ধি পাওয়া গাছ !

সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ও বটে এই গাছেরা। ক্যালিফোর্নিয়ার দানব রেডউড গাছ আজকের পৃথিবীতে দীর্ঘতম গাছ। ওখানকার হামবোলড্ট ন্যাশন্যাল ফরেস্টের একটা গাছ নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা বৃক্ষ। এর নাম ফাউণ্ডার্স বৃক্ষ এবং উচ্চতায় ৩৬৪ ফুট !

অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস, বহু আগে ক্যালিফোর্নিয়ার রেডউড বৃক্ষের মতই

লম্বা ছিল অস্ট্রেলিয়ার ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ ; কিন্তু বর্তমানে যে ইউক্যালিপটাস গাছ হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ায় সেগুলো গড়ে পঞ্চাশ ফুট ছোট রেডউডের চেয়ে। রেডউডের কাছাকাছি আসে এমনি আরও দু ধরনের গাছ আছে—ডগলাস ফার আর সিকোইয়া—এদের মধ্যে কিছু গাছ তিনশ ফুটেরও বেশী লম্বা হয়।

গাছের শেকড় মাটি থেকে যে কেবল খনিজ বস্তু আর জল নেয় তা নয়—গাছটিকে শক্ত করে আটকে রেখে দেয় মাটির সঙ্গে। খুব বড় গাছের ক্ষেত্রে গাছটাকে মাটি আঁকড়ে সিধে রাখার জন্যে শেকড়ের ব্যবস্থাও হয় ব্যাপক। জানো কী, গাছের চুড়ো বা ডগা যতটা জায়গা নেয় শূন্যে, ততটা জায়গাই মাটির মধ্যে দখল করে গাছের শেকড়?

বৈজ্ঞানিকরা জেনে গেছেন কিভাবে গাছের বয়স বার করতে হয় কাঠের গায়ে মণ্ডল বা বৃত্ত গুণে। অধিকাংশ ধরনের গাছের গুঁড়িকে আড়াআড়ি ভাবে কেটে ফেললে পরের পর মণ্ডল (Ring) দেখতে পাওয়া যায়। প্রতি বছরেই পুরোনো কাঠের বাইরের দিকে নতুন কাঠের একটা স্তর সৃষ্টি হয়। স্তরটা তৈরী হয় গাছের ছালের ঠিক তলায়। এই স্তরটাই মণ্ডল হয়ে দাঁড়ায়। গুঁড়ির কাঠে এরকম Ring যতগুলো থাকবে বুঝতে হবে গাছের বয়স তত বছর। যতই নতুন Ring বা স্তর তৈরী হয়। ততই গুঁড়িটা চারপাশে বড় হতে থাকে।

শাখা আর পল্লবেও Ring তৈরী করে যায় বৃক্ষ—শুধু গুঁড়িতে নয়। ফি বছরে শাখা আর পল্লবের ডগাও বাড়ে একটু একটু করে। যেহেতু শাখাদের বৃদ্ধি ঘটে কেবল ডগার দিকে, শুরুতে বৃক্ষের তরু শাখা যেখানে থাকে—তার বেশী আর কখনোই এগোয় না।

'পীট' কাকে বলে?

পীট মানে জলাভূমিতে পচা উদ্ভিজ্জ পদার্থ। পীট কয়লা নয়। কয়লা সৃষ্টির প্রথম ধাপ বলা যেতে পারে পীটকে।

কোটি কোটি বছর আগে উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় জলাভূমিময় জঙ্গলে যে সব প্রাচীন বৃক্ষ আর উদ্ভিদ জন্মেছিল, তাদেরই দেহাবশেষ আজকের কয়লা। জলাভূমিতে পড়ে যাওয়ার পর এই সব গাছ আর উদ্ভিদের কিছু কাঠকে জীবাণুরা আক্রমণ করে গ্যাসে পরিণত করে এবং সে গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে রেখে যায় একটা কালো মিশ্রণ যার বেশীর ভাগই কার্বন। অনেক বছর

পরে ওপরকার কাদা আর বালির চাপে বেশীর ভাগ জলীয় পদার্থ বেরিয়ে যায় মিশ্রণ থেকে, পড়ে থাকে একটা কাদাটে বস্তু—একটু একটু করে তা শক্ত হয়ে কয়লায় পরিণত হয়।

এই প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েক হাজার বছর লাগে। কিন্তু কয়লা তৈরীর এই প্রথম পর্যায়টা কিভাবে হয়ে চলেছে, আজও তা দেখা যায়। ভার্জিনিয়া আর নর্থ ক্যারোলিনার সুবিশাল জলাভূমিময় অঞ্চলে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর প্রদেশগুলোয় আর কানাডার হাজার হাজার জলাভূমিতে পীট তৈরী হয়ে চলেছে।

এই সব জলায় গাছপালা একটু একটু করে নষ্ট হয়ে গিয়ে সে জায়গায় রেখে যাচ্ছে বেশীর ভাগই কার্বন। বছর কয়েক এই ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হচ্ছে বাদামী রঙের জটপাকানো পত্র, শাখা আর পল্লব, একেই বলে পীট। জলাভূমির জল চলে গেলে পাটকে চাঁই আকারে কেটে নিয়ে শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে পোড়ানো হয়।

জমির পীটে প্রায় তিন চতুর্থাংশ জল থাকে, তাই পীটকে শুকোনো একান্ত দরকার। আয়ার্ল্যাণ্ডে পীট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; উন্নত পর্যায়ের কয়লার দাম বেশী বলে অর্ধেকেরও বেশী খামারবাড়ী জ্বালানির জন্যে পুরোপুরি নির্ভর করে পীটের ওপর।

এই পীট উন্নত হয়ে কয়লার অন্যান্য পর্যায়ে পৌঁছোয়। যেখানে আছে, পীটকে সেখানেই রেখে দিলে আস্তে আস্তে তা পালটে গিয়ে লিগনাইট অথবা বাদামী কয়লা হয়ে যায়। লিগনাইট করলার চেয়ে শক্ত, কিন্তু সেরকম শক্ত নয় বলেই বহুদূর পথে চালান করার সময়ে তা গুঁড়িয়ে যায়।

পীট বা লিগনাইটের পরবর্তী চেহারা হল নরম কয়লারা বা বিটুমিনাস আলকাতরা পেট্রলিয়াম প্রভৃতি দাহ্য খনিজ পদার্থ বিশেষ)। রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে লিগনাইট থেকে এর উৎপত্তি—হাজার হাজার বছর ধরে মাটির চাপও দরকার হয়। কয়লা পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একজন এই বিটুমিনাস কয়লা। এ জিনিস পোড়ে সহজে এবং পাওয়াও যায় অঢেল—এতে কার্বন থাকে শতকরা ৭৫ থেকে ৮৫ ভাগ।

বিটুমিনাস কয়লা মাটিতে থেকে গেলে এবং যথেষ্ট পরিমাণে চাপের মধ্যে থাকলে, আস্তে আস্তে পালটে গিয়ে কঠিন কয়লা বা অ্যানথ্রাসাইট হয়ে যায়। অ্যানথ্রাসাইট পুড়লে ধোঁয়া বেরোয় অতি অল্প এবং পোড়ে বিটুমিনাস কয়লার চেয়ে অনেকক্ষণ ধরে।

বাদামী কয়লা কাকে বলে ?

নতুন এনার্জি বা শক্তির উৎস সন্ধানে বৈজ্ঞানিকরা জোর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাদের মধ্যে অন্যতম এই গবেষণা। পৃথিবীটার কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কেবলমাত্র আরও সস্তা এবং আরও কার্যকরী শক্তির উৎস সন্ধানের জন্যেই এই গবেষণা নয়, গবেষণার দরকার আরও এই কারণে যে শক্তির প্রাকৃতিক উৎস যে ক'টা এখনো আছে —শেষ পর্যন্ত তা একদিন ফুরিয়ে যাবেই।

পরিত্যক্ত কয়লাখনি কখনো দেখেছো ? এক সময়ে সেখান থেকে কয়লা তুলে বিরাট বিরাট চুল্লি জ্বালানো হয়েছে, উনুন জ্বালানো হয়েছে, শীতের দেশে বাড়ী গরম রাখা হয়েছে। কিন্তু এখন সেখানে তোলবার মত যথেষ্ট কয়লা আর নেই।

মানুষ আজ পর্যন্ত যে সব নিরেট শক্ত জ্বালানি কাজে লাগাচ্ছে তার মধ্যে আজও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি এই কয়লা। যুক্তরাষ্ট্রে যত জ্বালানির প্রয়োজন, তার অর্ধেক শুধু কয়লা।

বিভিন্ন ধরনের কয়লা নিয়ে আলোচনা করা যাক। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, যে বস্তুটি তৈরী হতে কোটি কোটি বছর লেগেছে, তা কখনোই একই ভাবে একই অবস্থায় থাকতে পারে না পৃথিবীর সর্বত্র।

উদাহরণস্বরূপ, কয়লাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স হল পীট-য়ের। তার মানে, যে উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে পীট সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো মাটি চাপা পড়েছিল কম সময়ের জন্যে—অন্যান্য কয়লাদের মত অত বেশী সময় মাটির তলায় তারা চাপা পড়েনি। যাবতীয় নিরেট শক্ত জালানির মধ্যে পীট-য়ের তাপমান সবচেয়ে কম।

লিগনাইটকে কখনো সখনো বাদামী কয়লা বলা হয়। পীট-য়ের চেয়ে একটু বেশী বয়স লিগনাইটের এবং তাপমানও বেশী।

সব রকম নিরেট শক্ত জ্বালানির মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাপমান আছে বিটুমিনাস কয়লার। সবশেষে আছে অ্যানথ্রাসাইট কয়লা—কয়লাদের মধ্যে কঠিনতম এবং প্রকৃতির মধ্যে প্রধানতম।

ল্যাটিন ভাষায় লিগনাম মানে কাঠ। এই শব্দ থেকেই এসেছে লিগনাইট। লিগনাইট হল গিয়ে কাঠ আর কয়লার মাঝামাঝি অবস্থা—এক ধরনের পীট। কিন্তু এতে থাকে শতকরা ৭০ ভাগ কার্বন এবং পীট-য়ের চেয়ে জ্বালানি হিসেবে লিগনাইটের কদর বেশী।

অ্যানথ্রাসাইটকে আদর্শ কয়লা বলা হয় কেন ?

লিগনাইটে কার্বন আছে শতকরা ৭০ ভাগ, বিটুমিনাস কয়লার আছে শতকরা ৭৫ থেকে ৮৫ ভাগ ; কিন্তু অ্যানথ্রাসাইট কয়লায় থাকে শতকরা ৯৫ ভাগ।

পাতালের গভীরতম অঞ্চলে অ্যানথ্রাসাইট কয়লা সৃষ্টি। ওপরে স্তরে স্তরে পাথর থাকে বলে চাপ পড়ে প্রচণ্ড—তাছাড়াও স্তর ভাঁজ হয়ে গিয়ে পাহাড় সৃষ্টি করার সময়ে চাপ পড়ে আরো বেশী। সেই কারণেই বৃটেনের অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায় ওয়েলসয়ের মত পাহাড়ি জেলাগুলোয়। সহজেই যা উবে যায়, এমনি বস্তু অতিশয় কম পরিমাণে থাকে অ্যানথ্রাসাইট কয়লায়, তাই এই কয়লা পোড়ে প্রায় ধূমহীন শিখায়, অথচ অনেকক্ষণ ধরে জ্বলতে থাকে এবং উত্তাপ ছাড়তে থাকে ; এই কারণেই বাষ্প উৎপাদনের জন্যে বয়লারে ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ কয়লা বলা হয়, অ্যানথ্রাসাইট কয়লাকে। অ্যানথ্রাসাইট তুর্লভ এবং খনি থেকে তোলাও কঠিন। সেই কারণেই তুমূর্ল্য এবং বিশেষ কাজে ছাড়া ব্যবহার করা হয় না।

চীনেম্যানরা বেণী রাখত কেন ?

প্রতিবেশী রাস্ট্ররা চীনদেশকে হিংসে করত আর যখন তখন আক্রমণ চালাতো বলে চীনের প্রাচীরের সৃষ্টি খৃস্টজন্মের ৩০০ বছর আগে। চীন দেশের সব বড় শহর কেই এই ধরনের উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হত—রাত্তির হলে ফটক বন্ধ করে দেওয়া হত—যাতে অতর্কিত আক্রমণে কচুকাটা না হয়ে যায় নাগরিকরা। তা সত্ত্বেও প্রতিবেশীরা বহুবার চীন দখল করেছে এবং নতুন রাজ বংশের পত্তন করেছে।

এই সব রাজবংশের কেউ কেউ ভালভাবে দেশশাসন করে চীনের সীমান্ত আরো বাড়িয়েছে, কেউ কেউ কুশাসন চালিয়ে বিপ্লব অথবা বাইরের শত্রুর আক্রমণ ডেকে এনেছে, শেষকালে রাজ্য পাট হারিয়েছে।

১৬৪৪ সালে উত্তর পূব থেকে মাঞ্চুরা যখন চীনদেশ আক্রমণ করে, তখন চীনদেশের শাসক মিঙ রাজ বংশের প্রতাপ অনেক কমে এসেছে। সৈন্য-বাহিনী পর্যন্ত তৈরী ছিল না শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে, সরকারও তুর্বল।

কাজেই মার খেয়ে পতন ঘটল মিঙ রাজবংশের।

প্রথম দিকে ঘৃণার পাত্র হয়ে থেকেছে মাঞ্চুরা। ফলে কড়া এবং নির্মম ভাবে দেশ শাসন করতে হয়েছে তাদের। কড়া শাসনের অন্যতম হল চীনদেশের মেয়ে পুরুষ উভয়কেই লম্বা চুল রাখতে হবে। চুল যখন খুব লম্বা হবে, তখন বিনুনী বেঁধে বেণীর আকারে ঘাড়ে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এর ফলে যখনি কোনো গোলমাল দেখা দেবে কারা চীনে আর কারা মাঞ্চু তা অনায়াসেই বুঝে নেওয়া যাবে। এ ছাড়াও বন্দীর বেণী ধরে টেনে নিয়ে যেতেও অনেক সুবিধে। প্রথম প্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠলেও শেষের দিকে দেখা গেল প্রথাটাকে সবাই গ্রহণ করেছে।

১৯১১ সালে মাঞ্চু বিদ্রোহের পর মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটবার পরে যখন গণতন্ত্র সরকার বেণী কেটে ফেলে ছোট চুল রাখতে আদেশ দিল—ঠিক যেমনি ছিল মাঞ্চুরা আসবার আগে—তখন হাজার হাজার চীনে রুখে দাঁড়াল এই আদেশের বিরুদ্ধে—যেমনটি দাঁড়িয়েছিল তাদের পূর্বপুরুষরা বেণী রাখতে হবে শুনে!

চীনের প্রাচীর কত লম্বা?

চীনদেশে একটা প্রবাদ ছিল। মানুষ যেদিন চাঁদে পৌঁছোবে এবং পৃথিবীর দিকে ফিরে তাকাবে, তখন যে জিনিসটা অতি সহজেই সে দেখতে পাবে—তা হল চীনের প্রাচীর (Great Wall of China)

চীনের প্রাচীর ইঁট আর পাথর দিয়ে তৈরী। লম্বায় ১৪০০ মাইল! খৃস্টজন্মের ৩০০ বছর আগে মঙ্গোলিয়ায় তাতার আক্রমণ রুখবার জন্যে এ পাঁচিলের সৃষ্টি। প্রাচীরের উচ্চতা ২০ থেকে ৩০ ফুট। দুশ গজ অন্তর ৩০ থেকে ৬০ ফুট উঁচু একটা মিনার আছে। প্রাচীরের ওপরদিকটা ১৫ থেকে ২৫ ফুট চওড়া। চীনদেশের প্রায় সব বড় শহরই এই ধরনের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ থেকে রাত্রে নগরবাসীদের রক্ষে করার জন্যে। প্রাচীরের ফটক বন্ধ রাখা হত রাত্রে।

মতান্তরে ইয়োলো সী থেকে পশ্চিম দিকে জেড গেট পর্যন্ত চীনের প্রাচীর লম্বায় ১৬৮৪ মাইল। খৃস্টজন্মের ২১৪ বছর আগে চীনের সম্রাট শি হুয়াঙ তি চীনের প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেন চীনের উত্তর অঞ্চল সুরক্ষিত রাখার জন্যে। এই দিক থেকেই ভয়াল মঙ্গোল ঘোড়সওয়ার হুনরা আসত রাজ্যে হানা

দিতে। বহু শতাব্দী পরে এই হুনরাই পতন ঘটিয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যের। হাজার হাজার ক্রীতদাস দিনরাত খেটেছিল পালা দিয়ে। চীনের প্রবাদ বলে, প্রাচীর নির্মাণ শেষ হওয়ার পর দেখা গিয়েছিল মারা গেছে দশলক্ষেরও বেশী ক্রীতদাস !

শহর সুরক্ষিত রাখার জন্যে প্রাচীর নির্মাণ নতুন কিছু নয় কিন্তু সম্রাট শি হুয়ান তি গোটা সাম্রাজ্যটাকেই সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন প্রাচীর দিয়ে ঘিরে !

প্রাচীর নির্মাণ শুরু হওয়ার চার বছর পরে মারা যান সম্রাট। কিন্তু তাঁর উত্তরসুরীরা শেষ করেন নির্মাণকার্য। দু হাজার বছর পরেও পিকিংয়ের উত্তরে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় বিশাল এই প্রাচীরকে।

চীনের প্রাচীরই একমাত্র মানবসৃষ্ট কীর্তি যাকে দেখা যায় মহাকাশ থেকে !

কম কীর্তি নয় এটা !

চীনেমাটি কি চীনদেশেরই মাটি ?

পোর্সিলেন তৈরী করতে গেলে যে সাদা কাদামাটির দরকার হয়, তার দুটো নাম। যেহেতু চীনেরাই প্রথম এই বস্তুটির ব্যবহার করেছিল, সুতরাং এর নাম চায়না-ক্লে বা চীনে মাটি, আবার যেহেতু প্রথম দিকের চীনে মাটির বাসনপত্র চীনদেশের যে বিখ্যাত বাসনপত্র তৈরীর অঞ্চলে তৈরী হয়েছিল, তার কাছেই পাহাড়টার নাম কেয়ো-লিঙ (Kao-ling), তাই বস্তুটার আরেক নাম কেয়োলিন।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও পরে পাওয়া গিয়েছিল চীনেমাটি। কিন্তু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভালো জাতের চীনেমাটির বিরাট সঞ্চয় যেখানে, সেখানে পাওয়া যায় না। বৃটেনের কর্ণওয়াল আর ডেভেনের পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় দশ কোটি টনের মত আছে। আর আছে চেকোশ্লাভাকিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র আর জাপানে।

প্রাকৃতিক বিগলন আর বিকৃতির ফলে খনিজ পদার্থ ফেল্‌স্‌পার শেষ পর্যন্ত চীনেমাটি হয়ে দাঁড়ায়। গ্র্যানাইট এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য পাথরের অন্যতম মূল খনিজ পদার্থ এই ফেল্‌স্‌পার। এই বিগলন আর বিকৃতির যে প্রক্রিয়া একে বলা হয় কেয়োলিনাইজেসন, এর ফলে যে কাদামাটি খনিজ পাওয়া

যায়, তার নাম কেয়োলিনাইট , এর মধ্যে থাকে শতকরা ৪৬ ভাগ সিলিকা, ৪০ ভাগ অ্যালিউমিনা , এবং ১৪ ভাগ জল। কিছু চীনেমাটির মধ্যে সামান্য পরিমাণে আরেকটা কাদামাটি খনিজ থাকে (মন্টমোরিল্লোনাইট)—যার দৌলতেই নাকি চীনেমাটি আরো বেশী নমনীয় হয়।

ইংলণ্ডের পশ্চিমে গ্র্যানাইট স্তূপ জায়গায় জায়গায় কেয়োলিনে পরিণত হয়েছে। কার্বনডায়অক্সাইড, বোরন ও ফ্লোরিন কম্পাউণ্ড সমূহ, অতি-উত্তপ্ত বাষ্প ইত্যাদি উত্তপ্ত গ্যাস আর বাষ্প ইত্যাদি ভূস্তর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে গ্র্যানাইটের ফেল্‌স্‌পার ক্রিস্ট্যালকে আক্রমণ করেছে এবং কঠিন পাথরকে নরম নমনীয় পিণ্ডে পরিণত করেছে।

চীনামাটির ব্যবহার অনেক রকম। সাধারণ মানুষের ধারণা, চীনেমাটির ব্যবহার মূলতঃ বাসনপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে। ধারণাটা ভুল। চীনেমাটির যা উৎপাদন, সম্ভবতঃ তার এক চতুর্থাংশের বেশী বাসনপত্র তৈরীর কাজে লাগে না। বেশীর ভাগটা ব্যবহার করা হয় আর্ট পেপার থেকে ওয়ালপেপার পর্যন্ত বিভিন্ন রকম কাগজ উৎপাদনে।

এছাড়াও কয়েক ধরনের রবার, রঙ, সাদা সিমেন্ট, ইলেকট্রিক-সেরামিক্স, রিফ্র্যাকটরিজ, কেমিক্যাল, প্রসাধন দ্রব্য এবং ওষুধপত্র তৈরীর সময়েও কেয়োলিনের প্রয়োজন হয়। পুলটিস তৈরীর কাজেও লাগে কেয়োলিন।

চীনদেশের গণৎকাররা কম্পাস ব্যবহার করত কী ?

চীনদেশই যে ম্যাগনেটিক কম্পাসের প্রথম আবিষ্কারক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক কবে কম্পাস তৈরী হয়েছিল প্রথম এবং কবেই বা নৌচালনার উদ্দেশ্যে কম্পাসের ব্যবহার শুরু হয়েছিল সে দেশে, তা সঠিক জানা যায় না। তার কারণ সম্ভবতঃ ভবিষ্যতের ঘটনা বলবার জন্যে চীনেরা প্রথম কাজে লাগিয়েছিল কম্পাসকে !

ম্যাগনেটিক কম্পাসের সর্বপ্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ১০৪০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত একটি চৈনিক-বিশ্বকোষে। ১১১৫ খৃষ্টাব্দের একটি বিবরণে জানা যায় সমুদ্রে চৈনিক নাবিকরা ম্যাগনেটিক কম্পাস ব্যবহার করেছিল —এর আগেকার আর কোনো উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় নি।

আগেকার চৈনিক কম্পাস তৈরী হত লোডস্টোন অর্থাৎ ম্যাগনেটিক

আয়রণ অক্সাইডের একটা টুকরোকে চামচের আকারে অর্ধেক ফোঁপরা করে এবং তাকে জলে ভাসিয়ে। ভাসমান লোডস্টোন পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের আওতায় এসে সব সময়েই উত্তর দক্ষিণ চৌম্বক অক্ষরেখা বরাবর ঘুরে যেত। চুম্বকের এই ধর্ম নিশ্চয় চৈনিক গণৎকাররা জানত। তাই নিজেদের ভবিষ্যদ্‌ বাণী 'মিলিয়ে' দিত লোডস্টোনের কাঁটা দিয়ে। পরে চীনে ম্যানরা শিখে নিয়েছিল কিভাবে লোডস্টোনের সঙ্গে ঠুকে অথবা গরম করে লোহাকেও চুম্বকে পরিণত করা যায়।

ভাসমান লোডস্টোন কম্পাস ছিল বড় ভজঘট ধরনের। তাই চৈনিকরা পরে মাছের আকারের ভাসমান কাঠের ওপর লোডস্টোন খণ্ড অথবা চুম্বকে পরিণত লৌহখণ্ড বসিয়ে কম্পাস বানিয়ে নিত। প্রথম জাহাজী কম্পাসের যে খবর আজ পর্যন্ত আমাদের জানা আছে, তার কাঁটাও নির্মিত হয়েছিল মাছের আকারে এবং মৎস্যাকৃতি কাঁটা বসানো থাকত খাড়াই কীলক বা আলের (Pivot) ওপর। অবশ্যই শান্ত সমুদ্রে ছাড়া এ ধরনের কম্পাস ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না।

ইউরোপ এবং ইসলাম-ধর্মী দেশগুলোয় কম্পাসের ব্যবহার কবে শুরু হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় নি। বৃটেনের মানুষ আলেকজাণ্ডার নেক্‌কাম-য়ের (১১৫৭-১২১৭) একটি রচনায় ইউরোপে কম্পাসের প্রথম একটি বিবরণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং আইস ল্যাণ্ডে কম্পাসের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয়। ১২৩২ খৃস্টাব্দের আগে ইসলাম-ধর্মী নাবিকরা যে কম্পাস ব্যবহার করত, তার সঠিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরবরা কম্পাসের নাম দিয়েছিল al kanbas, কিন্তু শব্দটা আরবী শব্দ নয়—সম্ভবত ইটালী শব্দ থেকে ধার করা। ইসলামধর্মীরা প্রথমে যে কম্পাস ব্যবহার করেছিল, সেটি কিন্তু চীনদেশের প্রথম কম্পাসের মত মৎস্যাকৃতি। এই সব ঘটনা থেকেই ঐতিহাসিকদের ধারণা, ইউরোপীয়রা ম্যাগনেটিক কম্পাসের ব্যবহার জানতে পারে মধ্য এশিয়ার মধ্য দিয়ে চীনেদের সংস্পর্শে আসার পর এবং দক্ষিণ চীন সমুদ্রে ইউরোপীয়দের কাছ থেকে ইসলাল নাবিকরা কম্পাসের ব্যবহার শিখে নেয়।

দূর সমুদ্রে পাড়ি জমাতে হলে কম্পাস অপরিহার্য। কেননা, কম্পাসের কাঁটা সব সময়ে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দরুণ উত্তর-দক্ষিণ বরাবর থাকবেই। আর উত্তর দিক জানা গেলে পথভ্রষ্ট নাবিকরা অনায়াসেই বার করে নিতে পারবে দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কোনদিকে।

কিন্তু এহেন একটা প্রয়োজনীয় যন্ত্রকেই প্রথম আবিষ্কারকরা ব্যবহার করেছিল লোক ঠকানোর জন্যে!

কোন্ নদীর নাম 'চীনের দুঃখ' ?

চীনদেশটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দেশ। ও দেশের ইয়োলো রিভারে জল বাড়লেই দুকূল ছাপিয়ে খেত খামার ডুবিয়ে বহু জীবনহানি করে ধনেপ্রাণে মারে প্রচুর মানুষকে। তাই একজন চীনের সম্রাট ইয়োলো রিভারের নাম দিয়েছিলেন 'চীনের দুঃখ'।

কোন কৃষক রাজা হয়েও স্বেচ্ছায় ফিরে গেছিলেন চাষের কাজে ?

লুসিয়াস কুইটিয়াস সিনসিনাটাস ছিলেন ছোটখাট কৃষক। যিশুখৃস্ট জন্মানোর ৪৫৮ বছর আগে গ্রাম থেকে তাঁকে ডেকে আনা হয় হানাদার ঈকুইয়ানদের মেরে তাড়িয়ে রোমের নিরঙ্কুশ একনায়ক হওয়ার জন্যে। উনি সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। সক্ষম যুবকদের সংগ্রহ করে হানাদারদের হটিয়ে দিয়ে রোমের নিরঙ্কুশ এক নায়ক (Dictator) হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র ষোল দিন পরে সব ছেড়েছুড়ে ফিরে গেছিলেন চাষের কাজে।

আমেরিকার ওহিও-তে সিনসিনাটি শহরের নামকরণ হয়েছে এই ত্যাগী বীরের নামানুসারে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্তন অফিসাররা সিন-সিনাটাস-কে হিরো বলে স্বীকার করেছিলেন।

দানব-শকুন কত বড় ?

শকুনদের মধ্যে বৃহত্তম শকুনের নাম কনডর (সারকোর‍্যামপাস গ্রাইফাস), নিবাস পেরু আর চিলি'র অ্যানডিজ পর্বতের হাজার হাজার ফুট ওপরে। পুরোপুরি বৃদ্ধি পাওয়া একটা কনডর ডানা মেলে ধরলে ডানার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মাপ দাঁড়াবে ৮ থেকে ১১ ফুট!

গলিত পচা মাংসই কনডরের মূল খাদ্য ; কিন্তু মেষশাবক আর বাছুর পর্যন্ত আক্রমণ করে সুযোগ পেলে।

নিচের প্রান্তরে যখন কোন জানোয়ার মরতে বসে, বহু হাজার ফুট শূন্যে ঘুরপাক দিতে থাকে কনডর—অত বড় পাখাটাকেও নিচ থেকে বিন্দুর মত

দেখায়। কনডরের ওড়ার ক্ষমতার মত দেখবার ক্ষমতাও অসাধারণ। আচম্বিতে সোজা গোঁৎ খেয়ে নেমে আসে শিকার লক্ষ্য করে এবং চারদিক থেকে অন্য কনডরেরাও ধেয়ে আসে মহাভোজে মত্ত হতে।

কনডরের পালক কালো, কিন্তু সাদাটে ছোপ থাকে। মাথা আর ঘাড় চাঁচা ছোলা, চামড়া বিবর্ণ এবং গা ঘিনঘিনে, এবং একটা সাদা রঙের ঝালর নেমে এসেছে ঘাড়ের গোড়া থেকে পালক যেখানে শুরু হয়েছে—সেই পর্যন্ত। পুরুষ কনডরের মাথায় কুঞ্চিত মাংসের ঝুঁটি থাকে চঞ্চুর পেছনে কপাল পর্যন্ত। দুর্গম পাথরের খাঁজে দুটো ডিম পাড়ে মেয়ে কনডর—ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় সাত হপ্তার মধ্যে। ক্ষুদে কনডরদের বৃদ্ধি ঘটে আস্তে আস্তে; এক বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত উড়তে পারে না।

চীনদেশের প্রথম সাধু কাকে বলা হয়?

চৈনিক দার্শনিক কনফুসাস্ শিষ্যদের নিয়ে চলেছেন। একটা কবর-খানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে দেখলেন একটা নতুন কবরের সামনে কাঁদছে একজন স্ত্রীলোক। একজন শিষ্যকে কনফুসাস্ পাঠালেন মেয়েটির কান্নার কারণ জেনে আসতে। মেয়েটি বললে—"আমার শ্বশুরমশাইকে বাঘ মেরেছে, আমার স্বামীকেও মেরেছে, এখন মারল আমার ছেলেকেও।" শিষ্যরা জিজ্ঞেস করলে, এরকম মারাত্মক জায়গায় তা সত্ত্বেও থাকা হচ্ছে কেন? এখুনি এ স্থান ত্যাগ করা উচিত নয় কি? মেয়েটি জবাব দিলে—"আছি তার কারণ এখানে কোনো অত্যাচারী সরকার নেই।"

শিষ্যদের ডেকে কনফুসাস্ তখন বললেন—"শুনলে তো? মনে রেখো, বাঘের চাইতেও বেশী ভয় অত্যাচারী সরকারকে।"

এইভাবেই সামন্ত যুগে বাস করে অনেক অন্যায়ের প্রতিকার করার চেষ্টা করেছেন কনফুসাস্ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে, চেষ্টা করেছেন সাধারণ মানুষ যাতে সৎভাবে জীবনযাপন করতে পারে। নিজের সম্বন্ধে বলতেন—"আমি তো শুধু যন্ত্র—যন্ত্রী নই।" ওঁর দেড় হাজার বছর আগে লেখা কবিতা, সঙ্গীত এবং ঐতিহাসিক রচনা সংগ্রহ করে সম্পাদনা করতেন। বলতেন, ঐ যুগই ছিল স্বর্ণ যুগ। নিজেকে সাধারণ মানুষের বেশী কিছু বলে দাবী করেননি কনফুসাস্। মৃত্যুর পর তিনি শ্রদ্ধেয় হয়েছেন। তাঁর নামে চীনের সব

শহরেই মন্দির নির্মিত হয়েছে। অনেক মতে বিশ্বাসী চীনদেশের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করা হয় তাঁর উপদেশ এবং শিক্ষাকে। কনফু-সাসের মতে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা গোটা এশিয়ায় প্রায় ৩৫ কোটি। সাধারণ মানুষ তাঁকে চীনের প্রথম সাধু আখ্যা দিয়েছে।

কনফুসানিজম্‌কে একটা ধর্মমত বললেও আসলে সৎ আচরণের কিছু বিধি ছাড়া কিছুই নয়। কনফুসাস্‌ নিজেও ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলেননি—বলেছেন ভাল হওয়া নিয়ে। প্রকৃত পক্ষে, কোনো দেবতা সম্বন্ধেই উনি কিছু শিক্ষা দেননি। খুব সোজা ভাবে শুধু বলেছেন—দেবতাদের সম্মান করো কিন্তু তাদের নিয়ে যত কম মাতামাতি করা যায় ততই ভাল। ওঁর সমস্ত মনোযোগে ছিল কি ভাবে এই জীবনেই মানুককে আরও ভাল করে তোলা যায়। ওঁর জ্ঞানগর্ভ উক্তিগুলোও বাইবেলের মতন। উনি মানুষকে বলেছেন যাঁরা উচ্চাসন আসনে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাঁদের অনুগত থেকো, এবং নিজে সৎ, সোজা, আত্মবিশ্বাসী থেকো। বলতেন "তোমার প্রতি অন্যের যে আচরণ তোমার ভাল লাগে না, সে আচরণ অন্যের প্রতি করতে যেও না।" সুন্দর আচরণ একান্তই প্রয়োজন—বলতেন কনফুসাস; সুন্দর আচরণ এবং সুন্দর সঙ্গীত পরস্পর সম্পর্কিত—দুটোই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কনফুসাসের উপদেশে চীনদেশের মানুষের একদিক দিয়ে যেমন উপকার হয়েছে, আর একদিক দিয়ে গোটা দেশটার প্রগতি আটকে গেছে তাঁর একটি উপদেশের জন্যে; উনি বলতেন, বর্তমান যা আছে অথবা ভবিষৎ যা হবে—তার চাইতে অনেক ভাল অতীত; বলতেন, পূর্ব-পুরুষদের ঈশ্বরের পূজা করো, বিনা প্রতিবাদে বা প্রশ্নে সরকারের প্রতি অনুগত থাকাই দেশের লোকের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ফলে, সাধারণতঃ চীন দেশের মানুষ ভাবে পূর্ব পুরুষদের ক্ষেত্রে যা ভাল ছিল, ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই ভাল হবে। কনফুসাসের শিক্ষার বিরুদ্ধে একাধিকবার বিদ্রোহ করেছে চীনদেশ, আবার ফিরে এসেছে সেই শিক্ষাতেই।

দার্শনিক কনফুসাসের চৈনিক নাম ছিল কুং ফুজু, মানে দার্শনিক কুং। ল্যাটিন ভাষায় নামটা এসে দাঁড়িয়েছে কনফুসাসে। লু প্রদেশে (এখন-কার 'সানতুং') তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন গরীব এবং মারা যান কনফুসাসের তিন বছর বয়েসে। বিয়ে করেন ১৯ বছর বয়েসে, এটা ওটা নানান ধরনের কাজ করার পর ২২ বছর বয়েসে শুরু করেন জীবনব্যাপী সাধনা—মানুষকে

ভাল করা, সমাজকে সুস্থ সুন্দর করা।

খৃস্টপূর্ব ৫০১ সালে ' লু ' প্রদেশে গভর্নর হয়েছিলেন কনফুসাস। তারপর চীফ ক্রিমিন্যাল বিচারপতিও হয়েছিলেন। কিন্তু দেশের শাসনব্যবস্থা মনে না ধরায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বারো বছরেরও বেশী দেশে দেশে ঘুরে উপদেশ দেন মানুষকে, অংশ নেন তর্কযুদ্ধে।

৬৮ বছর বয়েসে ফিরে আসেন জন্মস্থানে—কিন্তু সরকারী কাজ আর নেননি। নির্জন এক উপত্যকায় শিষ্য পরিবৃত হয়ে কাটিয়ে দেন শেষ জীবন।

আমরা খাবার রাঁধি কেন ?

আগুন আবিষ্কার যেমন মানুষের অতি প্রাচীন আবিষ্কার তেমনি আগুনের সাহায্যে খাবার তৈরী করা, অথবা রান্নাবান্না করাটাও মানুষের অনেক পুরোনো আবিষ্কার। অনেক খাবারকে বিশেষ বিশেষ পন্থায় রেঁধে না নিলে মানুষের পাচকতন্ত্র সইতে পারে না। আবার অনেক খাবার কাঁচাই খাওয়া যায়—যেমন, ফল, স্যালাড, দুধ।

রান্না করার মূল উদ্দেশ্যই হল খাবারের টিশুগুলোকে এমন নরম করে নেওয়া যাতে চিবোতে গিয়ে হিমসিম খেতে না হয়। সেই সঙ্গে খাবারটা যেন সহজে হজম হয় এবং খেতেও সুস্বাদু লাগে। বাজে রাঁধলে যেমন ভাল খাবারও অখাদ্য হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি ভাল রাঁধলে মামুলি খাবারও সুখাদ্য হয়ে দাঁড়ায়—শরীর মন তরতাজা হয়ে ওঠে, খেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায়।

চার্লস ল্যাম্বের লেখা একটা রচনায় শূওর সেঁকে খাওয়ার একটা ভারী মজার গল্প আছে। রচনাটার নাম ' A Dissertation on Roast Pig '। চীন দেশের একটা বাড়ীতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়—আগুনে ঝলসে মারা যায় একটা শূওর। সেই ঝলসানো শূওর খেয়ে এত ভালো লাগে চীনেম্যানদের যে বাড়ীর পর বাড়ীতে শূওর রেখে বাড়ী শুদ্ধ পুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করল ঝলসানো শূওর। শেষকালে টনক নড়ল পেটুকদের। গোটা বাড়ীটাকে না পুড়িয়ে শুধু শূওরটাকে ঝলসে নিলেই তো হয়।

চীনেম্যানরা রোস্ট করতে শিখেছিল নাকি এই ভাবেই!

হেলিকপটার কার আবিষ্কার ?

মাটি থেকে সোজা ওপরে উঠে যাবে, এমনি উড়ুক্কু মেশিনের স্বপ্ন অতি পুরোনো। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে লাওনার্দো দ্য ভিন্সি দানবিক স্ত্রু আকারের হেলিকপটারের নক্সা এঁকেছিলেন। সে মেশিনকে চালানোর মত মোটর তখন ছিল না বলে মেশিনটা তৈরী করার কোনো চেষ্টাও উনি করেন নি। ১৬৮৩ সালে ফ্রান্সে 'চৈনিক লাট্টু' নামে একটা খেলনা হেলিকপটার দেখানো হয়—কোত্থেকে এল সেই আজব লাট্টু, তা কিন্তু কেউ বলতে পারে নি। ১৭৯৬ সালে, স্যার জর্জ কেলী চৈনিক লাট্টু আকারের পরীক্ষামূলক যন্ত্র বানালেন এবং বাষ্পচালিত-হেলিকপটারের নক্সা আঁকলেন।

এর পরের ১০০ বছরে বহু ব্যক্তি হেলিকপটারের নক্সা এঁকেছেন। কিছু উদ্ভট, কিছু বাস্তব। কিছু প্রকৃতই আকাশে উড়েছিল। কিন্তু শক্তিশালী, ওজনে হাল্কা ইঞ্জিন একটাও তৈরী হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই ধরনের ইঞ্জিন তৈরী হওয়ার আগে একজন মানুষকে নিয়ে মাটি ছেড়ে শূন্যে উড়ে যাওয়ার মত হেলিকপটার কেউ বানাতে পারেনি।

১৯০৯ এবং ১৯১০ সালে আইগর সিকোর্স্কি দুটো হেলিকপটার নির্মাণ করেন। দুটোর একটা নিজের ওজনশুদ্ধ শূন্যে তুলতে পেরেছিল। ১৯১৭ সালের শেষের দিকে দুজন অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান অবজার্ভেশন বেলুনের বদলি হিসেবে একটা হেলিকপটার বানিয়েছিলেন। অনেক উঁচুতে বেশ কয়েকবার উড়ে গিয়েছিল হেলিকপটারটা, কিন্তু খুশীমত ওড়বার অনুমতি কখনো দেওয়া হয়নি।

নানান দেশে হেলিকপটার নির্মাণের কাজ চলেছিল দীর্ঘদিন, কিন্তু কোনো মেশিনই আবিষ্কারকদের মনের মত হয়নি। ১৯৩৬ সালে জার্মানী থেকে জানা গেল Focke-Wulf কোম্পানী একটা সফল হেলিকপটার নির্মাণ করেছে। ১৯৩৭ সালে ঘন্টায় ৭০ মাইল বেগে ১১,০০০ ফুটের বেশী উচ্চতায় উঠে এক দেশ থেকে আরেক দেশে উড়ে গেল সেই হেলিকপটার।

১৯৪০ সালে, সিকোর্স্কি দেখালেন তাঁর প্রথম সফল হেলিকপটার—১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে চালান দিলেন সেই হেলিকপটার।

ঝাঁটা কার আবিষ্কার ?

ঝাঁটা আর বুরুশ মোটামুটি দেখতে একই রকম। ঝাঁটার কাজ অবশ্য শুধু সাফ সুতরো করার জন্যে, কিন্তু অনেক বুরুশ দিয়েও সে কাজ করা যায়। বুরুশের আবিষ্কার অবশ্য ঝাঁটার অনেক হাজার বছর আগে।

লাঠির ডগায় জানোয়ারের চুল বেঁধে বুরুশ তৈরী করত গুহাবাসী মানব। লম্বা হাতলে গাছপালার সরু সরু ডাল, নল খাগড়া অথবা শুঁয়ো বেঁধে রান্না ঘরের ঝাঁটা তৈরী হত আগে। আমেরিকায় উপনিবেশে পত্তনের সময়ে এই ঝাঁটার ব্যবহার ছিল। ঠিক এই ধরনের ঝাঁটা দিয়েই আজও ইউরোপের অনেক অঞ্চলের রাস্তাঘাট আর ঘরদোর পরিষ্কার করা হয়।

এখনকার রান্নাঘরে যে ঝাঁটা ব্যবহার করা হয়, তা তৈরী হয় শস্যের ডাঁটি থেকে—এ ঝাঁটা আবিষ্কার করেছে আমেরিকা। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা গল্প শোনা যায়—গল্পটা সত্যি হতে পারে, মিথ্যেও হতে পারে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের এক ভারতীয় বন্ধু ন্যাকড়ার তৈরী একটা বুরুশ পাঠান—ভারতে তৈরী বুরুশ। দেখতে অনেকটা ছোট ঝাঁটার মত।

ঝাঁটার খড়ের গায়ে তখনও কয়েকটা শষ্যের দানা লেগেছিল। ফ্রাঙ্কলিন মাটিতে পুঁতে দিলেন দানা গুলো। চড় চড় করে তা অঙ্কুরিত হল এবং বছর কয়েক যেতে না যেতেই ঝাঁটার শস্যর চাষবাস অরম্ভ হয়ে গেল। এক দিন ম্যাস চুসেট্স্ নিবাসী হ্যাডলী নামে এক প্রবীন চিরকুমারের একটা নতুন ঝাঁটার দরকার হয়েছিল। ডজন খানেক ঝাঁটা শস্য কেটে নিয়ে এক সঙ্গে বেঁধে ঘর ঝাঁট দিয়ে ছিলেন ভদ্রলোক। এরপর থেকে বার্চ গাছের পল্লব দিয়ে তৈরী ঝাঁটা আর কখনো উনি ব্যবহার করেন নি।

প্রকৃত পক্ষে, শস্য ঝাঁটা তৈরী করে প্রতিবেশীদের কাছে বেচতে আরম্ভ করেন হ্যাডলী। ১৮৪৩ সালে তাঁর মৃতুর পরে, একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হয়ে দাঁড়ালো এই ঝাঁটা তৈরী। হ্যাডলী যে শহরে থাকতেন। সেখানে বছরে প্রায় তিন হাজার পঁচিশ বিঘে জমির ওপর কেবল ঝাঁটা শস্যই উৎপন্ন হতে লাগল! আজকের দিনেও বেশীর ভাগ ঝাঁটাই তৈরী হয় হাতে।

এ দেশের নানান ঝাঁটাও তৈরী হয় বিভিন্ন গাছের শাখা পল্লব থেকে।

মোজা কার আবিষ্কার ?

আগে চামড়া দিয়ে মোজা তৈরী হত পা ঢেকে রাখার জন্যে—যাতে আঁচড়-টাঁচড় না লাগে। কিন্তু এইভাবে পা-কে সুরক্ষিত রাখার ধারণা সাধারণ মানুষের জানা ছিল না—জানল খৃস্টানদের যুগ শুরু হওয়ার পর।

আজকাল আমরা যে ধরনের মোজা পরি, সেই ধরনের মোজা তৈরীর প্রথম প্রচেষ্টা হয় ফ্রান্সে। সপ্তম শতাব্দীতে ফরাসীরা চামড়ার মোজা পরত পা গরম রাখার জন্যে এবং ধুলোবালি আর আঁচড় ইত্যাদি থেকে রক্ষে করার জন্যে।

অচিরেই সবার ইচ্ছে হল মোজাকে আরও আকর্ষণীয় করা হোক। আবির্ভূত হল সিল্ক, ভেলভেট এবং কাপড়ের মোজা। অনেক সময়ে সোনার সুতো দিয়ে কারু কাজ করা থাকত তাতে। পরতেন সৌখীন নরনারীরা।

পশমে বোনা প্রথম মোজার আবির্ভাব ঘটে লণ্ডনে ১৫৬৫ সালে। সিল্ক দিয়ে বোনা লম্বা মোজা উপহার পেলেন রাণী এলিজাবেথ। এত খুশী হলেন যে সেই থেকে সিল্কের মোজা পরা ধরলেন। এ মোজা তৈরী হত ইটালীতে এবং পরতে পারতেন কেবল অতি ধনী ব্যক্তিরা।

সাধারণ মানুষের পরার মত সিল্ক মোজা বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পাওয়া গিয়েছিল—তার আগে নয়।

প্রথম ইঞ্জিন কার তৈরী ?

ইঞ্জিন এমন একটা মেশিন যা গতিবেগ উৎপাদন করে। এনার্জিকে, বিশেষ করে তাপ শক্তিকে, গতি বা চলনে পরিবর্তন করে—যাতে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।

যন্ত্র আবিষ্কার অনেক দিনের। কিন্তু সেই যন্ত্রকে শক্তি দ্বারা চালিত করার মত ইঞ্জিন ছিল না মানুষের হাতে। মানব শক্তি বা পশুশক্তির ওপর নির্ভর করতে হত যন্ত্র চালানোর জন্যে। তারপর মানুষ শিখল কি করে পালের মধ্যে বাতাস আটকে নৌকো চালানো যায়, হাওয়া কল তৈরী করা যায়। হাওয়াকল যখন জল পাম্প করে তুলেছে বা শস্য গুঁড়ো করেছে, তখন তা এক ধরনের ইঞ্জিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়ন্ত জলের শক্তি দিয়ে জলের চাকা ঘুরিয়েও শক্তিকে কাজে লাগানো গিয়েছে।

কিন্তু মানুষ যেদিন শিখল উত্তাপকে কিভাবে ইঞ্জিনের কাজে লাগানো

যায়, সেইদিন থেকেই পালটে যেতে লাগল আমাদের গোটা সভ্যতা। প্রকৃত-পক্ষে, আগুনের তাপ দিয়ে ইঞ্জিনে শক্তি জোগান দেওয়ার প্রথম ব্যবহারের যে ঘটনা আমরা জেনেছি, তা ঘটেছে ২,০০০ বছর আগে। হিরো নামে একজন গ্রীক দার্শনিক প্রথম বাষ্প চালিত ইঞ্জিন তৈরী করেন। অবশ্য ইঞ্জিনটা এতই ক্ষুদ্র ছিল যে তা দিয়ে কোনো কাজ করা যায় নি।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে টমাস নিউকোমেন নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক প্রথম কার্যকরী স্টীম ইঞ্জিন তৈরী করলেন। কয়লার খনি থেকে জল টেনে বার করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল এই ইঞ্জিনকে। ইঞ্জিনটা অবশ্য বড্ড বেশী জ্বালানি পোড়াতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেম্‌স্ ওয়াট উন্নত ধরনের একটা ইঞ্জিন বানালেন। উনি স্বয়ংক্রিয় ভাল্‌ভ তৈরী করেছিলেন বলে ইঞ্জিন চলার সময়ে পাশে কাউকে দাঁড়িয়ে পিস্টনকে ওপর নিচে চালনা করতে হত না।

১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে ওয়াট সাহেবের ইঞ্জিন লাগিয়ে একটা নৌকো চালালেন রবার্ট ফাল্টন। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে জর্জ স্টিফেনসন একটা স্টীম ইঞ্জিন তৈরী করলেন ইংলণ্ডে।

খুবই ভারী ছিল এই স্টীম ইঞ্জিন, কেননা বয়লারের বাইরে একটা চুল্লির মধ্যে হত দহনক্রিয়া।

ওজনের সমস্যা দূর করার প্রথম ধাপ কিন্তু একটা পেট্রল ইঞ্জিন—তৈরী করলেন জার্মানীর নিকোলাস অটো—১৮৭৮ খৃস্টাব্দে। এ ইঞ্জিনে আলাদা চুল্লির দরকার হত না—অথচ সমান অশ্বশক্তির স্টীম ইঞ্জিনের চেয়ে ছিল অনেক হাল্কা।

রসায়ন বিজ্ঞানের শুরু কবে ?

কি কি উপাদান দিয়ে বস্তু তৈরী হয় এবং কি ভাবে তাদের পরিবর্তন সাধন করা যায়, এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারে যে বিজ্ঞান তার নাম রসায়ন বিজ্ঞান।

কিছু কিছু বস্তুকে পালটে দেওয়ার অভিপ্রায় থেকেই আসলে রসায়ন বিজ্ঞানের আরম্ভ। 'অ্যালকেমি' নামক একটা গবেষণা থেকেই আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান বা কেমিস্ট্রির উৎপত্তি। মধ্যযুগে এমন একটা পরশ পাথরের সন্ধানে ছিল অ্যালকেমিস্টরা যা অন্য ধাতুকে পালটে সোনা করে দেবে। এ নিয়ে অনেক রকম এক্সপেরিমেন্টও তারা করে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রবার্ট বয়েল কেমিস্ট্রি এবং বিজ্ঞান :সম্বন্ধে :যা কিছু জ্ঞান মানুষ অর্জন করেছিল, সমস্ত এক জায়গায় সংগ্রহ করে সাজিয়ে ফেলেন। উনি জানতেন কম্পাউণ্ড অর্থাৎ যৌগিক পদার্থকে ভেঙে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যায়।

অন্যান্য কেমিস্টরা (রসায়নবিদ্‌রা) বয়েলের পদ্ধতি অনুসরণ করে অনেক আবিষ্কার করে ফেললেন। গ্যাস আর বাতাস নিয়ে অনেক গবেষণা করলেন জোসেফ ব্ল্যাক। জলের অন্যতম উপাদান হাইড্রোজেন আবিষ্কার করলেন হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ। প্রকৃতির সর্বত্র যে উপাদান বর্তমান, সেই অক্সিজেনকে আবিষ্কার করলেন জোসেফ :প্রিস্টলী। সর্বপ্রথম আগুনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা শোনালেন অ্যানটয়েন ল্যাভয়সিয়ার। উনিই প্রথম প্রমাণ করে দিলেন, কোন বস্তুরই নাশ নেই—খালি এক অবস্থা থেকে পালটে আরেক অবস্থায় চলে যায়।

জন ড্যালটনের ধারণা হল সব বস্তুই ক্ষুদে ক্ষুদে বস্তু কণা দিয়ে তৈরী। এই সব ক্ষুদে বস্তু কণাগুলো যুক্ত হলেই রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, এ বিশ্বাস এল বিজ্ঞানীদের মনে। এই বস্তুকণাদের এখন বলা হয় 'অ্যাটম' বা 'অণু'। অ্যাটমের ধারণা পরিষ্কার হয়ে যেতেই রসায়ন বিজ্ঞানের অনেক রহস্যই সোজা এবং যুক্তিসংগত মনে হল।

রসায়ন বিজ্ঞান তাই ক্রমাগত উন্নত হতে হতে আজকের দিনে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে নতুন বস্তুর স্রষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে! পরমাণু-কে ভেঙে আলাদা করা যায় কিভাবে এবং কিভাবে নানান পদ্ধতিতে পরমাণুদের জোড়া লাগানো যায়, এ বিদ্যা এখন রসায়ন বিজ্ঞানের আয়ত্ত।

মানুষ প্রথম কবে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করে ?

আজকের দিনে ইলেকট্রিসিটি ছাড়া বাঁচবার কথা ভাবতেও পারি না। মানুষ কিন্তু ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ বিদ্যুতশক্তির ব্যবহার করেছে মাত্র ১৮০০ খৃস্টাব্দ থেকে।

১৮০০ সালে আলেস্‌সান্দ্রো ভোল্টা প্রথম ব্যাটারী আবিষ্কার করলেন। সেই প্রথম বিশ্বকে উপহার দিলেন বিরামবিহীন নির্ভরযোগ্য ইলেকট্রিক কারেন্টের উৎস। অচিরেই আবিষ্কৃত হল আরও তথ্য—উত্তাপ, আলো,

রাসায়নিক ক্রিয়া এবং চৌম্বকত্বও উৎপাদন করতে পারে ইলেকট্রিসিটি।

ইলেকট্রিসিটির প্রবাহ যে বিরামবিহীন, ভোলটা সাহেবের এই আবিষ্কার বিজ্ঞানকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। মেশিন অনেক রকমই তৈরী হয়েছিল, কিন্তু তাতে শুধু আকস্মিক প্রচণ্ড ইলেকট্রিসিটির একটা তরঙ্গ পাওয়া যেত। ইলেকট্রিসিটিকে বিজ্ঞানের বহু উন্নতির কাজে প্রয়োগ করা হল ভোলটা সাহেবের আবিষ্কারের পর।

স্যার হামফ্রি ডেভী দেখলেন, দ্রবীভূত বহু বস্তুকে ভেঙে দিতে পারে ইলেকট্রিসিটি। এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকেই এমন প্রক্রিয়া আর পদ্ধতির উদ্ভব হল যার ফলে কম-খরচে তৈরী অ্যালুমুনিয়াম, খাঁটি তামা, ক্লোরিন, বিভিন্ন অ্যাসিড, কৃষি সার এবং বিশেষ ইস্পাত উৎপাদন সম্ভব হল।

তারপরেই আবিষ্কৃত হল আরও একটা ব্যাপার—ইলেকট্রিক কারেন্ট দিয়ে চৌম্বকত্ব সৃষ্টি। পাকানো তারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট পাঠালে জিনিসটা একখণ্ড লম্বা চুম্বকের মত কাজ দেয়। এর ফলে অনেক ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরী হল এবং এদের কিছু দিয়ে যান্ত্রিকগতিও উৎপন্ন করা গেল।

পরে, মাইকেল ফ্যারাডে ঠিক বিপরীত কাণ্ড সৃষ্টির পন্থা উদ্ভাবন করলেন—গতিশীল চুম্বক থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড সৃষ্টি করলেন। ফলে, ইলেকট্রিক ডায়নামো আর ট্রান্সফর্মার আবিষ্কার সম্ভব হল।

তাই বলছিলাম, মানুষ ইলেকট্রিসিটিকে কাজে লাগিয়েছে এই সেদিন এবং এখনও নিত্য নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করে চলেছে।

প্রথম বাঙালী তথা ভারতবাসী কারা ?

১) বাঙালী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নোবেল প্রাইজ পান।

২) বাঙালী রামমোহন রায় বিশিষ্ট ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিলেত যান।

৩) বাঙালী সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম গভর্নর ও বিলেতের লর্ড সভার সভ্য হন।

৪) বাঙালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হন।

৫) বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট হন।

৬) বাঙালী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম I.C.S. হন।

৭) বাঙালী চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম মেয়রের সম্মান লাভ করেন।

৮) বাঙালী স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সম্মান লাভ করেন।

৯) বাঙালী দিগম্বর মিত্র ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম শেরিফের সম্মান লাভ করেন।

১০) বাঙালী স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মান লাভ করেন।

১১) বাঙালী নীলমণি মিত্র ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ইঞ্জিনীয়ার হন।

১২) বাঙালী মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষায় ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লেখেন।

১৩) বাঙালী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম R.A. বা বিলেতের 'রয়াল আর্টিষ্ট' সভার সভ্য হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

১৪) বাঙালী স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম অ্যাডভোকেট-জেনারেল হন।

১৫) বাঙালী মেয়ে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি-এ ও চন্দ্রমুখী বসু এম-এ, এই দু'জনেই ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট হন।

১৬) বাঙালীর মেয়ে চন্দ্রলেখা বসু ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিলেতে যান।

১৭) বাঙালীর মেয়ে তরু দত্ত ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় কবিতা লেখেন।

১৮) বাঙালীর মেয়ে প্রভাবতী দাশগুপ্তা ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন।

১৯) বাঙালী উদয়শংকর ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতীয় নৃত্য দেখিয়ে দেশবিদেশে সম্মান লাভ করেন।

২০) বাঙালী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন।

২১) বাঙালী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু পৃথিবীতে প্রথম প্রমাণ করেন যে গাছপালারও প্রাণ আছে।

২২) বাঙালী কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য হন।

২৩) বাঙালী আনন্দমোহন বসু ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম Wrangler উপাধি প্রাপ্ত হন।

২৪) বাঙালী হরিনাথ দে ভারতবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রকম ভাষা জানতেন।

২৫) বাঙালী রমাপ্রসাদ রায় ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হাইকোর্টের বিচারপতি হন।

২৬) বাঙালী প্রভাতকুমার বর্ধন ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম যুগপৎ লণ্ডনের রয়াল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান এবং রয়াল কলেজ অফ সার্জনের (FRCP এবং FRCS) ফেলো হন।

২৭) বাঙালী পি. সি. সরকার ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম জাদুবিদ্যা দেখিয়ে দেশবিদেশে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেন।

২৮) বাঙালী রবিশংকর ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যন্ত্রসংগীত শুনিয়ে সারা পৃথিবীতে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

২৯) বাঙালী সত্যজিৎ রায় ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করে আনেন চলচ্চিত্র নির্মাণে।

৩০) বাঙালী সুভাষচন্দ্র বসুই ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতের বাইরে গিয়ে সৈন্যদল গঠন করে ভারতবর্ষকে বৃটিশ কবল মুক্ত করার চেষ্টা করেন।

রবিবার ছুটির দিন কেন ?

খৃস্টানদের মতে রবিবার দিনটা হল Lord's Day অর্থাৎ ঐদিন যিশু-খৃস্টের কাজে লাগতে হয় সবাইকে। ৩২১ খৃস্টাব্দে রোম সম্রাট আইন করে ঐদিন একমাত্র চাষবাসের কাজ ছাড়া আর সব কাজ বন্ধ রাখার বিধান দেন। সেই থেকেই রবিবারটা ছুটির দিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা খৃস্টান শাসকদের শাসনে নেই, তবুও তাঁদের প্রবর্তিত নিয়ম মেনে চলছি!

বাঙলা ভাষায় প্রথম খবরের কাগজ কোন্‌টা ?

বাঙলা ভাষায় প্রথম যে খবরের কাগজটা ছাপা হয়, যদ্দূর জানা গেছে তার নাম 'সমাচার দর্পণ'। ১৮১৮ সালের ২৯শে মে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকে এই খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ বলেন 'বেঙ্গলী গেজেট' -এর আগেই প্রকাশিত হয়।

বাঙলাদেশের নাম 'বঙ্গদেশ' হল কি করে ?

মহাভারত এবং অন্যান্য ভারতীয় পুরাণ থেকে জানা গেছে, চন্দ্রবংশে যযাতি বলে এক নৃপতি ছিলেন। তাঁর ছেলে ছিল অনু। অনুর বংশে খুব শক্তিমান এক রাজা জন্মান—তার নাম বলি। ভারী ধার্মিক ছিলেন রাজা বলি। তাই দীর্ঘতমা গৌতম নামে মুনি তাঁকে বর দেন এই বলে যে, পাঁচজন মহাবীর পুত্রের বাবা হবেন রাজা বলি। মুনির বর কি ব্যর্থ হয়? যথা সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটি মহাবীরের পিতা হলেন রাজা বলি। এই পাঁচ জনের নামে ভারতবর্ষের পাঁচটি অঞ্চলের নামকরণ হয় এইভাবে : অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ, কলিঙ্গদেশ, সুহ্মদেশ, ও পুণ্ড্রদেশ। অঙ্গদেশ ছিল এখনকার বিহারের ভাগলপুর জেলায়, বঙ্গদেশ বলতে বোঝাতো বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলা, কলিঙ্গদেশ ছিল উড়িষ্যায়, আর সুহ্ম বা রাঢ়দেশ ছিল বর্ধমান জেলায়। এখনকার রাজসাহী জেলায় ছিল পুণ্ড্রদেশ।

বাঙলাভাষার জন্ম হল কি করে ?

যে সব ভাষাবিদ বাঙলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁদের মতে বাঙলা ভাষা এসেছে 'ইণ্ডো এরিয়ান' ভাষার 'মাগধী' শাখা থেকে। তার মানে, এই ভাষার উৎস সংস্কৃত ভাষা। পরে অন্যান্য অনেক ভাষার অনেক শব্দ বাঙলা ভাষায় ঢুকে সমৃদ্ধ করে তোলে এই ভাষাকে। অনুপ্রবেশকারী ভাষাগুলো হল প্রাকৃত, মৈথিলী, ফারসী, উর্দু, পর্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী এবং ইংরেজী। বর্তমান বাঙলা ভাষার বয়স আনুমানিক সাড়ে ছ'শো বছর—তার আগের বাঙলা ভাষায় এখন কেউ কথা বললে বাঙালীরা বুঝতে পারবে না!

বাঙলা ভাষায় প্রথম ছাপা বই কি ?

একটি বাঙলা ব্যাকরণই প্রথম বাঙলা অক্ষরে ছাপা হয়! লেখক কিন্তু একজন ইংরেজ—মিঃ হ্যালহেড। বইটি ছাপা হয় ১৭৭৮ সালে। বাঙলা ভাষায় ইংরেজদের মধ্যে প্রথম পণ্ডিত হয়েছিলেন এই হ্যালহেড সাহেব।

কলকাতা কত পুরোনো শহর ?

ভাবতেও অবাক লাগে যে আলো ঝলমলে গাড়ী ঘোড়ায় চঞ্চল, লোকের ভিড়ে গিজগিজ, ধুলোধোঁয়া জঞ্জালে মলিন এই শহর কলকাতা এককালে একটা টিমটিমে গ্রাম ছিল। তারও আগে অবশ্য এখানে ছিল সুন্দরবন—যে সুন্দরবন দেখতে কলকাতার মানুষ এখন লঞ্চে চেপে ছুটছে বহু মাইল দূরে।

এখনকার কলকাতা গড়ে উঠেছে মোট তিনটে গ্রামকে নিয়ে—সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা। সুতানুটিতে ছিল তাঁতের কাপড়ের সুতো বিক্রির একটা বিরাট হাট। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট জব চানর্ক প্রথম আসেন এই সুতানুটিতেই এবং সেইখানেই কুঠী তৈরি করে ব্যবসাবাণিজ্যের ফন্দী করেন। আজকের মহানগরী কলকাতার বলতে গেলে সেইদিন থেকেই।

এর আগেও অবশ্য কলকাতা নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৯৫ সালের লেখা বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে। রাজা টোডরমল্লের খাজনা আদায়ের খাতাতেও 'মহল কলকাতা'র উল্লেখ আছে—এটি লেখা হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে।

বাঙালী নাকি যুদ্ধ করতে পারে না ?

এতবড় মিথ্যে কথা বিশ্বাস করা যায় না—তবুও কত রকম ছল চাতুরীই না চলছে বাঙালীকে ভেতো বাঙালী বা 'যুদ্ধঅপারগ' জাতি আখ্যা দেওয়ার জন্যে।

বাঙালী যে লড়তে ভয় পায় না, তার ভুড়ি ভুড়ি প্রমাণ পাবে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে। আর্যরা একটা দেশ জয় করতে এসে প্রথম ধাক্কা খায় এই বাঙালীদেরই পূর্বপুরুষদের কাছে। প্রথমদিকে আর্যদের বশ্যতা স্বীকারই করেনি। এর পরেও মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নাকের জলে চোখের জলে হয়েছিলেন প্রাচীন বাঙলার 'গঙ্গারিড়ি' বা 'গঙ্গারাঢ়' রাষ্ট্রের কাছে। সহজে পদানত

করতে পারেননি। অথচ আর্যাবর্ত জয় করে এসেছিলেন তার আগে! বাঙালী হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল চন্দ্রগুপ্তর মত মহাবীরকেও যে লড়াই কাকে বলে। তারপরেও দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তুগলককে 'একডালার যুদ্ধে' গৌড়বঙ্গের মুসলমান রাজা গৌড়েশ্বর শামসুদ্দীন ইলিয়াসের কাছে প্রচণ্ড মার খেয়ে সৈন্যসামন্ত সমেত দিল্লি পালাতে হয়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই যুদ্ধে একলক্ষ আশি হাজার বাঙালী সৈন্য নিয়ে সহদেব নামে এক বাঙালী সেনাপতি ভীষণ লড়েছিলেন এবং লড়তে লড়তেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন! তারপর অবশ্য সন্ধি হয় ১৩৫৭ সালে এবং বাঙলা স্বাধীনতা হারায় দিল্লীর বাদশার কাছে। এরপরেও ইউরোপের সমরানলে অকুতোভয় ২৫ জন বাঙালী ডানপিটে ছেলে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার সংকল্প নিয়েও লড়তে যায় ফ্রান্সের সহায়তায়। ফ্রান্সের বেশ কয়েকটা রণপ্রাঙ্গণে বাঙালীর ডানপিটেরা প্রমাণ করে দিয়ে আসে—বাঙালী ভীতু নয়, কাপুরুষ নয়—লড়তে জানে। প্রথম বাঙালী যিনি ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে মরে বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করে দিয়ে যান ১৯১৬ সালের ২১শে মে, তাঁর নাম যোগীন্দ্রনাথ সেন। গত মহাযুদ্ধে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ রণকৌশল দেখিয়ে আসে মাত্র দু'হাজার বাঙালী সৈনিক নিয়ে গঠিত 49th Regiment। বিমান-যুদ্ধেও বাঙালী বৈমানিক ইন্দ্রনাথ রায় আর কালিপ্রসাদ চৌধুরী প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করেছেন আকাশ পথে লড়তেও বাঙালী ভয় পায় না। বিমান বাহিনীর সুব্রত মুখার্জীর নাম তো আজকের সব স্পোর্টস-পাগল মানুষই জানে। সবশেষে নাম করতে হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর—যিনি ভারতের বাইরে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে এগিয়ে আসেন অত্যাচারী ইংরেজের শাসনের শৃঙ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করার মরণপণ ব্রত নিয়ে। এরপরেও কি বলতে হবে বাঙালী যুদ্ধ-অপারগ জাতি? যারা বলে; জেনো তারা বাঙালীকে ভয় পায়।

ভারতবর্ষের নাম হিন্দুস্থান হল কেন ?

গ্রীকরা ভারত জয় করতে এসে প্রথমে ঘাঁটি গাড়ে পাঞ্জাবের সিন্দুনদীর তীরে। ওদের আড়ষ্ট জিভে সিন্ধু শব্দটা সঠিক উচ্চারিত হত না—বলত হিন্দু। সেই থেকেই নাকি ভারত হিন্দুস্থান নামে পরিচিত। ইংরেজ আমলেও দেশের বহুজায়গার নাম এইভাবে বিকৃত হয়েছে। যেমন, চুঁচুড়া হল 'চিনসুরা', কলকাতা হল 'ক্যালকাটা' ইত্যাদি।

গঙ্গার উৎপত্তি কোথায় ?

হিমালয় অঞ্চলের গাড়োয়াল রাজ্যে গঙ্গোত্রী নামে একটা জায়গা আছে। 'গোমুখী' নামে এক বরফ গলা জলের ধারা নেমে এসেছে এই গঙ্গোত্রী থেকে। জলের এই ধারাটাই গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী হয়ে বয়ে গেছে ভারতের ওপর দিয়ে।

লাওনার্দো দ্য ভিন্সি কে ?

লাওনার্দো দ্য ভিন্সির মত অসাধারণ মানুষ পৃথিবীতে আর জন্মাননি। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে সম্ভবতঃ ইনি একা যত বিদ্যায় বিদ্বান ছিলেন, আর কেউ একক ক্ষমতায় তত বিদ্যা রপ্ত করতে পারেননি।

লাওনার্দোর জন্ম ১৪৫২ খৃস্টাব্দে, মৃত্যু ১৫১৯ খৃস্টাব্দে। ইনি ছিলেন একাধারে অসামান্য চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, এবং স্থপতি। এ ছাড়াও ইনি সেতু, বড় রাস্তা, অস্ত্রশস্ত্র, পরিচ্ছদ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিরও নক্সা এঁকেছেন। ডুবুরী যন্ত্র, ট্যাঙ্ক এবং উড্ডুক্কু যন্ত্রেরও নক্সা এঁকেছেন তিনি—যদিও তাঁর সময়ে আবিষ্কৃত জিনিসপত্র দিয়ে এগুলো নির্মাণ করা যায় নি। নরদেহের কাঠামো নিয়েও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন।

একই রকম পদ্ধতি মাফিক কায়দায় বিজ্ঞান এবং কলাশিল্প নিয়ে নাড়া-চাড়া করে গেছেন লাওনার্দো। বিশেষ কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার পর তিনি সমাধান সন্ধানের সাহায্য হতে পারে এমনি অনেক খসড়া নক্সা এঁকে ফেলেছেন। যন্ত্রপরিকল্পনা এবং চিত্র পরিকল্পনার মধ্যে কোনো পার্থক্য উনি দেখতেন না—যে বিষয়ে আগ্রহী হয়েছেন, সেই বিষয়েই বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন।

বিশ বছর বয়সেই চিত্রশিল্পীদের সংস্থায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার সম্মান অর্জন করেন লাওনার্দো। ওঁর আঁকা ছবি অন্যান্য ছবি আঁকিয়েদের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে ; কেননা, উনি সবসময়েই নতুন নতুন বিষয় নিয়ে ভাবতেন— যেমন, Chiaroscuro নামে এমন একটা নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনা করেছিলেন যা সাদা এবং কালোর মধ্যে পার্থক্যকে প্রকট করে তোলে।

লাওনার্দোর অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'দ্য লাস্ট সাপার'। চিত্রটি মিলান শহরে অঙ্কিত হয়। আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্যতম হয়েও চিত্রটি কিন্তু আসলে একটা অসফল এক্সপেরিমেন্ট। লাওনার্দো খুব ধীরগতিতে

কাজ করতেন বলে, স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে তেল দিয়ে ছবি আঁকতেন। ফলে, ছবি উঠে যেতে থাকে দেওয়াল থেকে, এবং আজ সেই ছবি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত।

নরদেহ আগ্রহ জাগিয়েছিল লাওনার্দোর মনে ; তাই মৃতদেহ কেটেকুটে দেখতেন কিভাবে জোড়া লাগানো হয়েছে দেহটা। উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়েও বিস্তর আবিষ্কার করেন তিনি।

খুব সম্ভব আজও পৃথিবীতে সবচেয়ে বিখ্যাত একটি মাত্র ছবি 'মোনালিসা' ; এবং এই অত্যাশ্চর্য ছবির শিল্পী ফ্লোরেন্স-নিবাসী লাওনার্দো।

জুল ভের্ন কে ?

জুল ভের্ন আধুনিক সায়ান্স-ফিক্‌শান অর্থাৎ কল্প বিজ্ঞান সাহিত্যের জনক। এঁর জন্ম ফ্রান্সের নানতেস্‌ শহরে ১৮২৮ সালের আটুই ফেব্রুয়ারী। আইন পড়েছিলেন আইনবিদ হবেন বলে, কিন্তু হলেন সাহিত্যিক। আমেরিকা গেছিলেন ১৮৬৭ সালে। অ্যামিয়েন্স শহরে মারা যান ১৯০৫ সালের চব্বিশে মার্চ। ওঁর মৃত্যুর পর পৌনে এক শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে—অথচ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত চাঞ্চল্যকর উপন্যাসগুলির জনপ্রিয়তা কমেনি। বিজ্ঞান সুবাসিত রোমাঞ্চকর কল্পকাহিনী, ফ্যানট্যাসটিক অ্যাডভেঞ্চার, কল্পনারঙীন ভবিষ্যদর্শন সমন্বিত প্রতিটি উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় বহু লক্ষ কপি বিক্রিত হয়েছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পাতালে, এমন কি পৃথিবীর বাইরেও দুঃসাহসিক অভিযানের বিস্ময়কর শ্বাসরোধী কাহিনীর পর কাহিনী লিখে গেছেন ছাদের ওপর লাল ইঁটের চিলে কোঠায় বসে—ঠিক যেন একটা জাহাজি ক্যাপ্টেনের কেবিন ঘর! এই ঘরেই বসে তিনি একালের অনেক বিস্ময় মানস-চক্ষে দেখেছিলেন। ছমাসে একটি করে উপন্যাস লিখে গেছেন চল্লিশ বছর ধরে। সাহিত্য সেবার জন্যে ফরাসি অ্যাকাডেমি তাঁকে সম্মানিত করেন। 'লিজিয়ন অফ অনার' দিয়ে—এই সম্মান দেওয়ার জন্যে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখিয়েছিলেন সুয়েজ খালের স্রষ্টা ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপ্স। শেষ জীবনে বধিরতা এবং অন্ধতার জন্যে লেখার পরিমাণ হ্রাস পায় জুল ভের্নের।

খুব ভোরে ওঠা অভ্যেস ছিল জুল ভের্নের। ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে লিখতেন। ঘুমোতে যেতেন কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে সাতটায় এবং বিছানায় শুয়ে রাত দুপুর পর্যন্ত রাশি রাশি বৈজ্ঞানিক বই

পড়তেন। সে সব বই ফুরোলে পড়তেন ভ্রমণ আর অ্যাডভেঞ্চারের বই।

ভের্ণের সফলতার একটা মন্ত্রগুপ্তি হল, পাঠককে তিনি পর্যটক বানিয়ে ছাড়েন। তাঁর গ্রন্থাবলী 'অত্যাশ্চর্য অভিযান লহরী' নামে পরিচিত। সারা ভূগোলটা যেন ঘুরতে থাকে পাঠকের সামনে।

ভের্ণের বাবার নাম পিয়েরি ভের্ণ, মায়ের নাম সোফিয়া। বাবা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত আইনবিদ্। বাবার ইচ্ছেতেই প্যারিসে গিয়ে আইন পড়ে ব্যারিষ্টার হন। এই সময়ে আলেকজাণ্ডার ডুমাস-য়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ডুমাসের সঙ্গে মিলে মিশে লিখতে শুরু করেন ভের্ণ। পরে একাই থিয়েটারের জন্য লেখা ধরেন। ছন্দ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, মঞ্চস্থ করেন কয়েকটি গীতিনাট্য।

প্রথম দিকে সাহিত্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন নি ভের্ণ। 'ফাইভ উইক্স্ ইন এ বেলুন' কোনো প্রকাশক ছাপাতে চায়নি। অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়েছিলেন ভের্ণ রাগে দুঃখে, পুড়ে যাওয়ার আগেই তাঁর স্ত্রী পাণ্ডুলিপিটা উদ্ধার করেন। দু' হপ্তা পরে এম, হেটজেল নামক এক প্রকাশক উপন্যাসটি প্রকাশ করবেন ঠিক করেন।

ভের্ণের সাত খণ্ডে প্রকাশিত অনবদ্য রচনাবলী (প্রকাশ করেছেন বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশক) বাংলায় পাওয়া যাচ্ছে বর্তমানে—এই রচনাবলীর মধ্যে এমন সব উপন্যাসের অনুবাদ আছে যার ইংরেজি বইও কলকাতায় দুষ্প্রাপ্য। বই সংগ্রহে সহায়তা করেন সত্যজিৎ রায় এবং ফরাসী দূতাবাস।

স্যার আর্থার কন্যান ডয়াল কে ?

১৮৫৯ সালে এডিনবরায় এঁর জন্ম। শিক্ষা স্টোনিহার্স্ট এবং এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে। ডাক্তার। প্র্যাকটিস করেন ১৮৮২ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সারা বিশ্বের পুলিশী ব্যবস্থা এবং অপরাধ তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছেন। অপ্রতিদ্বন্দ্বি গল্পের গোয়েন্দা শার্লক হোম্স্ এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের স্রষ্টা। শার্লক হোম্স্ গল্পের মধ্যে অনেকগুলি মৌলিক পদ্ধতির সূত্রপাত করেন। যেমন, সূক্ষ্ম সূত্র সংরক্ষণের জন্যে প্লাস্টার অফ প্যারিসের ব্যবহার ; সনাক্তকরণের জন্যে পোশাক থেকে সংগৃহীত ধুলো পরীক্ষা ; বিভিন্ন তামাক পোড়া ছাইয়ের

বিশ্লেষণ, এবং অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান যা এখন সারা বিশ্বে স্বীকৃত। চীন এবং মিশরে সরকারী গোয়েন্দারা এঁর বই পড়ত পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ট্রেনিংয়ে থাকার সময়ে; আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা FBI-তে ডয়ালের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে—স্বীকার করেছেন F B I প্রধান এডগার হুভার; ফ্রান্সের গোয়েন্দা দপ্তরে (Surete) ক্রিমিন্যাল ল্যাবোরেটরীর নাম হয়েছে ডয়ালের নামে।

শার্লক হোমস্ এবং প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের গল্প ছাড়াও লিখেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিবিধ অলৌকিক গল্প, বুয়র যুদ্ধের ইতিহাস, মহাযুদ্ধের ইতিহাস। কীর্তিমান পুরুষঃ নৌবিভাগের লাইফ জ্যাকেট আবিষ্কার করেন, সেনাবাহিনীকে ইস্পাতের হেলমেট পরতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই বৃথাই ইউ-বোট আতংক সম্বন্ধে সতর্ক করার চেষ্টা করেন। স্যার উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পিলগ্রিম ট্রাস্টে কাজ করেন।

প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করতেন, বহু প্রেতচক্রে গিয়েছেন। 'ল্যাণ্ড অফ মিস্ট' উপন্যাসটি তাঁর জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

ভাল ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলতেন। মোটর রেসেও যোগ দিয়েছিলেন। ভাল মুষ্টিযোদ্ধা এবং বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় ছিলেন। সুইজারল্যাণ্ডে স্কি প্রবর্তন করেন ১৮৯৩ সালে।

১৯৩০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর চার্চিল বলেছিলেন, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। শার্লক হোম্‌সের সব গল্প আমি পড়েছি। কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস।

বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশক শার্লক হোম্‌স্ রচনাবলী ৫খণ্ডে এবং প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সুবিখ্যাত কাহিনীগুলি বাংলায় প্রকাশ করেছেন।

অক্সিজেন কাকে বলে ?

এমন একটা জিনিস এই পৃথিবীতে আছে যাকে বাদ দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না—একথা হামেশাই তোমাদের কানে আসে নিশ্চয়। জিনিসটার নাম অক্সিজেন—যা জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অক্সিজেন ছাড়া কোনো মানুষ মিনিট কয়েকের বেশী বাঁচতে পারে না।

অক্সিজেন একটা মৌলিক পদার্থ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

ভূস্তরের প্রায় অর্ধেক এবং বাতাসের প্রায় এক-পঞ্চমাংশেরও বেশী এই অক্সিজেন দিয়ে তৈরী। ফুসফুসের মধ্যে নিঃশ্বেসের সঙ্গে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে রক্তের লাল কণিকারা বিরাম বিহীন স্রোতের আকারে অক্সিজেনকে পৌঁছে দেয় দেহের কোষে কোষে। সেখানে গিয়ে খাদ্যকে পোড়ায় এই অক্সিজেন—তাপ সৃষ্টি করে—যে তাপ মানব দেহের ইঞ্জিন চালু রাখার জন্য দরকার।

বেশীর ভাগ মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সহজেই যুক্ত হয়ে যায় অক্সিজেন। এ কাণ্ড যখন ঘটে, তখন সেই প্রক্রিয়াকে আমরা বাল অক্সাইডেশন। অক্সাইডেশন খুব দ্রুত ঘটলে, তখন তাকে বলি কমবাসন্ (Combustion)। অক্সাইডেশনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাপ বেরিয়ে আসে। কমবাসন্ অর্থাৎ দহন ক্রিয়ার সময়ে তাপ এত তাড়াতাড়ি বেরোতে থাকে যে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পায় না—অত্যন্ত বেশী বেড়ে যায় তাপ মাত্রা—আবির্ভূত হয় অগ্নিশিখা।

কাজেই, একদিকে দ্রুত অক্সাইডেশনের জন্যে পাচ্ছি দহন ক্রিয়া যার ফলে অগ্নি সৃষ্টি হচ্ছে—আর একদিকে এই অক্সাইডেশনের ফলেই শরীরের মধ্যে খাদ্য পুড়ে গিয়ে জীবন যাত্রাকে অব্যাহত রাখছে। কিন্তু বাতাসের মধ্যেকার অক্সিজেনের জন্যে যে অক্সাইডেশন—তার অস্তিত্ব দেখা যায় সর্বত্র। লোহায় মরচে পড়লে, রঙ শুকিয়ে গেলে, অ্যালকোহল ভিনিগারে পরিবর্তিত হলে বুঝতে হবে অক্সাইডেশন তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

যে বাতাস আমরা নিঃশ্বেসের সঙ্গে নিই, মূলতঃ তা অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের সংমিশ্রণ। কাজেই বাতাস থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন আমরা বানিয়ে নিতে পারি। বাতাসকে খুব নিম্ন তাপ মাত্রায় আনতে হয়—যতক্ষণ না তা তরল অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে। শূন্য ফারেনহাইট তাপাংকের তিনশ ডিগ্রী নিচে নিয়ে যাওয়া হয় তাপ মাত্রাকে। তরল বাতাস এই তাপ মাত্রায় একটু উর্ধ্বে উষ্ণ হলেই ফুটতে থাকে। প্রথমে ফুটে উড়ে যায় নাইট্রোজেন, থেকে যায় অক্সিজেন। অনেক মানুষের ফুসফুস কমজোরি হয়ে পড়লে অক্সিজেন দেওয়া হয় তাদের নিঃশ্বেস নেওয়ার সুবিধে হবে বলে।

জল কাকে বলে ?

অন্য গ্রহে প্রাণ আছে কিনা, এই নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে বসে প্রথমেই বৈজ্ঞানিকরা যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, তা এই : জল আছে তো

সেখানে? প্রাণ বলতে আমরা যা বুঝি, জল বিনা তার অস্তিত্ব অসম্ভব।

জল স্বাদহীন, বর্ণহীন, গন্ধহীন এমন একটা যৌগিক পদার্থ যা সমস্ত জীবন্ত জিনিসেরই বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে। মাটির সর্বত্র জল আছে, আছে বিভিন্ন পরিমাণে বাতাসে।

খাবার যখন জলে গোলা থাকে, জীবন্ত জিনিসরা তখনই সেই খাবার হজম করতে পারে, শরীরে বিশোষণ করতে পারে। জীবন্ত টিশু মূলতঃ জল দিয়ে গঠিত। জল কি দিয়ে গঠিত? দুটো গ্যাস দিয়েঃ একটা খুব হাল্কা গ্যাস—হাইড্রোজেন, আর একটা তার চাইতে ভারী সক্রিয় গ্যাস—অক্সিজেন।

হাইড্রোজেন অক্সিজেনের মধ্যে পুড়ে গেলেই জলের সৃষ্টি। কিন্তু জলকে দেখতে এই দুই উপাদানের কোনোটিরই মত নয়। জলের যা-যা ধর্ম তা তার নিজস্ব।

অন্যান্য বেশীর ভাগ বস্তুর যত জল তিন রকম অবস্থায় বিরাজ করেঃ তরল অবস্থা—যে চেহারায় জলকে হামেশা দেখা যায়, শক্ত অবস্থায় জলকে বলা হয় বরফ; আর গ্যাসীয় অবস্থায় জলকে বলা হয় 'জল বাষ্প'। জল এই তিন অবস্থার কোন অবস্থায় বিরাজ করবে, তা সাধারণ ভাবে নির্ভর করে তাপ মাত্রার ওপর।

জিরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে বা ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটে, জল তরল থেকে শক্ত অবস্থায় চলে যায়, অর্থাৎ জমে যায়। ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা ২১২ ডিগ্রী ফারেনহাইটে, জল তরল থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় পৌঁছে যায়। জলের এই শেষোক্ত অবস্থা-পরিবর্তন, মানে জল যখন দৃশ্য অবস্থা থেকে অদৃশ্য অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে—তখন এই পরিবর্তনকে বলা হয় ইভাপোরেশন বা বাষ্পীভবন।

সেই কারণেই, এক টুকরো বরফকে উষ্ণ করে নিয়ে এলে তা তরল হয়ে যেতে থাকে, বা গলে যেতে থাকে। ঘর যদি বেশ গরম হয়ে ওঠে, তাহলে বরফ গলা জল শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যায়। তরল জল বাষ্পে পরিণত হয়। জল যখন ঠাণ্ডা হয়, তা প্রসারিত হতে থাকে যতক্ষণ না জমে যাওয়ার তাপমাত্রায় পৌঁছোচ্ছে।

প্রাকৃতিক জল বিশুদ্ধ কখনোই নয়। এর মধ্যে গুলে থাকে নানারকম খনিজ পদার্থ, গ্যাস আর জীবন্ত জীব।

বালি এত রকমের হয় কেন ?

নিরেট পাথর বাতাস, বৃষ্টি আর জমাট হিমকণা বা তুষারের সংস্পর্শে এসে যখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং প্রতিটি টুকরোর আয়তন যখন অতি ক্ষুদ্র হয়ে দাঁড়ায়, (ব্যাস এক ইঞ্চির পাঁচশ ভাগের এক ভাগ থেকে আরম্ভ করে এক ইঞ্চির দশ ভাগের একভাগ), তখন সেই টুকরোগুলোকে বলা হয় "বালি"।

পাথর ভেঙ্গে বালি তৈরি হয় বলে পাথরের মধ্যে যা-যা খনিজ পদার্থ বর্তমান তার সবই থাকে বালির মধ্যেও। বালির মূল উপাদান কোয়ার্জ—কেননা, কোয়ার্জ অত্যন্ত কঠিন এবং পাওয়াও যায় প্রচুর পরিমাণে। কিছু বালির মধ্যে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত কোয়ার্জ থাকে। বালির মধ্যে পাওয়া অন্যান্য খনিজ পদার্থের মধ্যে থাকে ফেলস্পার, ক্যালসাইট, অভ্র, আকরিক লোহা, এবং অল্প পরিমাণে গার্নেট (ডালিমদানার মত এক রকমের মণি), টোপাজ (পোখরাজ) আর টুরমালিন (বিভিন্ন উপাদানে গঠিত কালো বা কালচে রঙের এক ধরনের ভারী সুন্দর খনিজ পদার্থ)।

পাথর যেখানেই আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসেছে, বালি তৈরি হচ্ছে সেই-সেই জায়গায়। সমুদ্র সৈকত বালি তৈরীর অন্যতম প্রধান স্থান। এইখানে সমুদ্রের ঢেউ পাথরের গায়ে বেগে আছড়ে পড়ায়, বায়ু-তাড়িত বালির সঙ্গে পাথরের ঘষা লাগায় এবং নোনা জলে পাথরের খনিজ পদার্থরা গুলে যাওয়ায় বালি তৈরি হয়।

সমুদ্র সৈকত থেকে ঝুরঝুরে বালিকে তুলে নেয় বাতাস, নিয়ে যায় ডাঙার ভেতর দিকে। মাঝে মাঝে এত বেশী পরিমাণে বালি এইভাবে বায়ু-তাড়িত হয়ে ডাঙার ভেতর দিকে চলে যায় যে গোটা একটা জঙ্গল পর্যন্ত ঢেকে যেতে পারে বালিয়াড়িতে।

কিন্তু মরুভূমির বালির ব্যাপারটা কি? এখানকার বেশীর ভাগ ঝুরঝুরে বালিকে বয়ে আনে বাতাস। কোনো কোনো পাথর ক্ষয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয় মরুভূমির বালি। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে, মরুভূমিটা আসলে এককালে ছিল সাগরতলে—হাজার হাজার বছর আগে জল সরে যাওয়ার ফলে বালি বেরিয়ে পড়েছে।

বালি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। আধুনিক বাড়ী তৈরি করতে বালির

দরকার হয় প্রচুর পরিমাণে। সিমেন্ট আর জলের সঙ্গে বালি মেশালে চটচটে কাদার মত আঠালো এক রকমের বস্তু তৈরি হয়—যার নাম "মর্ট্যার"—খুব দ্রুত শুকিয়ে গিয়ে শক্ত বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এই মর্ট্যার—তখন তার নাম হয় 'কংক্রিট'। বালি থেকে শিরিষ কাগজ আর কাঁচও তৈরি হয়। জলকে খাঁটি রাখার জন্য ছাঁকনি তৈরীর কাজেও বালিকে ব্যবহার করা হয়।

পেট্রোলিয়াম কাকে বলে ?

মানব জাতটাকে যারা সেবা করে আসছে, পেট্রোলিয়াম তাদের অন্যতম। পেট্রল আমাদের দিচ্ছে আলো আর তাপ ; শক্তি জোগাচ্ছে এরোপ্লেন, ট্রাক্টর, জাহাজকে। পেট্রল না থাকলে ঘর্ষণজনিত বাধায় আমাদের প্রায় সব যন্ত্রই যেত বন্ধ হয়ে।

পেট্রোলিয়াম থেকেই পাচ্ছি মোটর গাড়ির পেট্রল, প্যারাফিন, জ্বালানি এবং ঘর্ষণ বন্ধ করার তেল, চর্বি, মোম, অ্যাসফাল্ট এবং বহু জিনিস। পেট্রো-লিয়াম জিনিসটা তাহলে কি ? পেট্রোলিয়াম শব্দটা এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে—এর মানে 'পাথুরে তেল'। এ তেল সৃষ্টি হয়েছিল কিভাবে ? বৈজ্ঞা-নিকদের বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে সব উদ্ভিদ আর জীব উষ্ণ সমুদ্র বা তার ধারে কাছে বাস করত এবং যে সমুদ্রগুলো বলতে গেলে গোটা পৃথিবী-টাকেই ঢেকে রেখে দিয়েছিল—পেট্রোলিয়াম সৃষ্টি হয়েছে এই উদ্ভিদ আর জীবদেহ থেকেই।

এরা যখন মারা গেছে, সমুদ্রতলে স্তূপীকৃত হয়ে থেকেছে।

প্রথম ম্যাপ কার তৈরী ?

তুমি যে শহরে থাকো, সেই শহরের বাজার হাট রাস্তা বাড়ী কোথায় কোথায় আছে যদি মুখে বলতে হয় তোমাকে, কালঘাম ছুটে যাবে নাকি ? কাজটা অনেক সোজা হয়ে যাবে যদি বাজার হাট রাস্তা বাড়ী ছবিতে বা নক্সায় দেখানো যায়। ফলে, পাচ্ছো শহরের ম্যাপ !

প্রথম ম্যাপ (আজ পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুসারে) তৈরি হয়েছিল কাদা মাটিতে নক্সা এঁকে এবং আগুনে তা পুড়িয়ে—আজ থেকে ৪০০০ বছর আগে মিশরে। পুরাকালে জমির মালিকরা তাদের জমির এবং রাজারা তাদের রাজত্বের সীমানা চিহ্নিত করত ম্যাপের ওপর। কিন্তু বহুদূরের জায়গা ম্যাপে

দেখাতে গেলেই ঝামেলায় পড়ত।

তার কারণ পৃথিবীটা গোল এবং দীর্ঘ দূরত্বের মাপ সঠিক ভাবে ম্যাপে নির্ণয় করতে গেলেই মুস্কিল হত।

খৃষ্টপূর্ব ২৭৬ সালে ইয়াসটোথেন্স নামে একজন গ্রীক ভূগোলকের চার পাশের দূরত্ব মেপে প্রায় সঠিক একটা হিসেবে উপনীত হন। তাঁর পদ্ধতি অনুসারে সেই প্রথম উত্তর দক্ষিণের দূরত্ব সঠিকভাবে মাপা সম্ভব হয়।

প্রায় সেই সময়েই হিপারকাস প্রস্তাব করলেন, কতকগুলো কাল্পনিক রেখার ভিত্তিতে পৃথিবীটাকে সমানভাবে ভাগ করা হোক। সমান্তরাল রেখাগুলোকে বলা হোক ল্যাটিচিউড বা প্যারালাল, আর লম্বালম্বি রেখাগুলো-কে বলা হোক লঙ্গিচিউড বা মেরিডিয়ান। আকাশের নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে ঠিক করা হোক কোন রেখাটা কোথা দিয়ে যাবে।

যীশুখৃষ্ট জন্মানোর পর দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই আইডিয়াকে কাজে লাগালেন টলেমি এবং পন্থাটার উন্নতি সাধন করে সমান সমান ব্যবধানে সাজালেন ল্যা টিচিউড আর লঙ্গিচিউড। আমেরিকা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত তাঁর লেখা ভূগোল বইটাই ছিল উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক।

কলম্বাস এবং অন্যান্য অভিযাত্রীদের আবিষ্কারের পর থেকেই' ম্যাপ আর চার্ট সম্বন্ধে কৌতুহল এবং আগ্রহবৃদ্ধি পায় বিপুল ভাবে। ১৫৭০ সালে সর্ব-প্রথম ম্যাপ সংগ্রহ প্রকাশ করল আন্টওয়ার্পের আব্রাহাম অর্টেলিয়াস। আধু-নিক ম্যাপের জনক হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন গেরাড়ুস মারক্যাটর। উনি এমন একটা ম্যাপ রচনা করলেন যে ম্যাপের ওপর ভূগোলকের সমস্ত বাঁকা লাইনগুলোকে দেখানো হল সিধে ভাবে। এর ফলে একটা সরল রেখা দুটো জায়-গার মধ্যে দিয়ে ম্যাপের মধ্যে দেখানো সম্ভব হল—যা কিনা কম্পাসের সঠিক দিক নির্ণয়। এ ধরনের ম্যাপকে বলে Projection ; ভূপৃষ্ঠকে ম্যাপের ওপর এনে ফেলা সম্ভল হল এই পদ্ধতির দৌলতে।

তাঁর গ্রন্থের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় দানবিক অ্যাটলাস-য়ের একটা নক্সা ছিল। সেই থেকে কয়েকটা ম্যাপের একত্র সংগ্রহকে বলা হয় অ্যাটলাস।

কুয়াশা কাকে বলে ?

জমির সংস্পর্শে থাকা মেঘকে বলে কুয়াশা। শূন্যে ভাসমান মেঘ আর জমির লাগোয়া কুয়াশার মধ্যে মূল প্রভেদ কিছু নেই। মেঘ যখন ভূপৃষ্ঠ বা

সমুদ্র পৃষ্ঠের ওপরে বা কাছাকাছি নেমে আসে তখন আমরা তাকে বলি কুয়াশা।

মামুলি কুয়াশা দেখা যায় রাত্রে, এবং খুব ভোরে নিচু জমিতে এবং ছোট-খাটো জলাশয়ের ওপর। উষ্ণতর জমি বা জলপৃষ্ঠের ওপর বাতাসের শীতল স্রোত এসে ধাক্কা মারলেই তৈরী হয় এই কুয়াশা।

শরৎকালে কুয়াশা হামেশা দেখা যায়। কারণ, এই সময়ে জমি বা জলের চেয়ে অনেক দ্রুত ঠাণ্ডা হতে থাকে বাতাস প্রতিদিন। সন্ধার পর প্রশান্ত রাত্রে অনেক সময়ে কুয়াশার পাতলা স্তর নিচু অঞ্চলের জমির খুব কাছাকাছি চলে আসে। রাত্রে যখন পৃথিবী শীতল হতে থাকে, নিচের বাতাসও ঠাণ্ডা হয়ে যেতে থাকে। এই ঠাণ্ডা বাতাস ঠিক ওপরকার আর্দ্র অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বাতাসের সংস্পর্শে এলেই কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

সাধারণ নিয়ম অনুসারে, গ্রামের কুয়াশার চেয়ে শহরের কুয়াশা সব সময়েই ঘন হয়। শহরে আছে ধুলো আর ধোঁয়া—ছোট ছোট বাষ্পকণার সঙ্গে এরা মিশে গিয়ে পুরু চাদরের মত ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে কুয়াশাময় অঞ্চলদের অন্যতম হল নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ডের উপকূল। মেরুবৃত্ত থেকে ঠাণ্ডা জল দক্ষিণ দিকে বয়ে যায় এই অঞ্চল দিয়ে, স্যাৎসেঁতে উষ্ণ বাতাস তার ওপর এসে পড়লেই সৃষ্টি হয় ঘন কুয়াশার। জলের শৈত্য বাতাসের আর্দ্রতাকে ঘনীভূত করে সৃষ্টি করে ছোট ছোট জলকণা। জলকণাগুলো এতই ছোট যে বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ার মত নয়, তাই বাতাসে ভেসে থাকে কুয়াশার আকারে।

সান্‌ফ্রান্সিসকো কুয়াশার সৃষ্টি বিপরীত প্রক্রিয়ায়। সেখানে উষাকালের শীতল সমীরণ উষ্ণ বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যায়। আগের রাতের বৃষ্টিতে বালি যদি ভিজে থাকে, তাহলে উবে যাওয়া আর্দ্রতা থেকে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

কুয়াশাকে মেঘের চাইতে ঘন মনে হওয়ার কারণ কুয়াশার মধ্যে জলকণা অনেক ছোট। বেশী পরিমাণে ছোট ফোঁটা আলো শুষে নেয় বেশী পরি-মাণে—কম পরিমাণে বড় ফোঁটা (মেঘের মধ্যে যেমন থাকে) তত আলো শুষে নিতে পারে না। তাই কুয়াশাকে মনে হয় মেঘের চাইতে ঘন।

শিশির কাকে বলে ?

মনে হতে পারে শিশির জিনিসটা প্রকৃতির অতি সহজ ব্যাপার, কাজেই ব্যাখা করাও সোজা, বুঝতেও বেগ পেতে হয়না। কিন্তু আদৌ তা নয়। শিশির জিনিসটা আসলে কী, এ নিয়ে দীর্ঘ ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে এবং বিস্তর কেতাব লেখা হয়েছে শিশির নিয়ে!

অ্যারিস্টটলের সময় থেকে দু'শ বছর আগে পর্যন্ত, ধারণা ছিল বৃষ্টির মতই শিশির আকাশ থেকে 'পড়ে'। শিশির কিন্তু মোটেই পড়ে না! গাছের পাতার ওপর জমা শিশিরকেই আমরা সবচেয়ে বেশী চিনি; এখন জানা গেছে এই শিশিরের সবটাই পুরোপুরি শিশির নয়! কাজেই বুঝতে পারছো, শিশির সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা নিয়ে আমরা এতদিন থেকেছি।

শিশির কি বুঝতে হলে আশপাশের বাতাসকে আগে বুঝতে হবে আমাদের। সব বাতাসের মধ্যেই কিছু পরিমাণে আর্দ্রতা থাকে। ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে গরম বাতাস অনেক বেশী জলবাষ্প ধরে রাখতে পারে। শীতল ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে এলেই গরম বাতাসের খানিকটা ঘনীভূত হয়ে যায় এবং সেই ঘনীভূত বাতাসের ভেতরকার আর্দ্রতা ছোট ফোঁটার আকারে ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়। এরই নাম শিশির।

শীতল ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রাকে কিন্তু বিশেষ একটা মাত্রার নিচে নামতে হবে—নইলে শিশির তৈরী হবে না। এই মাত্রা বা পয়েন্টকে বলা হয় 'ডিউ পয়েন্ট' বা 'শিশিরের মাত্রা'। উদাহরণ স্বরূপ, গেলাস বা পালিশ করা ধাতুর পাত্রে যদি জল রাখো, পাত্রের গায়ে শিশির না-ও সঞ্চিত হতে পারে। জলের মধ্যে যদি বরফ দাও, তাহলেও শিশির সঞ্চিত হবে না যতক্ষণ না গেলাস অথবা ধাতুর পাত্রের গায়ের তাপমাত্রা বিশেষ একটা পয়েন্টের নিচে নামছে।

প্রকৃতির মধ্যে শিশির তৈরী হয় কি করে? প্রথমেই, আর্দ্রতা-ঠাসা উষ্ণ বাতাস থাকা চাই। এই বাতাস শীতল কিছুর গায়ে এসে লাগা চাই। জমি বা রাস্তায় শিশির জমা হয় না—কারণ, রোদের তাপে জমি বা রাস্তা তখনও তেতে থাকে না। কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যায় ঘাস আর গাছের পাতা। তাই শিশির জমা হয় ঘাস আর গাছের পাতায়।

তাহলে বললাম কেন গাছপালার ওপর যে শিশির জমতে দেখি, তা সত্যিকারের শিশির নয়? বললাম এই কারণে যে ভোরবেলা গাছপালার ওপর যে আর্দ্রতা দেখি তার খানিকটা শিশির হলেও, বেশীর ভাগটাই—

এবং অনেক ক্ষেত্রে সবটাই—আসলে আসে গাছের থেকেই! পাতার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে আর্দ্রতা। মাটি থেকে জল নিয়ে পাতায় চালান দিতে হয় গাছকে—রাতেও তা অব্যাহত থাকে। দিনের আলোয় শুরু হয় তৎপরতা—সেই সময়ে রোদের আঁচ সইবার মত ক্ষমতা থাকা চাই পাতাদের। তাই সারারাত ধরে জল যায় পাতায় পাতায়।

পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে সারারাত এত শিশির সঞ্চিত হয় যে শিশিরের পুকুর জমে যায়। গরুবাছুর এসে তৃষ্ণা মেটায় সেই জলে!

ধোঁয়া কাকে বলে ?

কিছু জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন ক্রিয়ার ফলেই ধোঁয়া জিনিসটার সৃষ্টি। তার মানে দাঁড়ায় এই, রোজ আমরা যে সব জ্বালানি পোড়াই, তাদের বেশীর ভাগ যদি পুরোপুরি পুড়ে যেত, তাহলে ধোঁয়া আর হত না!

কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, একটু গন্ধক, আর সম্ভবতঃ কিছু খনিজ-ছাই দিয়েই গড়ে উঠেছে অধিকাংশ জ্বালানি। এখন যদি এই সব জ্বালানিদের পুরোপুরি পুড়িয়ে ফেলা যায়, তারপর যা পড়ে থাকবে, তা কার্বন ডায়অক্সাইড, জলবাষ্প, এবং নিছক নাইট্রোজেন—এদের প্রত্যেকেই নির্দোষ—ক্ষতিকারক নয়। যদি গন্ধক থাকে, তাহলে সামান্য পরিমাণে সালফার ডায়অক্সাইড তৈরী হয়। এই বস্তুটি বাতাস আর আর্দ্রতার সংস্পর্শে এলেই তীব্র অ্যাসিড হয়ে দাঁড়ায়—(Corrosive)।

সম্পূর্ণ দহন ক্রিয়ার জন্যে জ্বালানির দরকার প্রচুর বাতাস—যাতে উচ্চ তাপমাত্রায় পুরোপুরি অক্সাইডেশন সম্ভব হয়। (অক্সাইডেশন অর্থে কার্বন হবে কার্বন ডায় অক্সাইড; হাইড্রোজেন হবে জল, গন্ধক হবে সালফার ডায় অক্সাইড)। এতগুলো পরিবেশ একত্রে পাওয়া কঠিন, বিশেষ করে নিরেট শক্ত জ্বালানির ক্ষেত্রে—তাই ধোঁয়া হয়। অ্যানথ্রাসাইট আর কোক কয়লার মধ্যে উবে যাওয়ার মত কোনো উপাদান নেই; তাই এ দুটি যখন পোড়ে, ধোঁয়া হয় না। কিন্তু কম তাপমাত্রায় বিটুমিনাস কয়লা আর বিটুমিনাস কয়লা থাকে না, গ্যাস আর আলকাতরা জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে গিয়ে ধুলো আর ছাইয়ের সঙ্গে মিশে ধোঁয়া সৃষ্টি করে।

যে কোনো শহরের বাতাস ভাসমান নিরেট বস্তু কণায় ভরপুর, কিন্তু তার সবটাই ধোঁয়া নয়। এর মধ্যে ধূলো থাকতে পারে, উদ্ভিদ শ্রেণীর পদার্থ

থাকতে পারে, এবং অন্যান্য বস্তুকণা থাকতে:পারে। মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে এদের সবাই থিতিয়ে যায়। ছোট শহর বা শহরতলীতে, এই থিতোনির প্রায় ৭৫ থেকে ১০০ টন সঞ্চিত হয় প্রতি বর্গমাইলে ফি বছরে। বড় শিল্প-নগরীতে, থিতোনির পরিমাণ হতে পারে এর দশগুণ!

ধোঁয়া অনেক বড় ক্ষতি করতে পারে। স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং উদ্ভিদের অনিষ্ট করে। বড় শিল্পনগরীতে, রোদ্দুরের তীব্রতা কমিয়ে দেয় ধোঁয়া—বিশেষ করে কমিয়ে দেয় অতি বেগুনী রশ্মিকে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

বাতাস যদি ধোঁয়াকে ছড়িয়ে না দিত সম্ভবতঃ রোজ কুয়াশা জমত বড় শিল্পনগরীতে। বস্তুতঃ, যেখানে ধোঁয়াশা (ধোঁয়া+কুয়াশা), সেখানেই ফুসফুস আর হৃদ্‌রোগে মৃত্যুর হার বেশী।

উদ্ভিদজগতের ওপর ধোঁয়ার ক্রিয়া বিশেষ করে অনিষ্টকর। গাছ-পালার 'শ্বাসপ্রশ্বাস' ব্যাহত করে ধোঁয়া এবং প্রয়োজনীয় সূর্যালোককে আটকে দেয়। প্রায়ই দেখা যায়, ধোঁয়ার ভেতরকার অ্যাসিডে সরাসরি গাছপালা ধ্বংস হয়েছে!

বর্তমানে, সব শহরেই ধোঁয়া কমানোর সক্রিয় আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, অথবা চেষ্টা চলেছে যাতে ধোঁয়া থেকে শহরের অনিষ্ট রোধ করা যায়।

ধোঁয়াশা কাকে বলে ?

বৃটেনে জোর চেষ্টা চলছে কলকারখানার চিমনী থেকে বেরোনো ধোঁয়া আর বাড়ীতে পোড়ানো কয়লার ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করে ধোঁয়ার ক্ষতিকারক ক্রিয়া কমিয়ে আনার। কোথাও কয়লার আগুন নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোনো কোনো শহরে বিভিন্ন শিল্পজাত গ্যাস বাতাসে মিশে গিয়ে এক রকম কুয়াশা সৃষ্টি করে যার নাম দেওয়া হয়েছে ধোঁয়াশা বা smog। ধোঁয়াশার মধ্যে নিঃশ্বেস নিলেই কাশি আসে। ধোঁয়াশার মধ্যে বিশেষ কয়েকটা fume আর সূক্ষ্ম বস্তুকণা থাকলে তা বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে।

বাতাসে ধুলো থাকে সব সময়ে। ধুলো মানেই তো নিরেট বস্তুর ক্ষুদে কণা যা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। মাটি উড়ে গেলে, সমুদ্র স্প্রে আকারে ছড়িয়ে পড়লে, অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে, জঙ্গলে আগুন লাগলে, মোটর গাড়ীর পেট্রল পুড়লে এবং কলকারখানায় শিল্পজাত দ্রব্যের দহন ক্রিয়ার ফলে যে ধূলো

বেরোয়, তা চিমনীর মাথা দিয়েই বেরিয়ে আসে গলগল করে।

বাতাসে ধুলোর পরিমাণ শুনলে সত্যিই বিশ্বাস হবে না। হিসেব করে দেখা গেছে, ফি বছরে যুক্তরাস্ট্রে ধূলো জমা হয় চার কোটি তিরিশ লক্ষ টন ; এর মধ্যে তিন কোটি দশ লক্ষ টন ধুলো প্রাকৃতিক কারণে জমা হয়। বাকী এক কোটি বিশ লক্ষ টন ধুলো মানুষের কীর্তির ফলে জমা হচ্ছে মানুষেরই মাথার ওপর, ঘরদোরের ওপর।

কাজেই, বড় শিল্প নগরীতেই ধুলোর পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। উদাহরণ স্বরূপ, প্রতিমাসে কয়েকটা বড় শহরে প্রতি বর্গমাইলে কত ধুলো সঞ্চিত হয়, তার একটা মোটামুটি হিসেব দেওয়া হল : ডেট্রয়েট—৭২ টন ; নিউইয়র্ক—৬৯ টন ; শিকাগো—৬১ টন ; পিট্স্বার্গ—৪৬ টন ; লস এঞ্জেল্স্—৩৩ টন। শহরের যে অঞ্চলে শিল্পভবন বেশী, প্রতিমাসে সেখানে প্রতি বর্গ-মাইলে ২০০ টন পর্যন্ত ধুলো জমতে পারে।

স্বাস্থ্যরক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মোকাবিলা করার জন্যে অনেক শহর বাতাসে শিল্পজাত ধুলোর পরিমাণ কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তীব্র আন্দোলন চালাচ্ছে। যে কলকজায় ধুলো হয়, তাকে ছাউনি দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে যাতে ধুলো উড়ে যেতে না পারে। আলোহাওয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা, পাখার জোরালো হাওয়া এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা দিয়েও ধুলোর চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া বন্ধ করার আয়োজন চলছে। কয়েক ক্ষেত্রে জলের স্প্রে পর্যন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু বাতাসের বিপজ্জনক ধোঁয়া—অথবা ধোঁয়াশা —এখনও অব্যাহত।

এই কারণেই তাজমহলের শুভ্র মর্মরও বিরঙ হয়ে যেতে বসেছে কাছেই কারখানার পত্তন হওয়ায়।

গ্যাস কাকে বলে ?

বহু শতাব্দী আগে গ্রীসের ডেলফি বলে একটা জায়গায় একজন মেষপালক অদ্ভুত একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে। জমি থেকে কি যেন উঠে আসার জন্যে সৃষ্টিছাড়া আচরণ করতে থাকে ভেড়ার পাল এবং লোক জনেরও মাথা কি রকম যেন হাল্কা হয়ে যায়, আর অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে থাকে। গ্রীকরা ভাবল, নিশ্চয় দেবতার লীলা। চটপট একটা মন্দিরও তৈরী করে ফেলল লীলাস্থলে। এই লীলা যার কীর্তি, আসলে সে একটা প্রাকৃতিক গ্যাস।

বর্তমান যুগে তিন রকমের মূল গ্যাস আছে পৃথিবীতে : প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লার গ্যাস আর জলীয় গ্যাস। প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রের অস্তিত্ব পৃথিবীর নানান জায়গায় আছে। ভূস্তর সৃষ্টির সময়ে যে-সব পরিবর্তন ঘটেছিল, তার ফলেই ভূতলে এই গ্যাস সঞ্চিত হয়েছে। লম্বা পাইপের মধ্যে দিয়ে এই গ্যাস খুব চাপের মধ্যে রেখে বহু মাইল দূরের শহরে নিয়ে গিয়ে লোহা আর ইস্পাতের কারখানায় এবং অন্যান্য কারখানায় আলো আর শক্তির সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়।

গুঁড়ো কয়লা থেকে কয়লার গ্যাস তৈরী হয়। বিশাল বন্ধ উনুনের মধ্যে বাতাস ঢোকার পথ আটকে, সেই উনুনে গুঁড়ো কয়লাকে গরম করা হয়। উনুনের তাপমাত্রা বিশেষ এক মাত্রায় পৌঁছোলে কয়লা চটচটে হয়ে যায় এবং ভেতরকার গ্যাসকে ছেড়ে দেয়—পাইপের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেই গ্যাসকে।

বিরাট আধারের মধ্যে গ্যাস সঞ্চয় করার পর গ্যাসের কিছু ময়লা এখানে বার করে দেয়। তারপর জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা পাইপের মধ্যে দিয়ে 'স্ক্রাবার'য়ের মধ্যে গ্যাসকে নিয়ে যাওয়া হয়—আরও কিছু ময়লা দূর করা হয় এখানে। তার পর খাঁটি কয়লার গ্যাস একটা বিরাট মিটারের মধ্যে দিয়ে চালান করা হয় যাতে মিটারে মাপা হয়ে যায় গ্যাসের পরিমাণ। মিটার থেকে বেরিয়ে সঞ্চয়-আধারে জমা থাকে গ্যাস, এখানে অনেক পাইপ লাগানো থাকে ; এই সব পাইপের মধ্যে দিয়ে গ্যাস চালান দেওয়া হয় বাড়ী আর কলকারখানায় ব্যবহারের জন্যে।

হিলিয়াম কাকে বলে ?

হিলিয়াম আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতই চাঞ্চল্যকর !

১৮৬৮ খৃস্টাব্দে স্যার নরম্যান লকইয়ার নামে এক বৃটিশ বৈজ্ঞানিক 'স্পেকট্রোসকোপ' নামক একটা যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সূর্য পর্যবেক্ষণ করছিলেন। মৌলিক উপাদান নির্ণয় করতে এই যন্ত্রটি বিলক্ষণ সাহায্য করে বৈজ্ঞানিকদের, কেননা প্রত্যেক মৌলিক উপাদানের জন্য বিশেষ বিশেষ লাইন ফুটে ওঠে বর্ণালীতে।

বর্ণালীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তিনি দেখলেন রহস্যজনক একটা লাইন ফুটে উঠছে—নিশ্চয় একটা মৌলিক উপাদানের লাইন—অথচ সেরকম কোনো মৌলিক উপাদানের পৃথিবীতে অস্তিত্ব আছে বলেই জানা

নেই! গ্রীক শব্দ helios 'মানে সূর্য'; নতুন মৌলিক পদার্থটার নাম হয়ে গেল হিলিয়াম (helium)।

তারপর বৈজ্ঞানিকরা উঠে পড়ে লাগলেন পৃথিবীতেও এই মৌলিক পদার্থটার অস্তিত্ব আছে কিনা দেখবার জন্যে। যথাসময়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আবিষ্কার করলেন যে হিলিয়াম আমাদের বায়ু মণ্ডলেই রয়েছে কিন্তু পরিমাণটা অতিশয় সামান্য। আড়াই লক্ষ ঘনফুট বাতাসের মধ্যে মোটে এক ঘনফুট হিলিয়াম!

আরও অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পর আরো আবিষ্কার করা গেল; হিলিয়াম বেরোয় রেডিয়াম থেকেও; রেডিয়াম থেকে যখন রশ্মি নির্গত হয়, তখন সেই সব রশ্মির অন্যতম 'অ্যালফা-রশ্মি' আসলে তীব্র গতিশীল হিলিয়াম অণু!

দেখা গেল, বাস্তবিকই বড় কাজের জিনিস এই হিলিয়াম। পদার্থটা এত হাল্কা যে অন্য বস্তুকে শূন্যে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা রাখে। এবং যেহেতু হিলিয়ামে আগুন লাগলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে না, কাজেই হিলিয়াম দিয়ে আবহাওয়া বেলুন এবং সেনাবাহিনীর ও নৌবাহিনীর বিবিধ বস্তু নির্মাণ করা সম্ভব।

আমেরিকান গভর্ণমেন্ট দেখলেন, হিলিয়াম যখন এতই কাজের জিনিস, তখন তো এর একটা প্রাকৃতিক উৎস সন্ধান করা দরকার। টেক্সাস, নিউ-মেক্সিকো, ক্যানসাস ইত্যাদি কয়েকটা অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসকূপ আছে। দেখা গেল, এই সব গ্যাসে শতকরা এক অথবা দু'ভাগ হিলিয়াম আছে।

যেহেতু এই উৎসর সমকক্ষ হওয়ার মত আর উৎস পৃথিবীতে নেই, তাই পৃথিবীতে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র সরকারেরই প্রচুর হিলিয়াম আছে! প্রথমদিকে এক ঘনফুট হিলিয়ামের দাম ছিল ২,০০০ ডলার। আজ এর এক ঘনফুটের দাম মোটে সাড়ে তিন পেন্স!

জানো কি ওষুধ-পত্তরেও হিলিয়ামের ব্যবহার আছে? যাদের হাঁপানি আছে, তাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধে হয় হিলিয়াম গ্যাসে। সুড়ঙ্গপথে ডুবুরি আর কর্মীরা যখন উঠে আসে, তখন তাদেরও হিলিয়াম আর অক্সিজেন মিশিয়ে নিঃশ্বেস নিতে হয় বেসামাল না হয়ে যাওয়ার জন্যে!

অণু কত বড়?

প্রথমই বলে রাখি, আজ অণু (atom) সম্বন্ধে আমরা যা জানি, কাল তা পাল্টে যেতে পারে। অণুকে ভাঙার মেশিন তৈরীর পর অণু সম্বন্ধে

ক্রমাগতই নতুন নতুন খবর পাচ্ছে বিজ্ঞান।

অদ্ভুত একটা খবর আগেই জেনে রাখা দরকার। গ্রীক ভাষায় অ্যাটম মানে যাকে ভাগ করা যায় না!

তা সত্ত্বেও কিন্তু আজ পর্যন্ত অ্যাটম বা অণুর মধ্যে কুড়িটা বিভিন্ন কণা পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন, মেসন আর হাইপারন দিয়ে অণু গঠিত হয়েছে। ইলেকট্রিসিটির ক্ষুদে নেগেটিভ চার্জকে যে কণা বহন করে তার নাম ইলেকট্রন। ইলেকট্রিসিটির পজিটিভ চার্জ বহন করে প্রোটন—আকারে এই কণাটি একটা ইলেকট্রনের চেয়ে ১,৮৩৬ গুণ বড়। আরও ভারী নিউট্রন কোনো ইলেকট্রিক চার্জই বহন করে না। পজিট্রনের সাইজ ইলেকট্রনের মতই—পজিট্রন কোনো পজিটিভ চার্জ বহন করে না। একটা ইলেকট্রনকে দু'হাজার ভাগ করলে যা দাঁড়ায়, তার মাত্র একটি ভাগের সমান সাইজ হল নিউট্রিনোর—এর মধ্যেও কোনো চার্জ থাকে না। মেসনের মধ্যে হয় পজিটিভ নয় নেগেটিভ চার্জ আছে। হাইপারন প্রোটনের চেয়ে বড়।

এতগুলো কণা বা চার্জ কিভাবে একত্র হয়ে একটা অণু গঠন করে, আজও তা আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু অণুরাই মৌলিক পদার্থদের সৃষ্টি করেছে এবং এদের প্রত্যেকের প্রভেদ আছে। একটা পার্থক্য হল ওজনের, তাই অণুর ওজন (অ্যাটমিক ওয়েট) দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজানো হয়েছে মৌলিক পদার্থদের। এই হিসেবে হাইড্রোজেন '১' এবং লোহা '৫৫'। এর মানে, লোহার একটা অণু হাইড্রোজেনের একটা অণুর চেয়ে ৫৫ গুণ ভারী।

কিন্তু এই ওজনগুলো খুবই কম। এক গ্রাম ওজনকে একের পিঠে ২৪টা শূন্য দেওয়া সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ওজনটা দাঁড়াবে, হাইড্রোজেনের মাত্র একটা অণুর ওজন তাই!

অণু যে কত ছোট, সে ধারণা আরও স্পষ্ট করার জন্যে এবার দেখা যাক এক গ্রাম হাইড্রোজেনের মধ্যে ক'টা অণু আছে। উত্তর হল ৬য়ের পিঠে ২৩টা শূন্য। এদের যদি গুণতে আরম্ভ কর এবং একটা অণু গুণতে সময় নাও এক সেকেণ্ড, তাহলে এক গ্রাম হাইড্রোজেন অণুদের গুণতে সময় লাগবে একশ কোটি কোটি বছর!

মাকড়শা নিজের জালে ধরা পড়ে না কেন ?

জবর প্রশ্ন সন্দেহ নেই ! মানুষ পর্যন্ত ভুল করলে নিজের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে, মাকড়শা কেন পড়ে না ?

মাকড়শা মাছিকে জালে আটকে দিব্বি ভোজ খায়। আঠালো জালে মাছি বেচারা আটকে যায়। কিন্তু মাকড়শা কেন আটকে যায় না ? জবাবটা শুনলে কিন্তু চক্ষু চড়ক গাছ হবে। মাকড়শাও আটকে যেতে পারে নিজের জালের আঠালো তন্তুতে—কিন্তু তবুও আটকায় না কেবল জাল পাতবার সময়ে মাকড়শা মহাশয় জেনে রাখে ঠিক কোথায় কোথায় পা ফেললে আঠায় পা আটকাবে না। কতকগুলো 'নিরাপদ' সুতো শুরুতে বানিয়ে রাখে যা পায়ে আটকে যাবে না।

অনেক রকম সিল্কের সুতো বোনে মাকড়শা। আঠালো সুতো দিয়ে আটকায় শিকার। কিন্তু আঠালো নয় এমন সুতোও থাকে জালে—মাকড়শাই সেই সুতো বানায় জালটাকে মজবুত করার জন্যে। সাইকেলের চাকায় 'স্পোক' থাকে যেমন—সেইরকম আর কি। মাকড়শার স্পর্শ অনুভূতি অসাধারণ তীক্ষ্ণ বলেই নিরাপদ সুতোর পা ফেলে হাঁটে এবং নিজের জালে জড়িয়ে পড়ে না।

মানুষের ক্ষেত্রেও যারা নিজের জালে জড়িয়ে পড়ে না, তারাও অসাধারণ। নয় কী ?

সোনা এত দামী কেন ?

মানুষ চিরকাল সোনাকে দাম দিয়ে এসেছে। সম্ভবত সোনাই মানুষের প্রথম জানা ধাতু।

সোনাকে অন্য ধাতুর সঙ্গে বা পাথরের সঙ্গে না মিশোনো অবস্থাতেই পাওয়া যায় বলেই বোধ হয় আদিম মানুষ সোনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সোনার রঙ উজ্জ্বল হলুদ এবং দেখতেও বেশ চকচকে। তাই পুরাকালে মানুষ সোনার মালিক হতে চাইত এবং সোনা দিয়ে গয়না গড়াতে চাইত।

অন্য সব ধাতুর চেয়ে সোনাকে সহজেই নানান চেহারা দেওয়া যায়। এটা জানার পর থেকেই দর বাড়তে লাগল সোনার। এক তাল সোনাকে হাতুড়ি মেরে অনায়াসেই পাতলা করে আনা যায় এবং এত নরম যে না

ভেঙে বাঁকানো যায়। পুরাকালের মানুষ ইচ্ছেমত আকারের জিনিসপত্র গড়তে পারত সোনা দিয়ে। যেমন ধরো, চুল আটকে রাখার জন্যে আংটা তৈরী হত সোনা দিয়ে। এই থেকেই সোনার মুকুট পরবার সখ হয় রাজারাজড়াদের।

মাটি থেকে সহজেই যে সোনা পাওয়া যায় তার সরবরাহ কিন্তু কম। অচিরেই দেখা গেল যে মানুষের নিজের সোনা নেই, সে অন্য জিনিসের বিনিময়ে সোনা সংগ্রহ করছে। এই ভাবেই এক জিনিস দিয়ে আর এক জিনিস নেওয়ার মধ্যস্থ হয়ে দাঁড়াল সোনা। অন্য জিনিস লোপ পেলেও সোনা পায় না। কাজেই সোনাকে জমিয়ে রাখা শুরু হল ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসেবে—এমন এক সঞ্চয় যার মূল্য আছে।

কয়েকশ বছর পরে সোনা দিয়ে মোহর তৈরি হল। কতটা পাতলা ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার ওজন কি, এই হিসেবে স্বর্ণমুদ্ররে মূল্য-ও স্থির হল।

পরে নিরাপত্তার খাতিরে পাতাল সিন্দুকে সোনা জমিয়ে রাখা আরম্ভ করলেন ব্যাঙ্কের কর্তারা—লিখে দিলেন চাইলেই সোনা ফেরৎ দেবেন। এই ব্যবস্থা থেকেই সরকার মুদ্রা আর নোট ছাড়ল বাজারে— সেটাও একটা প্রতিশ্রুতি—চাইলেই সোনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

প্রসঙ্গতঃ, পৃথিবীতে খনি থেকে তোলা সোনা যত আছে, তার অর্ধেকের মালিক যুক্তরাস্ট্রের কোষাগার!

রত্ন বলতে কি বোঝায়?

মণি মাণিক্য জিনিসটা চিরকালই মানুষের অতি প্রিয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ রত্নধারণ করেছে ব্যাধির প্রকোপ, উপদেবতার উৎপাত এবং গ্রহশান্তির কারণে; কখনো তাবিজের আকারে কখনো আংটি বা তাগায়। এমন রত্নের কথাও শোনা যায় যার দৌলতে রত্নের মালিক নাকি ভবিষ্যৎ-বাণী করতে পারে। আবার বিশেষ কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধে অপরাধী না নিরপরাধ—তাও বলে দিতে পারে কোনো কোনো রত্ন।

প্রাচীনকালে, শুধু বর্ণ দেখে রত্নের পার্থক্য বোঝা যেত। লাল বর্ণের সমস্ত দামী পাথরকে বলা হত 'রুবি'। সমস্ত সবুজ পাথরকে বলা হত 'এমার‍্যাল্ড' আর নীলচে রঙের সমস্ত পাথরকে বলা হত 'স্যাফায়ার'।

পরে দেখা গেল, কিছু রত্ন অন্য রত্নের চেয়ে বেশী কঠিন এবং টেঁকেও বেশীদিন, তখন বোঝা গেল রত্নের মূল্য কেবল ঔজ্জ্বল্য, বর্ণ আর দুষ্প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে না—করে তার কাঠিন্যের ওপরেও। যেমন ধরো এ যুগে হীরেকে সবচেয়ে দামী পাথর বলা হয় শুধু তার সৌন্দর্যের জন্যে নয়—হীরের মত শক্ত পাথর তো আর নেই।

সব রত্নকেই বলা হয় দামী পাথর। কিন্তু চুলচেরা বিচারে বলতে গেলে, সবচেয়ে মূল্যবান চার রকম পাথরকেই কেবল দামী পাথর বলা চলে : এরা হল হীরে, চুনি (রুবি), পান্না (এমার‍্যাল্ড) এবং নীলকান্ত মণি, (স্যাফায়ার)। অন্যান্য দামী পাথর'আধা-দামী'। এদের মধ্যে পড়ে ওপ্যাল (গোদন্ত মণি), অ্যামীথিষ্ট (জামীরা) এবং টোপ্যাজ (পোখরাজ)। দামী এবং আধাদামী পাথরদের অনেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত।

সবচেয়ে দামী পাথর হীরে সবচেয়ে সরলও বটে। একটি মাত্র মৌলিক পদার্থ খাঁটি কার্বন দিয়ে গঠিত হয় হীরে। 'কোরানডাম' নামক একটা বস্তুর বিবিধ প্রকার হল চুনি আর নীলকান্ত মণি। চুনির কোরানডামের মধ্যে সামান্য লোহা থাকে বলে রঙটা হয় ঐ রকম (Carmine Colour)। নীলকান্ত মণি উজ্জ্বল নীল বা মখমল নীল হয় নানান ধরনের অক্সাইড থাকে বলে।

সিলিকেট নামক একটা বস্তুর নানা রকম মিশ্রণে সৃষ্টি হয় বেশ কিছু অত্যন্ত সুন্দর রত্ন। সিলিকেট দলে পড়ে টোপ্যাজ আর টুরম্যালিন রত্ন। গারনেট আর জেড পাথরও সিলিকেট। কিছু কম দামী রত্ন কোয়ার্জ শ্রেণীতে পড়ে—কোয়ার্জ মানে নিখাদ সিলিকা। অ্যামীথিষ্ট এদের অন্যতম। ওপ্যাল ও সিলিকা—শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগ জল থাকে ভেতরে। যে ক'টা দামী পাথর তাদের অধিকারীদের অমঙ্গল ঘটিয়ে ছাড়ে, ওপ্যাল নাকি তাদের অন্যতম। সুপ্রাচীন এই কুসংস্কারের জন্যে আজও অনেকে ওপ্যাল ধারণ করতে চায় না।

কৃত্রিমভাবে দামী পাথর তৈরীর প্রক্রিয়া সবে আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেছে আজকের বিজ্ঞান। এদের মধ্যে আছে হীরে, পান্না, চুনি আর নীলকান্ত মণি। কৃত্রিম ভাবে তৈরী হলেও পাথরগুলো কিন্তু নকল পাথর নয়—হুবহু প্রাকৃতিক পাথরের মতই—শুধু যা তৈরী হচ্ছে ল্যাবোরেটরীতে!

লোহায় মরচে পড়ে কেন ?

ভিজে বা স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় এক টুকরো লোহা কিছুদিন পড়ে থাকলে দেখা যায় মরচের স্তরে ঢাকা পড়ে গেছে লৌহখণ্ড—ঠিক যেন কেউ লাল রঙ মাখিয়ে দিয়ে গেছে।

মরচে জিনিসটা তাহলে কী ? লোহা আর ইস্পাতের ওপর মরচের আবির্ভাব ঘটে কেন ? আয়রন অক্সাইডকে বলা হয় মরচে। জলের মধ্যে গুলে থাকা অক্সিজেন যখন লোহার সঙ্গে মিলিত হয়ে লোহাকে 'পুড়িয়ে' দেয়, মরচের সৃষ্টি হয় তখন।

এর মানে, বাতাসে যদি আর্দ্রতা না থাকে, অথবা জল যদি সত্যি সত্যি হাজির না থাকে, অক্সিজেন জলে গুলে যায় না এবং মরচে সৃষ্টি হয় না।

চকচকে লোহার গায়ে এক ফোঁটা বৃষ্টির জল যদি পড়ে, সেই জলবিন্দু স্বল্পক্ষণের জন্যে পরিষ্কার থাকে। কিন্তু দেখতে দেখতে জলের মধ্যেকার অক্সিজেনের সঙ্গে মিলন ঘটে লোহার ; অর্থাৎ আয়রন অক্সাইড অথবা মরচে সৃষ্টি হয়ে যায় জলবিন্দুর মধ্যে। লালচে রঙ হয়ে যায় জলবিন্দুর এবং মরচে ভাসতে থাকে জলের মধ্যে। জল উবে গেলে মরচে থেকে যাবে এবং লোহার গায়ে লালচে স্তর পড়বে। মরচে ধরা একবার শুরু হলে শুকনো বাতাসেও ছড়িয়ে পড়বে মরচে। কেননা, মরচে ধরা জায়গাটার অমসৃণ খরখরে লৌহগাত্র বাতাসের মত সামান্যতম আর্দ্রতা থাকলেও তাকে ঘনীভূত হতে সাহায্য করে, আর্দ্রতাকে আকর্ষণ করে এবং ধরে রাখে। এই কারণেই মরচে একবার ধরে গেলে তার ছড়িয়ে পড়া রোধ করা শক্ত। অনেক সহজ হল মরচে না পড়তে দেওয়া।

স্যাঁতসেঁতে বাতাস কাকে বলে ?

এক পাত্র বরফজল টেবিলে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার পর কি ঘটে বলো তো ? পাত্রের বাইরের গায়ে আর্দ্রতা জমে। এ আর্দ্রতা আসে কোত্থেকে ? আসে বাতাস থেকে।

আসল ব্যাপারটা হল এই, জল-বাষ্পের আকারে বাতাসে আর্দ্রতা সব সময়েই আছে। বরফজল ভর্তি পাত্রের শীতল গায়ে সেই বাষ্পই জমা হলে

দেখা যায়। কিন্তু বাতাসের মধ্যেকার বাষ্প অদৃশ্য। 'হিউমিডিটি' অর্থাৎ স্যাঁতসেঁতে বাতাস বলতে বোঝায় বাতাসে এই আর্দ্রতার অস্তিত্ব। আর্দ্রতার অস্তিত্ব সর্বত্র—এমন কি বিশাল মরুভূমির মধ্যেও।

এর মানে এই যে, বাতাস স্যাঁৎসেঁতে সব সময়ই, কিন্তু স্যাঁৎসেঁতে অবস্থাটা সব সময়ে সমান নয়। স্যাঁৎসেঁতে অবস্থাকে বোঝানোর বেশ কয়েকটা পন্থা আছে। এদের একটির নাম 'অ্যাবসলিউট হিউমিডিটি', আর একটির নাম 'রিলেটিভ' হিউমিডিটি'। দেখা যাক, কি মানে এদের।

বাতাসের প্রতি একক পরিমাণ (Unit Volume) বাতাসের মধ্যে জল বাষ্প যতখানি থাকে, তাকে বলা হয় 'অ্যাবসলিউট হিউমিডিটি'। এক ঘনফুট বাতাসে অনেক গ্রেণ জল বাষ্প থাকতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ কার্যকরী ক্ষেত্রে, এ ব্যাখ্যায় বিশেষ কিছু জানা যায় না। বাতাস শুষ্ক না স্যাঁৎসেঁতে, সুখকর কি কষ্টকর—কিছুই বোঝা যাবে না যদি বলা যায় 'এক ঘন ফুটে চার গ্রেণ'। তোমার গা থেকে আর্দ্রতা যত তাড়াতাড়ি উবে যাবে বাতাসে, ততই তোমার আরাম লাগবে। উবে দেওয়ার ক্ষমতা বাতাসের তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে এবং বাতাসের এই উবে দেওয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত দিতে পারে না 'অ্যাবসলিউট হিউমিডিটি'।

শতকরা হিসেবে বোঝানো হয় রিলেটিভ হিউমিডিটিকে। 'একশ শতাংশ' মানে বুঝতে হবে বাতাস জল বাষ্পে ভরপুর—আর জায়গা নেই। তাপমাত্রা যত বাড়বে, তত বেশী জল বাষ্প ধরে রাখবার ক্ষমতা বাড়বে বাতাসের। এই কারণে, তপ্ত দিবসে 'নব্বই শতাংশ রিলেটিভ হিউমিডিটি' মানে বাতাসে ভয়ানক আর্দ্রতা—প্রাণটা আইঢাই করবে এমন দিনে!

রেডিয়াম কাকে বলে ?

রেডিও অ্যাকটিভ মৌলিক পদার্থকে বলা হয় রেডিয়াম। এবার দেখা যাক, 'রেডিও অ্যাকটিভ' মানে কি।

অনেক পরমাণু দিয়ে গড়ে ওঠে এক-একটা মৌলিক পদার্থ। বেশীর ভাগ পরমাণুই স্থায়ী, যার মানে এই যে বছর বছর তারা পালটে যায় না। কিন্তু সবচেয়ে ভারী পরমাণুদের কয়েকটি ভেঙে যায় এবং অন্য ধরনের পরমাণু হয়ে যায়। এই ভেঙে যাওয়া, বা ক্ষয়কে বলা হয় রেডিও অ্যাকটি-ভিটি', বাংলায় তেজস্ক্রিয়তা।

সব তেজস্ক্রিয় (রেডিও অ্যাকটিভ) পদার্থই ক্ষয় বা ভাঙনের সময় বিশেষ হারে রশ্মি বিকিরণ করতে থাকে। মানুষের জানা আছে এমনি কোনো পদ্ধতি দিয়ে এই হারকে বাড়ানো বা কমানো যায় না। কেউ পালটায় দ্রুত, কেউ আস্তে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এই ক্রিয়াকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

রেডিয়ামের ক্ষেত্রে এই ক্ষয় চলতেই থাকে, যতক্ষণ না রেডিয়াম ভেঙে গিয়ে শেষকালে সিসে হয়ে যাচ্ছে।

রেডিয়াম আবিষ্কার করেন মাদাম কুরী আর তাঁর স্বামী পিয়েরা কুরী। এক টন পিচব্লেণ্ড শোধন করছিলেন ওঁরা। পিচব্লেণ্ড একরকম আকরিক ধাতু (ore) যার মধ্যে ইউরেনিয়াম থাকে। ওঁরা জানতেন ইউরেনিয়াম অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করছে। সেই সঙ্গে অনুভব করেছিলেন আরও একটা বস্তুর অস্তিত্ব যা অনেক বেশী শক্তিশালী। প্রথমে পেলেন পোলোনিয়াম। পোলোনিয়ামও একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ক্ষুদে এক কণা রেডিয়ামকে বার করলেন সবশেষে।

অ্যালফা, বিটা আর গামা রশ্মি নামে তিন ধরনের রশ্মি বিকিরণ করে রেডিয়াম। হিলিয়াম গ্যাসের দ্রুতসঞ্চারী বস্তুকণাকে বলে অ্যালফা রশ্মি। দ্রুত-সঞ্চারী ইলেকট্রনকে বলে বিটা রশ্মি। গামা রশ্মি, রঞ্জন রশ্মির (এক্স-রে) মতই—তবে সাধারণতঃ আরো বেশী সিধে যাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন। যে পরমাণু থেকে এই সব রশ্মি নির্গত হচ্ছে, সেই পরমাণু ভেঙে গিয়ে অন্য পরমাণুতে পরিণত হয় এই সব রশ্মি বেরিয়ে যেতে থাকলে। এই পরিবর্তনকে বলা হয় অ্যাটমিক ট্রান্সমিউটেশন। বাংলায় বলা যেতে পারে পারমাণবিক পরিবর্তন।

কানাডার গ্রেট বীয়ার লেক অঞ্চলে রেডিয়াম সঞ্চিত পিচব্লেণ্ডের যে খনিটি পাওয়া গেছে, আজ পর্যন্ত তার চেয়ে বড় খনি পৃথিবীতে আর আবিষ্কৃত হয় নি।

রেডিও অ্যাকটিভিটি কাকে বলে ?

রেডিও অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তার নাম শোনেনি বা তাই নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় নি, এমন মানুষ আজকের দুনিয়ায় বিরল। আমরা জানি, অ্যাটম বোমা টেস্ট করতে গিয়ে রেডিও অ্যাকটিভিটির সৃষ্টি হচ্ছে—যে

কারণে মানবজাতির অন্যতম বৃহত্তম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই তেজস্ক্রিয়তা। কিন্তু এই তেজস্ক্রিয়তা জিনিসটা কী? মানুষের পক্ষে কেনই বা এত ক্ষতি-কারক এই তেজস্ক্রিয়তা?

শুরু করা যাক পরমাণুকে নিয়ে। যে কোনো পদার্থের পরমাণু গঠন অনেকটা আমাদের এই সৌরজগতের মত। সূর্যের বদলে মাঝখানে রয়েছে একটা নিউক্লিয়াস, আর গ্রহদের বদলে নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করছে ইলেক-ট্রনরা। এক বা একাধিক পজিটিভ চার্জ সম্পন্ন বস্তুকণা দিয়ে গঠিত হয়েছে নিউক্লিয়াস।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে থেকে এক বা একাধিক কণাকে কোনো কিছুর জন্যে যদি বেরিয়ে যেতে হয়, তাহলেই রেডিও অ্যাকটিভিটির সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে রশ্মির আকারে (গামা রশ্মি) শক্তি বা এনার্জিকে বার করে দিতে পারে পরমাণু।

কিছু মৌলিক পদার্থ স্বভাবতঃই রেডিও অ্যাকটিভ। এর মানে এই যে ক্রমাগতই বস্তুকণা ছেড়ে চলেছে পরমাণুরা। এ ঘটনা যখন ঘটে, তখন আমরা এই অবস্থাকে বলি disintegrating, অর্থাৎ মূল অংশ সমূহে পৃথক হয়ে যাওয়া। বস্তুকণাগুলো বেরিয়ে গেলেই মৌলিক পদার্থটার পরিবর্তন ঘটে। রেডিয়ামও স্বভাবতঃ রেডিও অ্যাকটিভ বলে ক্রমাগত বস্তুকণা ছেড়ে চলেছে এবং ক্রমাগত মূল অংশ সমূহ ভেঙে চলেছে—অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করছে—শেষকালে সিসেতে পরিণত হচ্ছে।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করার কৌশল এখন জেনে ফেলেছেন বৈজ্ঞানি-করা। বিশেষ কয়েকটা মৌলিক পদার্থের পরমাণুদের বস্তুকণা দিয়ে তীব্র আঘাত হেনে, এই পরমাণুদের মূল অংশ সমূহে ভেঙে এনে রেডিও অ্যাকটিভ করে তুলতে পারেন। আঘাত প্রাপ্ত পরমাণুরা তখন শক্তি বিকিরণ করতে থাকে। এই কারণেই এই সব যন্ত্রকে বলা হয় ' অ্যাটম স্ম্যাসার ' বা পরমাণু চূর্ণ করার মেশিন।

মানুষের কাছে তেজস্ক্রিয়তা বিপজ্জনক কেন? চূর্ণ হয়ে যাওয়া পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসা উড়ন্ত বস্তুকণাগুলোকে মনে মনে কল্পনা করো। উড়ন্ত, ছুটন্ত এই বস্তুকণারা অন্যান্য পরমাণুদের আঘাত হানতে পারে, এবং তাদেরকেও ভেঙে দিতে পারে, রাসানিক ধর্ম পাল্টে দিতে পারে। বস্তু-কণাগুলো যদি জীবন্ত জীবকোষকে আঘাত হানে, তাদের মধ্যেও পরি-এনে দিতে পারে। চামড়া পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে, রক্তের লাল

কোষদের ধ্বংস করতে পারে এবং অন্যান্য কোষদেরও পাল্টে দিতে পারে।

সেই কারণেই নানানভাবে তেজস্ক্রিয়তা মানুষের যেমন অনেক উপকার করতে পারে, তেমনি বিপজ্জনক এবং ধ্বংসাত্মকও হতে পারে।

এক্স-রে কাকে বলে?

১৮৯৫ সালে জার্মানীতে উইলহেম রন্টজেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন। অনেক সময়ে এক্স-রে,কে 'রন্টজেন রে' বা 'রঞ্জন রশ্মি' বলা হয়।

আলোক-রশ্মির মতই বিঁধে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে এক্স-রে। আলোক রশ্মি আর রঞ্জন রশ্মির মধ্যে তফাৎ শুধু ওদের তরঙ্গ আর শক্তিতে। সবুজ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যা, তার ১৫ হাজার ভাগের এক ভাগ থেকে আরম্ভ করে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত এক্স-রে টিউব নির্গত ক্ষুদ্রতম তরঙ্গের দৈর্ঘ্য। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত ছোট হবে, বিঁধে যাওয়ার ক্ষমতা তার তত বেশী থাকবে। এই কারণেই অনেক বস্তুর মধ্যে দিয়ে আলোক-রশ্মি যেতে পারে না, কিন্তু রঞ্জন রশ্মি যায়।

এক্স-রে'র উৎপাদন ঘটে এক্স-রে টিউবের মধ্যে। টিউবের মধ্যে থেকে বাতাস পাম্প করে বার করে দেওয়া হয়—আদিতে যে পরিমাণ বাতাস ছিল, তার দশকোটি ভাগেরও কম পরিমাণ বাতাস না থাকা পর্যন্ত বাতাস বার করা অব্যাহত থাকে! টিউবটা সাধারণতঃ তৈরী হয় কাঁচ দিয়ে। ভেতরে থাকে দুটো ইলেকট্রোড; একটার নাম ক্যাথোড—এতে থাকে নেগেটিভ চার্জ। টাংসটেন তারের কুণ্ডলি থাকে এর মধ্যে; ইলেকট্রিক কারেন্ট দিয়ে তারের কুণ্ডলিটা গরম করলেই ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। অন্য ইলেকট্রোডটাকে বলে 'টার্গেট' বা 'অ্যানোড'।

ক্যাথোড আর টার্গেটের মধ্যে পার্থক্যের দরুন ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রনরা অত্যন্ত বিপুল বেগে ধেয়ে যায় টার্গেটের দিকে। যে গতিবেগে আছড়ে পড়ে টার্গেটে তা সেকেণ্ডে ষাট হাজার মাইল থেকে আরম্ভ করে পৌন দু'লক্ষ মাইল পর্যন্ত হতে পারে।

টার্গেট জিনিসটা হয় একটা টাংসটেন চাঁই অথবা টাংসটেনের চাকা; ইলেকট্রনদের আচমকা থামিয়ে দেয় এই টার্গেট। লেকট্রনদের বেশীর ভাগ পাল্টে গিয়ে তাপ হয়ে যায়, কিন্তু কিছু হয়ে যায় এক্স-বিকিরণ এবং এক্স-রে আকারে বেরিয়ে আসে তলার একটা জানলা দিয়ে।

তোমার শরীরের হাড়ের এক্স-রে ছবি নেওয়া হয় কি করে ভেবেছো কখনো? এক্স-রে ছবি আসলে একটা ছায়া-ছবি। শরীরের যে অংশটার এক্স-রে করা হচ্ছে, এক্স-রে তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে চলে যায় এবং ফিল্মের ওপর ছায়াপাত ঘটায়। ফিল্মের দুদিকেই আলোক সচেতন এক রকম কেমিক্যাল মাখানো থাকে। এক্স-রে সেই ফিল্মের ওপর ফেলবার পর সাধারণ ফোটোগ্রাফিক ফিল্মের মতই এই ফিল্মকে ডেভালাপ করা হয়। হাড় বা অন্য যে সব জিনিসের মধ্যে দিয়ে এক্স-রে যেতে পারে না, সহজেই তাদের একটু বেশী ঘন ছায়া ফেলে এবং ফিল্মের ওপর তাদের হাল্কা অঞ্চল হিসেবে দেখা যায়।

আজকের দিনে ওষুধ, বিজ্ঞান এবং শিল্পে এক্স-রে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে, এবং মানুষের অত্যন্ত দরকারী যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কসমিক রে কাকে বলে?

স্যাটেলাইট অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহকে যখন আকাশে উঠিয়ে দেওয়া হয়, তখন তার মধ্যে অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি এবং মাপজোপ করার ব্যবস্থা থাকে। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই কসমিক রে অর্থাৎ মহাজাগতিক রশ্মির অস্তিত্ব নির্ণয় করার জন্যে এবং তা মাপবার জন্যে কিছু না কিছু যন্ত্রপাতি থাকেই। মহাজাগতিক রশ্মি আজও চাঞ্চল্যকর, রহস্যজনক এবং অব্যাখ্যাত—কল্প-বিজ্ঞান সাহিত্যে যে রকমটি দেখা যায়—ঠিক সেই রকম!

প্রায় ষাট বছর আগে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন বৈজ্ঞানিকরা। ওঁরা দেখলেন, একট বন্ধ আধারের মধ্যে বাতাসের নমুনার মধ্যে সামান্য পরিমাণ তড়িৎ সঞ্চালন শক্তি (electrical conductivity) রয়েছে। পুরু আচ্ছাদন দিয়ে আধারটিকে ঘিরে দেওয়ার পরেও দেখা গেল তড়িৎ সঞ্চালন শক্তি থেকে যাচ্ছে আবদ্ধ বাতাসের মধ্যে। তার মানে, এমন এক ধরনের বিকিরণ আধারের মধ্যে প্রবেশ করছে—যার বিদ্ধ করার ক্ষমতা জ্ঞাত যে কোনো পদার্থের বিদ্ধ করায় ক্ষমতার চেয়ে (Penetrating) অনেক বেশী!

রহস্যজনক এই বিকিরণ আসছে কোত্থেকে? জবাব পাওয়ার জন্যে সব রকম পরীক্ষা নিরীক্ষাই করা হল। প্রথমেই প্রমাণ করা হল—বিকিরণটা ডাঙা থেকে আসছে না, কেননা সমুদ্রের ওপরেও রয়েছে এই বিকিরণ।

যেহেতু দিনে এবং রাতে এ-বিকিরণ থাকে, অতএব সূর্য থেকেও তা আসছে না। বেলুনে চড়ে অনেক উঁচুতে গিয়ে দেখা গেছে, মহাশূন্যের সর্বত্র বিরাজ করছে এই বিকিরণ, অর্থাৎ তা 'কসমিক' মানে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী, অথবা 'মহাজাগতিক'।

কসমিক রে আসলে তাহলে কী? পারমাণবিক কণাকে বলা হয় কসমিক রে। আলোক-রশ্মির প্রায় কাছাকাছি গতিবেগে পৃথিবীর বায়ুস্তরের বাইরে মহাশূন্য দিয়ে তারা ছুটে চলেছে। এদের কিছু কিছু পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে এবং বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

এই পারমাণবিক কণাদের নাম 'প্রাইমারি কসমিক রে'। বাতাসের পরমাণুর সঙ্গে এদের সংঘর্ষ লাগে। সংঘর্ষের ফলে নতুন কণার সৃষ্টি হয় এবং এই নতুন কণারাও প্রাইমারি কসমিক রে'র কণারা যেদিকে ছুটছে, সেই দিকেই বিপুল বেগে ছুটে যায়। এই নতুন কণাদের বলা হয় 'সেকেণ্ডারী কসমিক রে' এরাও আবার অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে আরও নতুন কণা সৃষ্টি করে। ফলে, বৃষ্টির মত বিকিরণ আছড়ে পড়ে পৃথিবীতে। মহাশূন্য থেকে ছুটে আসা এমনি একটা প্রোটন যতখানি বিকিরণের সৃষ্টি করতে পারে তা এক হাজার বর্গফুট জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে!

যদ্দুর জানা গেছে, পৃথিবীর ওপর কসমিক রে'র এই বিরামবিহীন সংঘাত পৃথিবীর পক্ষে অনিষ্টকর নয়, কেননা লক্ষ কোটি বছর এই সংঘাত হয়ে চলেছে—পৃথিবী-পৃষ্ঠে প্রাণের বিকাশ তাতে ব্যাহত হয় নি।

বিজ্ঞান আজও জানে না, কসমিক রে'র উৎপত্তি কোথায়। মহাশূন্যে এখন অবশ্য আমাদেম অভিযান আরম্ভ হয়ে গেছে। একদিন হয়ত এ রহস্যের সমাধান ঘটবে।

পারমাণবিক শক্তি কাকে বলে?

পারমাণবিক শক্তি বা অ্যাটমিক এনার্জি পাওয়া যায় অ্যাটম বা পরমাণু থেকে। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে শক্তির কণা থাকে। পরমাণুর অংশগুলোকে একসঙ্গে ধরে রেখে দেয় এই শক্তি। সেই কারণেই, পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে শক্তির উৎস হল পরমাণুর কেন্দ্র। পরমাণুকে ভাঙলেই এই শক্তি মুক্তি পায়।

আসলে কিন্তু পরমাণুদের কাছ থেকে শক্তি পাওয়ার পথ দুটো, একটার

নাম Fusion (গলন), আর একটার নাম Fission (বিভিন্ন অংশে ভঙ্গ-করণ)। ফিউশন ঘটলে ছটো পরমাণু জুড়ে গিয়ে একটা অ্যাটম হয়ে যায়। পরমাণু ভেঙে যাওয়া মানে উত্তাপের আকারে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে আসা। সূর্যের বেশীর ভাগ শক্তিই সূর্যের ভেতরকার Fusion অর্থাৎ দুটো পরমাণু জুড়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়ে চলেছে। পারমাণবিক শক্তির এ গেল একটা দিক।

পারমাণবিক শক্তি আর এক রকমভাবে বেরিয়ে আসে Fission প্রক্রিয়া অর্থাৎ পরমাণু ভেঙে যাওয়ার ফলে। একটা পরমাণু যখন ভেঙে দুটো হয়ে যায়, তখন তাকে বলে Fission প্রক্রিয়া। পরমাণুরই অংশ দিয়ে পরমাণুকে তীব্র আঘাত হেনে (বম্বার্ডিং) এই প্রক্রিয়া ঘটানো হয়। পরমাণুর অন্যতম অংশ নিউট্রন—নিউট্রন দিয়েও বম্বার্ড করে পরমাণু ভেঙে দু' টুকরো করা যায়।

নিউট্রন দিয়ে বম্বার্ড করলেও প্রতিবারেই পরমাণু ভেঙে যায় না। বস্তুতঃ বেশীর ভাগ পরমাণুকেই ভেঙে দু' টুকরো করার পর্যায়ে আনা যায় না। কিন্তু উপযুক্ত অবস্থায় দু' টুকরো হয়ে যায় ইউরেনিয়াম আর প্লুটো-নিয়াম।

এক ধরনের ইউরেনিয়াম (U-235) নিউট্রনের সংঘাতে দু' টুকরো হয়ে যায়। U-235 কে বলা হয় ইউরেনিয়ামের 'আইসোটোপ'। দু'টুকরো হয়ে যাওয়ার সময়ে কতখানি শক্তি বেরিয়ে আসে জানো? এক পাউণ্ড কয়লা পোড়ালে যতখানি শক্তি পাওয়া যায়, তার দশ লক্ষগুণ শক্তি বেরিয়ে আসবে মাত্র এক পাউণ্ড U-235 থেকে! নুড়ির মত ক্ষুদে এক টুকরো ইউরেনিয়াম দিয়ে সমুদ্রগামী একটা জাহাজ, অথবা একটা এরোপ্লেন, এমন কি একটা জেনারেটরও চালানো যায়। মনে রেখো, এই কারণেই ভবিষ্যতে মানুষের প্রয়োজন মত শক্তির মূল যোগান আসবে হয়ত পারমাণবিক শক্তি থেকে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ কাকে বলে ?

আপেক্ষিকতাবাদ অথবা থিওরী অফ রিলেটিভিটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সবাই বলেছিলেন, এ তত্ত্ব বোঝবার মত বৈজ্ঞানিক সারা পৃথিবীতে

ভজন খানেক আছে। কাজেই কারিগরি খুঁটিনাটির মাধ্যমে এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করাটাও সম্ভব হবে না এই বইয়ের পাতায়। কিন্তু আইনস্টাইন কি নিয়ে গবেষণা করছিলেন, কোন্ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, তার একটা মোটামুটি ধারণা জানা থাকলে অনেক কাজে লাগবে।

অভিজ্ঞতা থেকেই সবাই জানেন, সব রকম গতিই 'আপেক্ষিক'। তার মানে এই যে, গতিটাকে অন্য একটা গতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে মাপতে হয়। যেমন ধরো, তুমি রেলগাড়ীতে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছো, সাঁৎ সাঁৎ করে বাইরের জিনিস সরে যাচ্ছে বলেই বুঝতে পারো তুমি নিজে গতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তোমার উল্টোদিকের বেঞ্চিতে যে ভদ্রলোক বসে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে যদি তোমার গতিবেগ মাপতে যাও, তাহলে তো তুমি গতিবেগের মধ্যেই নেই! কেননা, সে ভদ্রলোকও বসে রয়েছেন— তুমিও বসে আছো!

কাজেই গতিবেগের অস্তিত্বের মানে তখনই থাকবে যখন সেই গতিবেগকে কোনো একটা স্থির কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হবে। আইনস্টাই-নের তত্ত্বের সব প্রথম মূল অংশ হল এইটা। আমরা বরং একে এইভাবে লিখতে পারি : এক রকম গতিবেগে ধাবমান কোনো বস্তুর গতিবেগ নজরেই আসবে না শুধু সেই বস্তুটিকে পর্যবেক্ষণ করলে।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের দ্বিতীয় মূল অংশ বলছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র আলোর গতিবেগই কখনো পাল্টাচ্ছে না। আমরা জানি, আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। কিন্তু এই গতিবেগ পালটাতে পারে না, এমন ধারণা করাটাও ফ্যানট্যাসটিক, তাই না? কেন এই ধারণাটা এত বিস্ময়কর, এবার তা দেখা যাক? যখন বলি একটা গাড়ী ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে ছুটছে, তখন কিন্তু এই গতিবেগকে বোঝাই এমন একটা বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে যা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে ধাবমান গাড়ীখানা যদি ঘন্টায় ৪০ মাইল বেগে ধাবমান কোনো গাড়ীকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তখন কিন্তু প্রথম গাড়ীখানার গতিবেগ দাঁড়াচ্ছে ঘন্টায় ২০ মাইল। এখন দ্বিতীয় গাড়ীখানা যদি প্রথম গাড়ীখানা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে না গিয়ে উল্টোদিক থেকে আসে, তাহলে দুটো গাড়ীই পরস্পরের পাশ কাটিয়ে যাবে ঘন্টায় ১০০ মাইল গতিবেগে।

আইনস্টাইনের মতে, একটি আলোক রশ্মির গতিবেগ যদি এইভাবেই

মাপা যায় (উদাহরণ স্বরূপ, আমরা যেদিকে ধেয়ে চলেছি তার উল্টোদিক থেকে যদি আলোক রশ্মি ধেয়ে আসে), তাহলেও কোনো তফাৎ থাকছে না। আলোক রশ্মি টি উল্টোদিক থেকে আসা সত্ত্বেও সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগেই ধেয়ে যাবে—বেড়ে যাবে না! আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ তত্ত্বের মোটামুটি একটা ধারণা এই থেকে পাবে। আইন-স্টাইন অন্যান্য অনেক বিষয় দেখিয়েছেন তাঁর এই চাঞ্চল্যকর তত্ত্বের মধ্যে, এদের মধ্যে আছে শক্তি অথবা এনার্জি এবং বস্তুর ভর ; দেখিয়েছেন, কিভাবে একটা আর একটায় পরিণত হতে পারে।

ভারতের মহীসোপানে কত সম্পদ আছে ?

মহাদেশের যে অংশটা সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে নিচে নেমে গেছে, তাকে বলে মহীসোপান বা কন্টিনেন্ট্যাল সেল্‌ফ।

রাস্ট্রসংঘের উদ্যোগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সামুদ্রিক সম্মেলনের কানুন অনু-সারে সমুদ্রতীরবর্তী কোনো দেশের এলাকা সমুদ্রের ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ধরে নিতে হবে এবং এই ২০০ মাইলের সমস্ত সামুদ্রিক সম্পদের অধিকারী হবে সেই দেশটি। সে দেশছাড়া অন্য কোন দেশের অধিকার থাকবে না এই অঞ্চলের সম্পদ ভোগ করার।

হিসেব করে দেখা গেছে, ভারতের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের ক্ষেত্রফল কুড়ি লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং এই বিরাট অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ভারতের মহীসোপানে সমুদ্রতলের এক বর্গমাইল অঞ্চলে ৩০,০০০ টন ম্যান্‌গানিজ, ২,৬০০ টন অ্যালুমুনিয়াম, ২,৩০০ টন ক্যাডমিয়াম, ১,৭০০ টন লোহা, ৪০০ টন কোবাল্ট ১,২০০ টন নিকেল এবং ৬৫০ টন তামা থাকা সম্ভব। এছাড়াও উপকূলের ধারে কাছে সমুদ্রের মধ্যে ২২ কোটি টন তেল এবং ১৩ হাজার কোটি ঘনফুট গ্যাস থাকা সম্ভব।

আন্দাজি হিসেব অনুযায়ী, ভারতের উপকূলের তিরিশ মাইলের মধ্যে রয়েছে প্রায় দেড় কোটি টন মাছ। স্যাণ্ডহেড এবং পারাদ্বীপের কাছে আছে প্রচুর গলদা চিংড়ি আর বাগদা চিংড়ি—এই মাছ চুরি করে নিয়ে যায় তাই-ওয়ান, বর্মা আর ইন্দোনেশিয়ার মাছ-ধরা জাহাজ (ট্রলার)।

দেড় কোটি টন মাছের মধ্যে ধরা হয় মাত্র ২৫ লক্ষ টন (এক বছরে) এবং এর মধ্যে থেকে মাত্র দশ লক্ষ টন জোটে ভারতের ভাগ্যে!

এদিকে মাছের স্বাদ ভুলতে বসেছে বাঙালীরা!

পাঁউরুটির প্রচলন হলো কবে থেকে ?

পাঁউরুটি কথাটা বিদেশী অর্থাৎ পোর্তুগীজ শব্দ। বাংলার এই শব্দটির ব্যাপক ভাবে প্রচলন আছে। ইংরাজীতে একেই বলে লোফ। অনেকে একে ব্রেড-ও বলে। কিন্তু 'ব্রেড' বলতে হাতে গড়া রুটিকেই বোঝায়। ফাঁপা রুটির নাম পাঁউরুটি বা লোফ।

নানা দেশের নানা রকমের খাদ্যের প্রচলন আছে। কিন্তু পাঁউরুটির প্রচলন আজকাল সারা বিশ্বে সর্বত্রই চালু হয়ে গেছে। মানুষ বুঝতে পেরেছে যে শস্য থেকে তৈরি যে কোনও খাদ্যবস্তু খুবই উপকারী ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

মানুষ আগে এই সব শস্যকে অর্থাৎ গম জোয়ার ও অন্যান্য শস্যকে চিবিয়ে খেয়ে পেট ভরাতো। পরে মিশরীয়গণ একে পাথরের মধ্যে রেখে পিষে নিয়ে আটা বা ময়দা বার করে নিতো। এতে জল মিশিয়ে তাল করে নিতো। মাটির মধ্যে গর্ত করে তৈরি করা উনুনে সেই সব তালকে সেঁকে নিতো। পাঁউরুটিকে ফাঁপানো ও হালকা করার জন্য কোনও রকম খমির বা খামি মেশানো হতো না। তাই তখনকার পাঁউরুটি খুব ভারী ও শক্ত হতো। হিব্রুরাই প্রথমে টক মিশিয়ে খামি-র কাজ করতে শিখলো। মিশরীয়রাই প্রথমে খামি আবিষ্কার করে এই তালের সঙ্গে মিশিয়ে পাঁউরুটিকে হালকা করতে ও ফাঁপাতে শিখলো। হিব্রুরা টিনের চাদরে সেঁকতো; আর না কেটে, একে ভেঙ্গে নিতো।

ইহুদিরা ও খৃষ্টানরাও কোন ভোজন উৎসবের প্রারম্ভে রুটি ভেঙ্গেই (রুটি কেটে নয়) উৎসব চালু করতো।

বর্তমান যুগে বান, আলু, ঘাস, গাছের ছাল, চাল, মটর প্রভৃতি থেকে পাঁউরুটি তৈরি হয়।

মানুষ হাসে কেন ?

সার্কাসের ভাঁড় বা ক্লাউনদের কিংবা হাস্য রসাত্মক লেখক-লেখিকাদের এর উত্তরটা জেনে রাখা উচিত। উত্তরটা যত সহজ বলে মনে হয়, ততটা সহজ সরল কিন্তু নয়। কারণ হাসি একটা জটিল ক্রিয়াকলাপ যার ব্যাখ্যা হয় না।

মনের মধ্যে নানা প্রকার ভাবের বাহ্যিক প্রকাশ থেকেই হয় হাসির

উৎপত্তি। আর এটা শুধু মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানীদের মনে দুটি প্রশ্নের উদয় হয়—(১) মানুষ কেন হাসে? (২) হাসির উদ্দেশ্য কি?

কেন আমরা হাসি, কিংবা মানুষ কেন কৌতুক বোধ করে, এই ভাবনা ভাবতে আরম্ভ করলেই আমরা নিজেরাই এক একজন মনোবিজ্ঞানী বা দার্শনিক হয়ে যাই। মানুষের চাল চলন, হাবভাব, কথাবার্তার মধ্যে কিছু বিচিত্র দুর্বলতা বা অক্ষমতা দেখলেই আমরা হাসতে থাকি।

স্বাভাবিকের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই বা অবাস্তব মনে হলেই আমরা হাসির সূত্র খুঁজে পাই। একটা বিরাট মোটা লোক যদি একটা ছোট্ট টুপি পরে, একজন পুরুষ মানুষ যদি একজন স্ত্রীলোকের বেশে নাচতে থাকে, তাহলেই আমাদের মনে হাসির উদ্রেক ঘটে।

শারীরিক কারণ দেখতে গেলে আমরা দেখি হাসি স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ফুসফুসের শক্তিবর্ধক। হাসির মাধ্যমে যদিও কিছুটা শক্তি ও তেজের ক্ষতি হয়ে যায় তবুও সারা শরীরের পক্ষে হাসি খুবই উত্তেজক ও বলবর্ধক। এর সামাজিক উপকারিতাও আছে। কারণ আমরা যখনই হাসি তখনই একসঙ্গে হাসি। একলা বা নির্জনে খুব কম লোকই হাসে। সেভাবে হাসলে, লোকে হাসিয়ে লোকটির মাথার সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠবে এবং নিজেও মনে মনে হাসতে থাকবে। সেইজন্যই হাসিকে একটি সামাজিক বা যৌথ প্রথার ক্রিয়াকলাপ বলে মনে করা হয়।

আতংক কি এবং কাকে বলে?

এমন কোনও লোককে কি দেখেছো যিনি উঁচু জায়গা বা বদ্ধ ঘর দেখলেই ভয়ে ও আতংকে একেবারে সিঁটিয়ে যান? অনেক লোক আছে, যারা ভীড়কে খুব ভয় করে। কেউ হঠাৎ ছুঁয়ে দিলেও অনেকে ভয় পেয়ে যায়। হয়তো কোন প্রেতাত্মা ঘাড়ে ভর করবে, এই আতংকে অনেক লোক সদাই আতংকিত হয়ে থাকে। এসব লোকদের কি রুগী বলা যায়? হাঁ, এরা হলো মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোক।

শরীরে আঘাত লাগলে যেমন আমরা বলি চোট লেগেছে, তেমনি মনে কোনও ভাবাবেগের উৎপত্তি হলেই সেই লোকটিকে আতংকগ্রস্ত বলে ধরে নেওয়া হয়।

আমরা অনেকেই ভয়ের জিনিস দেখি, ভয় পাই, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি, সেটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। যারা দুর্বল চিত্ত লোক তারা এসব পারে না। এদের প্রতিরোধ শক্তি কম। এরাই এই আতংকের শিকার হয়ে পড়ে এবং অশেষ দুঃখ পায়। এক ব্যক্তি তার বাবাকে ভালবাসতো আবার ভয়ও করতো। বাবা মারা যাবার পর সে স্বীকার করলো না যে সে বাবাকে ভয়ও করতো। বাবার প্রতীক হিসাবে কোনও উঁচু স্থানকে মনে করে নিয়ে, তাকেই ভয় করতে লাগলো। কারণ বাবা ও উঁচু স্থান প্রায় সমান।

এ সবই খুব জটিল বলে মনে হয়। কিন্তু মানুষের মনের গতিবিধি আরো জটিল।

মশারা শীতকালে কোথায় যায় ?

পৃথিবীর যে সব স্থানে শীত আছে, সেখানে আমরা মশা দেখতে পাই না। তাহলে মশাগুলো যায় কোথায় ?

প্রত্যেক মশাই জীবনের প্রথম ভাগটা জলেই কাটায়। পরে ডাঙ্গায় ও আকাশে শেষ জীবনটুকু কাটায়। মেয়ে মশা টি বদ্ধ জলে প্রথমে ডিম পাড়ে। জল থেকে লার্ভা বা শূককীট বেরিয়ে খাবারের সন্ধানে চারদিকে সাঁতার কাটতে থাকে। শূককীট পরে মুককীটে পরিণত হয় এবং পরে পোকার আকারে আকাশে উড়ে যায়। ডিম থেকে মশার পরিণত হতে সময় লাগে নয় থেকে চোদ্দ দিন।

শীতকাল এলেই ডিমগুলো সুপ্ত অবস্থাতেই থেকে যায়। 'তা' দেওয়া হয় না, ডিম ফুটেও বেরোয় না। বেশীর ভাগ সরীসৃপ জাতীয় জীব এবং সেইসঙ্গে মশাও সারা শীতকালটা একরকম ঘুমন্ত অবস্থাতেই কাটিয়ে দেয়। শূককীট বা মুককীট অবস্থাতেই মশাগুলো থাকে।

গরমের দেশে মশাকেই আমরা মারাত্মক বা মহামারীর কারণ বলে মনে করে থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের চেয়েও শীত-প্রধান দেশে মশা আরো বেশি সাংঘাতিক মারাত্মক। যেমন—কানাডা, সাই-বেরিয়া, আলাস্কা প্রভৃতি দেশে। এর একমাত্র কারণ, মশার ডিম শীতকালে বরফের জলের মধ্যেও বহুদিন বেঁচে থাকতে পারে। বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গেই ডিমগুলো ফুটে বেরোয়, আর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা বেরিয়ে এসে মানুষকে কাম-ড়াতে থাকে। শোনা যায় অনেক জায়গায় মশার কামড়ে মানুষ পাগলও

হয়ে গেছে।

মানুষের কাছে মশা শুধু বিরক্তিকরই নয়। এর চেয়েও বড়ো কারণ হলো—অসুস্থ লোকের মধ্য থেকে দূষিত রোগের জীবাণু নিয়ে সুস্থ লোকের মধ্যে তারা সেই বিষাক্ত রক্ত ঢুকিয়ে দেয়। এইভাবে তারা নানারোগ ছড়াতে থাকে। জীবাণুগুলো মশার কোনও কাজেই লাগে না। এগুলো বেঁচে থাকতে পারে। হুল ফুটিয়ে মশা যখন আর একজনের শরীরের মধ্যে থেকে রক্ত শুষে নেয়, তখন হুলের মধ্য দিয়ে মশার লালার সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির রক্তে সেই জীবাণু চলে যায়। এই ভাবেই রোগের সংক্রমণ শুরু হয়।

মশাদের শীতকালীন অন্তর্ধানের এই বৃত্তান্তটি কিন্তু শীতপ্রধান দেশের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। কলকাতায় দেখা যাচ্ছে, শীতেই মশারা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে এবং বৈশাখের ঝড়ো হাওয়ায় সব উড়ে যায়!

বাদুর কতোরকমের হয় ?

অবাক কাণ্ড! এই পৃথিবীতে প্রায় হাজার রকমের বাদুর আছে! মেরু প্রদেশ বাদ দিয়ে এরা পৃথিবীর সর্বত্রই বাস করে। যেখানে থাকে, সেখানকার আবহাওয়া অনুযায়ী এদের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। তবুও মোটামুটি প্রত্যেক বাদুরের মধ্যেই কিছু কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। এরা সাধারণতঃ পর্বতগহ্বর, বা বৃক্ষগুহা বা অন্য কোনও রকমের গর্তের মধ্যে দল বেঁধে বাস করে। এক একটা দলে ১০।১২টা থেকে হাজারটা বাদুরও থাকে।

এরা গাছের ডাল থেকে ঝুলে থাকে—ঠিক গাছের পাতার মত। অনেক বাদুড় তালগাছের পাতা দিয়ে ছোট তাঁবুর মত ঘর তৈরি করে সেখানে বাস করে। মিশরে পিরামিডের মধ্যে, অস্ট্রেলিয়ায় ফলের গাছের মধ্যে, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে মানুষের বসতবাটীর মধ্যে এরা বাস করে। দেওয়ালের খুব সরু ফাটলের মধ্যে দিয়েও এরা অনায়াসেই বেরিয়ে যেতে পারে।

পেঁচার মতো বাদুরেরাও নিশাচর। কিছু কিছু বাদুড় দিনের বেলাতেও সাহস করে বেরিয়ে পড়ে। বেশীর ভাগ বাদুর পোকামাকড় খেয়েই বেঁচে থাকে। কোনো কোনো বাদুর ফল খেয়ে—আবার অনেক বাদুর ফল ও পোকামাকড় খেয়ে থাকে। কিছু কিছু বাদুর মাংস, মাছ ও ফলের মধুও খায়।

ভারতের পেঁচা, নেংটি ইঁদুর, ছোট ছোট পাখী আর টিকটিকিও খায়। আমেরিকায় একরকম পেঁচা আছে—যারা কলা, ঘোড়ার মাংস এমন কি ছোট ছোট বাদুরও ধরে খায়। নদীর জল থেকে মাছও ধরে খায়। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্যাম্প্যায়ার নামক এক রকম রক্ত শোষক বাদুর আছে। এরা ঘোড়া, গরু, ছাগল এমন কি মানুষের শরীর থেকে রক্ত শুষে খায়।

গাছে থাকে বলে, অনেকে এদের পাখী বলে। আবার পাখীদের মতো এদের ডানা নেই এবং ডিমও পাড়ে না। তাই এদের উড়ন্ত পশু বা জানোয়ার বলা হয়।

মানুষ ছুরি-চামচে ব্যবহার করতে শিখলো কবে থেকে ?

ছুরি যখন ছিল না, তখন আমরা হাত দিয়েই তো খাবার ছিঁড়তে বা ভাগ করতে পারতুম! কাঁটারও দরকার হতো না, কারণ আঙুল দিয়ে তা ধরতে পারতুম। কিন্তু পাতলা জিনিস, বিশেষ করে গরম পাতলা জিনিস হাত বা আঙুল দিয়ে তোলা যেতো না। তখনই চামচের দরকার হলো। প্রস্তর যুগের সময় থেকেই চামচের প্রচলন চলে আসছে। মিশরীয়রা প্রথমে কাঠ, পাথর বা হাতীর দাঁতের চামচ ব্যবহার করতো। তার আগে ভারতীয়রা রান্নার জন্য বড় জাতের চামচে ব্যবহার করতো। একেই বলা হতো হাতা। হাতা বা খুন্তি ছাড়া কোনো রান্নাই হোতো না। খাওয়ার সময়ে, বিশেষ করে, কাউকে খাওয়াতে হলে, হাতারই ছোট সংস্করণ চামচের ব্যবহার চালু হলো। গ্রীকেরা ব্রোঞ্জ ও রুপোর চামচে ব্যবহার করতো।

কাঁটা ও ছুরির ব্যবহার চালু হয়েছে আধুনিককালে। চারশো বছর আগেও ফ্রান্সের লোকেরা আঙুলের সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করতো। আদিম যুগের লোকেরা কাঁটার বদলে ইংরাজী অক্ষর 'ওয়াই'-এর আকারের গাছের ডাল ব্যবহার করতো। তারপর, হাড়ের বা লোহার চলন হলো—খাওয়া, বিশেষ করে রান্নার জন্যে।

একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান আধুনিক কাঁটার প্রচলন শুরু হয়। শুধু কাঁটায় খেতে অসুবিধে হয়। সেইজন্য খাবার জিনিসকে কেটে দুভাগ করার জন্য প্রায় তিনশো বছর আগে ছুরির ব্যবহার চালু হলো। দরিদ্র শ্রেণীর

লোক কাঁটা চামচে ও ছুরির ব্যবহার করতে সক্ষম নয় বলেই এখনও তারা হাত দিয়েই খাওয়া দাওয়া করে থাকে।

দু'জন লোকের ফিংগার প্রিণ্ট কি একরকম হতে পারে ?

পৃথিবীর কোনও মানুষই আর এক জনের মত হুবহু একরকম নয়। এমন কি একজনের বাঁ দিকের হাত পা চোখ কান প্রভৃতির সঙ্গে ডান দিকের ঐ-ঐ প্রত্যঙ্গগুলির কোনও মিলই থাকে না। কিছু পার্থক্য হবেই।

একজন মানুষের আঙুলের ছাপের সঙ্গে আর একজন মানুষের আঙুলের ছাপের কোনরকম মিল হয় না।

আমাদের চামড়ার দু'রকম দেহকোষ থাকে। নীচের ত্বকটি হয় পুরু ও মোটা এবং শক্ত। তার উপরের উপত্বকটি খুব পাতলা ও মিহি। একেই বলে নুনছাল। ঠাণ্ডা রক্তযুক্ত জীবজন্তুদের উপত্বকটি ত্বকের সঙ্গে খুব মসৃণভাবে লেগে থাকে। এই উপত্বকে কোনও রকম খাঁজও থাকে না— ফলে কোনো ছাপও পড়ে না।

কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবজন্তুদের এই দুইটি ত্বক খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। ত্বকটি উপত্বকের সঙ্গে খুব দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। নীচের ত্বকের কিছু কিছু দেহকোষ উপরের দিকে উঠে গিয়ে উপত্বকের মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় অনেক খাঁজ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে।

নিম্নস্তরের জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে এই খাঁজগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে। কোনও মিল থাকে না। লাঙ্গুলবিহীন বানর শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে এই খাঁজগুলো সমান্তরালভাবে সাজানো থাকে। সেইজন্য তাদের আঙুলের ছাপ প্রায় সমানই হয়।

কিন্তু মানুষের আঙুলের ছাপ বিভিন্ন রকমের হয়। স্যার এডোয়ার্ড হেনরী নামক এক ইংরাজ এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন এবং সারা পৃথিবীতে এই প্রথাই এখন চলে আসছে। মানুষের আঙুলের ছাপ হয় হরেকরকম— গোলপাকানো, মাঝখানটা গোলপাকানো, দুটো পাকানো গোল, খিলানযুক্ত, আবৃতখিলান, ঘূর্ণিপাকানো, আর এলোমেলো। মানুষের দশটা আঙুলের ছাপ এই সব রকম ছাপের মধ্যেই হয়ে থাকে। দুই কোটি ৪০ লক্ষ লোকের মধ্যে এক রকম ছাপের লোক, হয়তো দুটো পাওয়া যেতে পারে।

দিবাস্বপ্ন আমরা দেখি কেন ?

পৃথিবীতে এমন কোনও লোক আছে কি, যে জীবনে কখনও কোনো দিবাস্বপ্ন দেখে নি ? প্রায়ই কোনও সুন্দর জিনিস আমরা পেতে ইচ্ছে করি, কোনও আনন্দদায়ক কাজ করে আনন্দ পাই কোনও সুখের কথা চিন্তা করি বা কোনও ফুর্তির মধ্যে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করি—এই সব ছোট ছোট ঘটনা প্রায়ই আমাদের জীবনে ঘটে থাকে। এই সব ক্ষেত্রেই দিবাস্বপ্ন আমরা দেখে থাকি। জাগ্রত অবস্থায় দেখি দিবাস্বপ্ন আর ঘুমন্ত অবস্থায় দেখি নৈশস্বপ্ন। বিশ্রামরত অবস্থায় মন যখন শান্ত ও স্থির থাকে, ঠিক সেই সময় একটা কিছুকে অবলম্বন পেলেই, তাকে জড়িয়ে ধরে মন তখন ভাবতে শুরু করে দেয়। একেই বলে স্বপ্ন।

এই সব কারণেই স্বপ্নের মধ্যে অবান্তর অদ্ভুত ও বিচিত্র চিন্তাধারা ভেসে ওঠে। ঘুমের সময়ে মনের উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না বলে, নৈশস্বপ্নে আরো আশ্চর্য চিন্তাধারা ভেসে ওঠে মনের মধ্যে।

বাচ্চারা দু'রকমের দিবাস্বপ্ন দেখে, যা বড়োরা দেখে না। ১। খেলুড়ে দিবাস্বপ্ন, ২। রাজকুমার দিবাস্বপ্ন। প্রথমটাতে শিশু দেখে, তার অনেক খেলার সাথী ও বন্ধুবান্ধব আছে। তাদের সঙ্গে সে খেলাধূলা করছে। দ্বিতীয়টাতে সে দেখে যে, সে একজন রাজপুত্র এবং তার বাবা মা-ও রাজারানী। তাকে সকলেই ভালোবাসছে ও সম্মান করছে।

এই থেকেই বোঝা যায় যে দিবাস্বপ্নে আমরা সেই সবই দেখি, যা আমরা চাই বা যাদের অভাববোধ করি। নৈশস্বপ্নে, আমরা শুধু এইগুলোই দেখি না ; এই সঙ্গেই যে সব জিনিস আমাদের ভয়ের কারণ হয়, সেগুলিকেও দেখতে থাকি। স্বপ্নের উৎপত্তির কেন্দ্র হলো আমাদের মনের অভাব, ভয়, বাসনা ইত্যাদি। স্বপ্ন বাইরে থেকে আসে না। ভেতর থেকেই স্বপ্নের সৃষ্টি হয়। মানুষের ইচ্ছাকে প্রকাশ করার জন্য দিবাস্বপ্ন মানুষকে:সাহায্য করে। নৈশস্বপ্নের মাধ্যমে মানুষকে বিশ্রাম নিতে সাহায্য করাই হলো নৈশস্বপ্নের কাজ।

স্বপ্ন হলো মানুষের দ্বিতীয় রূপ। একই মানুষ দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়ে, নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেয়—কোন্ পথে যেতে হবে।

কুকুরেরা কি স্বপ্ন দেখে ?

তোমার কুকুর থাকলে, লক্ষ্য করে দেখবে, ঘুমন্ত অবস্থায় সে শব্দ করছে, নড়ছে, আবার সময় সময় পা ছুঁড়ছে বা নাড়াচ্ছে। যেন কুকুরটা দৌড়োচ্ছে কাউকে ধরার জন্য। অনেক কুকুর-মালিকের এ অভিজ্ঞতা আছে বলেই তাঁরা জোর করে বলতে পারেন না যে, কুকুর স্বপ্ন দেখে না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তনদের ফলেই মানুষ ও জীব জন্তুর উৎপত্তি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই পরিবর্তন চলে আসছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকার জন্য এদের চিন্তাধারা ও মনের গতিবিধিরও অনেক পরিবর্তন হয়। যার ফলে জীবজন্তু মানুষের চেয়ে পৃথক এক জগতে বাস করে। পশুপক্ষীর মন ও অনুভূতি ভিন্ন প্রকৃতির বলেই, মানুষের মতো মস্তিষ্ক ও তাদের নেই। সুতরাং মানুষের মতো চিন্তাধারাও তাদের মাথা থেকে বেরুতে পারে না। সেই কারণেই কুকুরের মস্তিষ্ককে মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা চলতে পারে না।

কুকুরেরা যখন ঘুমন্ত অবস্থায় আওয়াজ করে বা পা নাড়ে, তখন তারা স্বপ্ন দেখে না। কারণ মানুষের মতো মস্তিষ্ক তাদের নেই। মাংস পেশীর সাধারণ সংকোচন ও প্রসারণের ফলেই এটা হয়ে থাকে।

লাঙ্গুলবিহীন বানর সম্প্রদায়ের মানুষের মতো কিছুটা মস্তিষ্ক আছে বটে, কিন্তু তাদের চিন্তাধারা খুবই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। মানুষের স্বপ্নের সঙ্গে তাদের কোনও মিল নেই।

না খেয়ে মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে ?

একবেলা না খেলেই মনটা আমাদের কি রকম উসখুস্ করতে থাকে। আর দু' বেলা না খেলে তো দারুণ অস্থিরতায় মনটা যায়। কিন্তু এমন লোক আছে, যারা দীর্ঘ সময়ের জন্য স্বচ্ছন্দে উপবাস করতে পারে।

দীর্ঘ দিন উপবাস করে বেঁচে আছেন এরকম অনেক লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই উপবাস করতেন। বিভিন্ন পাল-পার্বন বা ব্রত উপলক্ষে কিংবা একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন অনেক লোকই উপবাস করে থাকেন। রোজার একমাস কাল ভক্ত মুসলমান দিনের বেলায় উপবাস করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র যতীন দাস

ইংরাজ রাজত্বের অত্যাচারের প্রতিবাদে জেলে ৬৩ দিন খাদ্য গ্রহণ না করেই বেঁচে ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি মারা যান। বিভিন্ন দাবী পূরণ করার জন্য আজকাল তো প্রায়ই অনশনব্রতের কথা শোনা যায়। আধুনিক কালে রীলে অনশনের প্রথাও চালু হয়েছে। এ অনশন বহুদিন ধরে চালানো যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার জনৈকা স্ত্রীলোক জল ও সোডা খেয়ে ১০২ দিন বেঁচে ছিলেন।

উৎকুন বা এঁটুলি নামক একরকম ছোটো পোকা পশুপক্ষীদের গায়ে হয়। ইংরাজীতে এদের বলে 'টিক্'। এরা এক বছর না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

ছোটো বা কর্মঠ পশু বা গরম-রক্তের জীবজন্তুদের খাদ্য ভাণ্ডার তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি খিদেও পায়। একটা ছোটো পাখী পাঁচ দিন না খেয়ে থাকতে পারে। একটা কুকুর কিছু না খেয়েও কুড়ি দিন বাঁচতে পারে। উষ্ণ রক্তযুক্ত প্রাণীরা ততোদিন বেঁচে থাকতে পারে, যতোদিন তাদের শরীরের স্বাভাবিক ওজনের অর্ধেক ওজনও বজায় থাকে। শরীরের ওজন এর চেয়ে কমলেই তারা মারা যায়।

জীবের জীবন ধারণের পক্ষে এই ওজনই হলো সবচেয়ে প্রধান জিনিস। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারাই এই ওজন নিয়ন্ত্রিত হয়। শরীরের পুষ্টিকর পদার্থের অভাব হলেই সেই খবরটা মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। আর তখনই জীব ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। শরীর-ইঞ্জিনকে চালানোর জন্য কী জ্বালানির খাদ্যের খাদ্যের দরকার হয়, তা এই ক্ষুধাই ঠিক করে দেয়।

মানুষের গায়ে চুল হয় কেন ?

পাখীদের থাকে পালক, আর স্তন্যপায়ী জন্তুদের এবং মানুষের হয় চুল। মানুষের শরীরের দুইটি জায়গা ছাড়া আর সব জায়গাতেই চুল গজায়। এই দু'টি জায়গা হলো—হাতের চেটো ও পায়ের চেটো। আদিম মানুষের গায়ে খুব বেশী চুল হতো।

মাতৃগর্ভে একশো দিন হলেই শিশুর গা থেকে মোটা ও ঘন চুল বেরোয়। আবার একশো দিন পরে সেই চুল-ও ঝরে পড়ে যায়। একেই বলে ভ্রূণস্থ কেশ। এর পরেই বেশ সরল ও নরম চুল গজায়। চৌদ্দ বছরের ছেলে ও বারো বছরের মেয়েদের গায়ে এই রকম চুল হয়।

যৌন গ্রন্থির দ্বারাই পুরুষ মানুষের চুলের বাড়-বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। যার জন্যে পুরুষের মুখে ও শরীরে বেশী চুল হয়, কিন্তু মাথায় হয় কম। মেয়েদের হয় ঠিক এর বিপরীত।

বিজ্ঞান আজও ঠিক করতে পারেনি যে চুলের প্রয়োজনীয়তা কি? পোকা মাকড় থেকে বাঁচানোর জন্যই বোধ হয় ভ্রূ, কান, চোখের পাতায় চুল হয়। আদিম যুগে এই চুলের দ্বারাই স্ত্রী পুরুষের ভেদ করা হতো। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের মতে—শরীরের ঘাম ও অতিরিক্ত দূষিত জল বেরনোর জন্য এই সব সূক্ষ্ম চুল হয়।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের গায়ে তিন হাজার থেকে প্রায় পাঁচ হাজার চুল থাকে। লাল চুলওলা লোকদের গায়ে চুল খুব কম হয়।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জন্তু কি?

এখনকার যুগে যে সব বিরাট অতিকায় জন্তু দেখতে পাওয়া যায়, তাদের চেয়ে অনেক গুণ বিরাট বড়ো জন্তু দেখতে পাওয়া যেতো প্রাগৈতিহাসিক যুগে। বর্তমান যুগে নীল তিমিই হলো সব চেয়ে বড়ো জন্তু। এরা লম্বায় প্রায় একশো ফুট এবং ওজনে হয় প্রায় ১২৫ টন। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, এই ধরনের নীল তিমিমাছের শরীরের তিন ভাগের এক ভাগই হলো এর মাথাটা।

আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার শোনো। যদিও আমরা একে মাছ বলি কারণ জলে থাকে বলে, প্রকৃত পক্ষে এটি মাছ নয়। তিমি হলো বিরাট স্তন্যপায়ী জন্তু। ডলফিন বা পরপয়েজ অথবা শুশুক জাতীয় স্তন্যপায়ী জলজন্তুদের মতো তিমিদের পূর্বপুরুষরাও জলেই বাস করতো। এদের শরীরের গঠন থেকেই তা বোঝা যায়। দু-পাশের পাখনার চামড়া ও মাংস থেকেই বোঝা যায়—যে এদের আগে পাঁচটা করে আঙুল ছিল।

তিমিদের পেট থেকে সোজাসুজি জীবন্ত বাচ্চার জন্ম হয়। এরা ডিম পাড়ে না। সুতরাং ডিমে তা-ও দেয়না। জন্মাবার পর বাচ্চা মায়ের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য থাকে।

তিমিদের ফুলকো হয় না। স্থলজন্তুদের মতো এদের ফুস্‌ফুস্ থাকে। আর তারই সাহায্যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয়। এদের লেজ জলের উপরিভাগের সঙ্গে সমান্তরাল থাকায় খুব সহজেই জলের উপরে ভেসে উঠতে পারে

এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে। এদের কঙ্কাল, রক্তচলাচল ব্যবস্থা, মস্তিষ্ক, কোনোটাই মাছেদের মতো নয়।

জলে বাস করার জন্য তিমি অনেক কিছুই খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এ সবের মধ্যে একটি হলো ব্লাবার। স্তন্যপায়ী জন্তু মাত্রই গরম রক্তের জীব। সেই জন্যই এদের শরীরের উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে হয়। তিমির চামড়ার নীচের তন্তুময় কোষগুলো তেলে ভর্তি থাকে আর এরাই শরীরের উত্তাপকে ঠিক রেখে দেয়। বড়ো বড়ো :তিমিদের এই কোষগুলো চৌদ্দ থেকে কুড়ি ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা পুরু হয়। তিমির সবার উপরে একটা বা দুটো ছিদ্র থাকে। জলের উপরে উঠে এসে এরই সাহায্যে তারা হাওয়া নিয়ে থাকে। জলের নীচে নামলেই কতকগুলি ভালবের দ্বারা এই ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়। তাই ফুসফুসে জল ঢুকে যাওয়ার কোনো ভয় করে না। জলের নীচে তিমিরা প্রায় ৪৫ মিনিট থাকতে পারে।

স্বপ্ন কি ভবিষ্যদ্বাণী করে ?

স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের মনে অনেক সংস্কার আছে এবং সেগুলো আমরা বিশ্বাস করে থাকি। অনেকে তাই বলেন—স্বপ্ন কখনই অর্থহীন হতে পারে না। কিছু একটা অর্থ আছেই। মহাপুরুষদের জীবনী থেকে জানতে পারা যায় যে, স্বপ্নের দ্বারা তাঁরা বা তাঁদের গুরুজনরা অনেক কিছুই জানতে পারতেন—পরে যা সত্য হয়েছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে, ইউরোপেও গ্রীসদেশে স্বপ্নের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হতো। স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করে আর ভেতরকার অর্থ বার করার চেষ্টা করা হতো। বর্তমান যুগে স্বপ্ন-তত্ত্বের অনেকরকম বইও পাওয়া যায়। কী দেখলে, কী ফল হবে—এইসব প্রশ্নের উত্তর—ছকবাঁধা অবস্থায় দেওয়া থাকে।

বিজ্ঞানীদের মতে স্বপ্নের মাধ্যমে বর্তমান ও অতীত জানতে পারা যায়, কিন্তু ভবিষ্যৎ জানার কথা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। তবুও, লোকেদের কুসংস্কারের উপর নির্ভর করে। অনেক বই বাজারে ছাড়া হয়েছে। এইসব বইয়ে দেওয়া থাকে—স্বপ্ন দেখার বিষয়বস্তু ও তার ফলাফল।:

স্বপ্নের কারণ হলো—আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। যেমন—শব্দ, অত্যধিক ঠাণ্ডা, বা খুব গরম, কষ্টে ঘুমোনো, শরীরের উপর কিছু পড়ে যাওয়া ইত্যাদি। অতীতকালের কোনও ঘটনা থেকে বা ভবিষ্যৎ বিষয়ের কোনও চিন্তাধারা থেকেও আমাদের মনে স্বপ্ন ভেসে ওঠে।

স্বপ্নের সহিত বাস্তবের মিল খুবই কম। যাঁরা স্বপ্নকে মূল বলে স্বীকার করে নিয়ে এগুতে চান, তাঁরা হলেন স্বপ্নবিলাসী। তাঁরা অনেক সময়েই ঠকেন। কিন্তু দৈবস্বপ্ন, লোকে বলে, কখনও মিথ্যা হয় না। এই জন্যে ভারতের লোকেরা দৈবস্বপ্নকে দৈববাণী বলেই গ্রহণ করে থাকে।

কোন্ দেশে বেশি ঘড়ি তৈরী হয় ?

আগে ঘড়ি তৈরি হতো প্রায় সব দেশেই। ঘড়ি প্রস্তুতকারীরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করতেন। তখন এটা একটা আন্তর্জাতিক ব্যবসা ছিল।

আস্তে আস্তে এক এক দেশ এক এক রকম ঘড়িতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলো। ইংল্যাণ্ড জাহাজের ক্রোনোমিটারে পারদর্শী হয়ে ওঠায় সারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইংল্যাণ্ড :থেকেই এই ঘড়ি রপ্তানী হতে থাকে। জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেস্ট কোম্পানী সারা পৃথিবীতে এক রকম নতুন ঘড়ি যোগান দিতো। এটা হলো হাতে খোদাই করা কোকিল ঘড়ি। ঘড়ির চেয়ে হাতে খোদাই করা কাজগুলো খুবই সুন্দর হতো। জুয়েল বসানো ঘড়িও সেখান থেকে প্রথম সারা বিশ্বে চালান যেতো। এর পরেই আসে সুইজারল্যাণ্ড। ঘড়ি তৈরি হলো এ দেশের জাতীয় শিল্প। সারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এই শিল্পের উপরেই গড়ে উঠেছে। হাত-ঘড়ির প্রচলন হবার সময় সুইজারল্যাণ্ডেই সারা বিশ্বে হাত ঘড়ি শিল্পে প্রথম যাচ্ছিলো। উচ্চ মানের ছোটো ঘড়ি তৈরির ব্যাপারে কোনও দেশই সুইস্-ঘড়িকে টেকা দিতে পারে নি। সুইজার-ল্যাণ্ডের তৈরী অ্যালার্ম ঘড়ি, ক্যালেণ্ডার ঘড়ি, অটোমেটিক ঘড়ি, ক্রোনোগ্রাফ প্রভৃতির জুড়ি আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমেরিকা ইলেকট্রিক ঘড়ি অটোমোবাইল ঘড়ি অ্যালার্ম ঘড়িতেও দক্ষতা লাভ করেছে। তবে এ সবের যন্ত্রপাতি বাইরে থেকে আমদানী করা হয়। সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, জাপান ও ফ্রান্স আমেরিকাকে এই সব ঘড়ির যন্ত্রপাতি যোগান দিয়ে থাকে।

পৃথিবীতে কতো রকমের পোকা আছে ?

পোকা বলতে নানা রকমের কীট পতঙ্গকেই বোঝায়। যেমন ঃ—মশা, মাছি, উকুন, পিঁপড়া, বোলতা, ভীমরুল মৌমাছি, এমন কি প্রজাপতিও।

শুনলে খুবই আশ্চর্য লাগে যে পৃথিবীতে কীট পতঙ্গের সংখ্যা হলো কুড়ি কোটি চল্লিশ লক্ষ। বিজ্ঞানেই ধরা পড়েছে প্রায় ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার রকমের পোকামাকড় আছে। জীবজন্তুর সংখ্যা পোকা মাকড়ের সংখ্যার ধারে কাছেও ঘেঁসতে পারে না। জীবজন্তুর সংখ্যা আর পোকামাকড়ের সংখ্যার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। সামান্য এক বর্গগজ জায়গার মধ্যে পাঁচশো থেকে দুহাজার কীটপতঙ্গ থাকতে পারে। ঐটুকু জায়গা জীবের বাঁচার পক্ষে যদি বেশ পরিপোষক হয়, তাহলে ঐটুকু জায়গাতেই দশলক্ষ পোকামাকড়ও বেশ বহাল, তবিয়তে বাস করতে পারে। সাদা চোখে হয় তো ঐটুকু জায়গার মধ্যে পাঁচ-ছয় রকমের চেয়ে বেশি পোকা দেখতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু বেশির ভাগ পোকা এতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে সে সব অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখতেই পাওয়া যাবে না। ভাবলে গা শিউরে উঠবে যে সদা সর্বদাই পোকামাকড়ের ঘিঞ্জি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করছি। অথচ কিছুই বুঝতে পারছি না। বেশির ভাগ কীট পতঙ্গেরই শরীরের তিনটি করে অংশ থাকে আর সাধারণত ছয়টা করে পা থাকে। বেশির ভাগ পোকামাকড়ের বেলাই এই নিয়ম খাটে। কিন্তু সব পোকার বেলায় এ নিয়ম খাটে না।

সোনা কিভাবে পাওয়া যায় ?

মানুষ সর্বপ্রথম খুব সম্ভব সোনা নামক ধাতুর সঙ্গেই পরিচয় লাভ করে। ইতিহাস সৃষ্টি হবার আগে থেকেই মানুষ প্রকৃতির মধ্য থেকেই সোনাকে খুঁজে বার করে। এখন যতোই দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বলে মনে করা হোক না কেন আগে সোনা সবজায়গাতেই খুব সহজ ভাবেই পাওয়া যেতো। অসুবিধা হতো এইটুকু যে সোনা বার করা নেওয়ার খরচা তখন পোষাতো না। সমুদ্র জলে সামান্য সোনা থাকে। এতো সামান্য যে সোনা ও জলকে পৃথক করা বড়ই কষ্ট সাধ্য। তবুও সমুদ্র জলে প্রায় দশ লক্ষ টন সোনা থাকে।

সোনা দুভাবে থাকে। প্রথম—খাঁটি সোনা অর্থাৎ কোথাও ধাতুর সঙ্গে না মিশে পৃথক ভাবে থাকে। দ্বিতীয়—মিশ্রিত সোনা অর্থাৎ অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মেশানো অবস্থায় থাকে।

মিশ্রিত ধাতুর তাল জল ও হাওয়ায় ক্ষয়ে গিয়ে অনেক সময়ে শুদ্ধ সোনা

বেরিয়ে পড়ে। এই সোনা আবার ক্ষয়ে গিয়ে বালি বা পলিমাটির সঙ্গে মিশে যায়। এই সব সোনার কণা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আকারের হয়। সবচেয়ে বড় আকারের তাল পাওয়া গিয়েছিল প্রথমে অস্ট্রেলিয়াতে। একটা মাটির তালের ওজন ছিল প্রায় ৭০ কিলোগ্রাম।

সোনা বেশির ভাগ পাওয়া যায় অন্যান্য আকরিক ধাতুর সঙ্গে। রুপোতেও বেশ সোনা থাকে। তামার মধ্যে অনেক সময়ে সোনার খোঁজ পাওয়া গেছে।

আজকাল খনি থেকেই বেশির ভাগ সোনা পাওয়া যায়। যেখানে সোনার সন্ধান পাওয়া যায় সেখানকার উপরের মাটি থেকে ভেতরে যন্ত্রের সাহায্যে গর্ত করে ফেলা হয়। এই গর্ত প্রায় এক মাইল লম্বাও হতে পারে। পরে তা বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে ফাটানো হয়। ফাটানো আকরিক বস্তু মাটির ওপরে এনে গাড়ি বোঝাই করে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গুঁড়িয়ে ফেলে খুব মিহি করে নেওয়া হয়। তারপর রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে সোনাকে পৃথক করে নেওয়া হয়।

সোনা রপ্তানিকারী প্রধান দেশ হলো—দক্ষিণ আফ্রিকা, এবং আমেরিকা।

জাতীয় সঙ্গীত কিভাবে এলো ?

দেশকে ভালোবাসা বা দেশভক্তির চিহ্নস্বরূপ কোনও অনুষ্ঠানে যে দেশপ্রেমের গান গাওয়া হয় তাকেই বলে জাতীয় গান বা রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত। এই গানের ভেতর দিয়েই দেশের লোকেরা কোনও এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বা কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করে।

জাতীয় সঙ্গীত কখন ও কি ভাবে হলো, তা ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। পরাধীন ভারতে ইংরাজদের বিরুদ্ধ জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে, শক্তিশালী করে জনসাধারণ স্বদেশের মাতৃরূপ পূজা করতে শুরু করে। পরাধীন ভারতকে 'শৃঙ্খলিত ভারতমাতা' বলে মনে করে নিয়ে লোকে তাঁকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে। তখনকার যুগে ইংরাজের অধীনে কর্মরত ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায়ের মনেও এ ধারণা জেগে ওঠে নানা উপন্যাস লিখতে লিখতে। "আনন্দ মঠ" উপন্যাস লেখার সময়ে এই ধারণা এতো প্রবল হয়ে ওঠে যে সেই উপন্যাসে ভারত জননীকে বন্দনা করার জন্য সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার একটি বন্দনা

গান রচনা করেন। সেই গানই "বন্দেমাতরম্।" লোকের মুখে মুখে এই গান ফিরতে থাকে। আগে লোকের সঙ্গে দেখা হলে লোকে বলতো 'সুপ্রভাত, 'গুডমর্ণিং', 'সীতারাম', রাধাকৃষ্ণ', 'আরে কি খবর?' 'সব ভালো তো?' ইত্যাদি। ইংরাজকে বিতাড়িত করার জন্য লোকে নতুন সম্ভাষণ ব্যবহার করতে শিখলো। দেখা হবার সময় বা বিদায়ের সময়ে লোকে বলা শুরু করলো "বন্দেমাতরম্।" সভাশুরুর সময়ে, মিছিলে, আন্দোলনে, স্বাধীনতার জন্য যে কোনও সংঘর্ষে "বন্দেমাতরম" ব্যবহার চালু হলো। কংগ্রেসও পরে একেই জাতীয় সঙ্গীত বলে গ্রহণ করলো।

ভারত স্বাধীন হবার পর সরকারীভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত "জনগণ মন অধিনায়ক"ই জাতীয় গান বা রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত বলে গৃহীত হলো।

জার্মানীর রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত রচনা করেছিল ফ্রান্জ জোসেফ হেড্ন্ নামে একজন অষ্ট্রিয়ান! অনেক দেশে রণ সঙ্গীতকেই জাতীয় সঙ্গীত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বৃটিশ জাতীয় সঙ্গীত হলো 'গড সেভ দিকুইন্' (ঈশ্বর রাণীকে রক্ষা করুন)। এই সুর ডেনমার্ক, জার্মানী রাশিয়া, সুইজ্যারল্যাণ্ড এবং অন্যান্য ইংরাজী ভাষাভাষী অঞ্চলে-ও চালু আছে। আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত "আমেরিকা" গানেও এই সুর আছে।

বৃটিশ জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতার নাম জন বুল এবং সাল ১৬১৯ খৃষ্টাব্দ। ২৮শে, সেপ্টেম্বর ১৭৪৫ তারিখে জনসাধারণের সামনে এই গান গাওয়া হয়।

১৮১২ সালের যুদ্ধের সময়ে আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছিল। ফ্রান্সিস্ স্কট কি নামে বাল্টিমোরের একজন উকিল যুদ্ধের মধ্যেই এই গানটি রচনা করেছিলেন।

১৭৮৯ থেকে ১৮১৫ সালে ফ্রান্সে যে বিপ্লব চলেছিল, তাকেই উদ্দেশ্য করে রণসঙ্গীত রচনা করেছিলেন ফরাসী সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্লড্ জোসেফ্ রুগে দ্য লিসি। ১৭৯৫ সালের জুলাই মাসে এই রণসঙ্গীতকেই জাতীয় সঙ্গীত রূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

স্ফিংক্স্ কি ও কাকে বলে?

মিশরের নারী সিংহী মূর্তিকেই বলে স্ফিংক্স্। মিশর দেশের পিরামিডের কাছে গিজা নামক জায়গায় সব চেয়ে বড়ো স্ফিংক্স্ দেখতে পাওয়া যায়। পুরাকালের লোকেরা একে দানব বা রাক্ষস বলেই মনে করতো। গ্রীকেরা

মনে করতো এই দৈত্যের মাথা ও মুখ স্ত্রীলোকের মতো, শরীরটা সিংহের মতো এবং দুদিকে ডানা আছে। মিশরীয়দের কাছে এই দৈত্যের রূপ ছিল অন্যরকম। এদের মুখ, মাথা ও বুক পুরুষের মতো, কিন্তু এদের ডানা নেই।

সব চেয়ে বড়ো স্ফিংক্স্ তৈরি হয়েছিল একটা বিরাট পাহাড়কে কেটে। উঁচুতে ছিল ৬৬ ফুট আর লম্বায় ২৪০ ফুট। মিশরীয় রাজা সেফ্রেনের মুখের অনুকরণে এই স্ফিংক্স্ তৈরি হয়েছিল।

প্রাচীনকালে মিশরের নীল নদের কাছে মরুভূমিতে অনেক সিংহের বসবাস ছিল। সিংহগুলো শুধু শক্তিশালীই ছিল না, তাদের চেহারা ও বলিষ্ঠ শরীরের গঠন বড় সুন্দর ছিল। মন্দিরের প্রবেশ পথে পাহারা দেবার জন্য মিশরীয় ভাস্করগণ এই সব সিংহদের মূর্তি গড়ে মন্দিরের ঢোকার দুপাশে রেখে দিতো। প্রবেশ পথের নাম দেওয়া হতো সিংহদ্বার বা লায়ন গেট। এখনও ভারতের অনেক ধনীদের প্রাসাদের সামনে বা ওপরে সিংহের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। কলিকাতার রাজ ভবনের গেটের উপর একটি সিংহ-মূর্তি আর দুপাশে দুটো স্ফিংক্স্ আছে। মিশরী ভাষায় সূর্য দেবতাকে বলা হতো রা। রাজারা এই 'রা' দেবতারই বংশধর। মৃত্যুর পরে এই দেবতার কাছেই চলে যেতেন। সুতরাং সর্ববৃহৎ দেবতা 'রা' এর এবং সর্ব-শক্তিমান পশু সিংহের অনুকরণে এই স্ফিংক্স্ তৈরি করা হতো। একটি স্ফিংক্সের মুখ 'রাণী হাটসেপসুই' এর মুখের মতো করা হয়েছিল। তিনি অনেকদিন রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর শক্তির চিহ্ন স্বরূপ তাঁর মুখে দাড়িও করে দেওয়া হয়েছিল।

ঘোমটা দেওয়ার অর্থ কি ?

প্রাচীনকালে থেকেই এ প্রথা চলে আসছে। শুদ্ধ ভাষার একে বলে অবগুণ্ঠন। মুসলিম জগতে এর অন্যভাবে প্রচলন আছে—যাকে বলা হয় বোরখা। শুদ্ধ ভাষায় বলে বোরকা। এটি একটি আরবী শব্দ। অব-গুণ্ঠন সংস্কৃত শব্দ। ঘোম্‌টা বাংলা শব্দ। বোরখা হলো স্ত্রীলোকের অঙ্গাবরণ। ঘোমটা হলো মস্তকাবরণ। পুরুষের কাছ থেকে দূরে সরে থেকে, স্ত্রীলোকেরা যাতে শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। বিদেশের নিয়ম হলো—বিবাহের আগে বর যাতে কনের মুখদর্শন করতে না পায়, সেই জন্য সেখানে অঙ্গাবরণ বা মস্ত-কাবরণের বদলে মুখাবরণের নিয়ম চালু আছে। একে বলে ভেল বা ওড়না।

বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠানই হলো এই ওড়নার উন্মোচন।

প্রাচীন মিশরদেশে এই নিয়ম চালু ছিল। আরব দেশেও ঐ একই নিয়ম। প্রাচীন রোমানরা ও হিব্রুরাও এই ওড়নার বন্ধন মোচনকেই বিবাহের একটি অন্যতম অনুষ্ঠান বলে মনে করতো। ইউরোপে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এই ওড়না পেছন দিকে লম্বায় অনেকখানি লুটোতে থাকে। শিশুরা এই ওড়নাকে ধরে কনের পেছনে পেছনে চলতে থাকে। বর্তমান এই নিয়ম চালু আছে অন্য কারণে। বিবাহের জাকজমক ও আকর্ষণ বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য। নববিবাহিতা বধূর সৌন্দর্য ও মাধুর্যই এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষে নববধূর পক্ষে অবগুণ্ঠন অপরিহার্য। বিশেষ করে, শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য গুরুজনদের সামনে, নতুন বৌকে ঘোমটা ব্যবহার করতেই হয়। উগ্র আধুনিকতাবাদীগণ—এনিয়ম মানেন না। তাঁদের মতে বধূ—কন্যার তুল্য, সুতরাং ঘোমটার প্রয়োজন নেই। শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে ঘোমটা খুলে বাড়ীর আর পাঁচটা মেয়ের মতোই বৌমার দল চলাফেরা করবেন।

বেদে-বেদেনী কাদের বলে ?

যারা সমস্ত পরিবার নিয়ে এক দেশ থেকে আর এক দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তারাই হল বেদে বেদেনীর দল। ভারতের যাযাবর জাতিকেই "বেদে" বলে। বৈদ্য কথাটি থেকে বেদের চলন হয়েছে। বেদের বৈদ্যর মতো অর্থাৎ চিকিৎসকের মতো নানারকম দুস্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া নিয়ে আয়ুর্বেদীয় ও কবিরাজী চিকিৎসা করতো। পরে বৈদ্যের কাজ ছাড়াও অন্য কাজও করতে আরম্ভ করে। 'বৈদ্যে'র বদলে "বেদে" নামটাই থেকে যায়।

আরবদেশের যাযাবর জাতিকে বলে বেদুইন। ইউরোপের যাযাবর জাতি বা বেদের দলকে বলে জিপসি। মিশর দেশের ইংরেজী নাম ঈজিপ্ট। ঈজিপ্টের 'জিপ' শব্দ থেকে জিপ্সির উৎপত্তি হয়েছে। কারণ বহু বছর আগে মিশর অর্থাৎ ঈজিপট্ থেকে জিপসীর দল সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তারও প্রায় এক হাজার বছর আগে, ভারতের উত্তর পশ্চিম দিক থেকে বেদের দল সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্যান্য দেশে বাস করতে আরম্ভ করে। এরাই হলো আসল বেদের দল। এদের কিছু দল যায় পারস্যদেশে, কিছু যায় তুরস্কে। বাকি সিরিয়া, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে বাস শুরু করে।

ভারত থেকেই এদের উৎপত্তি বলে, ভারতের আদিভাষা সংস্কৃত ভাষার মতোই একরকম ভাষা এরা ব্যবহার করতো।

বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেদের দল রাশিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেন এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডেও লম্বালম্বা পাড়ি দেয়। যে যে দেশে ওরা যেতো, সেখানকার স্থানীয় ভাষা ও ভারতের সংস্কৃত ভাষা মিশিয়ে ওরা কথাবার্তা বলতো।

ইংরেজী ভাষায় জিপ্‌সীকে বলে 'রোম্যানী'। বেদের ভাষায় বলে 'ভার্‌দো'। এরা নানারকম ব্যবসা করে নিজেদের জীবন চালায়। কাঠের বা মাটির নানারকম বাসন তৈরি করা, হাত দেখে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা, ঘোড়া কেনা বেচা করা ইত্যাদি। হাঙ্গেরী ও রুমানীয়ার জিপ্‌সীর দল ভালো গান বাজনা করে দিন কাটায়। যুগোশ্লাভিয়ার বেদের দল বারুদ তৈরি করে ও কেনা বেচা করে জীবন ধারণ করে।

সপরিবারে বসবাস কবে থেকে শুরু হ'ল ?

পরিবার (ফ্যামিলি) সহ বসবাস কবে এবং কেমন করে শুরু হলো, এ কথা কেউই ঠিক করে বলতে পারে না। মাটির ভেতরে খননকার্য করে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে পুরাকালে স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুর দল ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে একসঙ্গেই বাস করতো। বাবা ও মা এবং তাদের সন্তানদের নিয়েই যে এক একটি দল হতো, তার কোনও ঠিক ছিল না। বুনো জন্তুদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তারা ছোট ছোট যন্ত্র নিয়ে আগুন জ্বেলে যাকে তাকে এক সঙ্গে বাঁচানোর চেষ্টা করতো।

অন্যান্য জীব জন্তুর চেয়ে মানুষের পক্ষে পারিবারিক জীবন অনেক বেশী দরকার। এর একমাত্র কারণ হলো যে, মানুষই হলো এ জগতে সবচেয়ে অসহায় জীব। পোকামাকড় এবং অন্যান্য ছোট ছোট জীব জন্মাবার পর থেকেই নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু উচ্চস্তরের জীবদের বাচ্ছা—যেমন মানব শিশু, ভল্লুক শিশু, প্রভৃতিদেরকে জন্মাবার পরও খাওয়াতে ও দেখাশোনা করতে হয়।

শত্রুদের হাতে থেকে বাচ্ছাদের রক্ষা করার জন্য বাবাই বাইরে থেকে খাবার জোগার করে আনতো। বাবার চেয়ে মায়ের প্রয়োজন হতো বেশী, কারণ মাকে দুধ খাওয়াতে হতো। এই ভাবেই, নিজেদের স্বার্থের জন্য ও

সুযোগ সুবিধার জন্য স্ত্রী-পুরুষ ও বাচ্ছারা মিলেমিশে বাস করতে সুরু করে।

হাজার হাজার বছর আগে এই ভাবে ধীরে ধীরে পারিবারিক ও পরে সামাজিক ভাবে জীবন ধারণ প্রথা চালু হতে থাকে। অনেক পরিবারের মধ্যে মায়ের ভায়েরাই পরিবারের কর্তা হতো।

প্রাচীন মিশরের রাজারা নিজেদের ভগিনীকেও বিবাহ করতো। তিব্বতে এবং ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে এ-নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে। বাইবেলের আমলে, একজন পুরুষের দুটো বা তিনটে করে স্ত্রী থাকতো। কোনও কোনও স্ত্রীলোকের একের চেয়ে বেশী স্বামীও থাকতো। একে বলা হতো বহুবিবাহ প্রথা বা পলিগ্যামি। সমাজ উন্নত ও সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা উঠে গিয়ে এক বিবাহ প্রথা বা মনোগ্যামি প্রথা চালু হতে থাকে। আফ্রিকার অনেক জায়গায় এখনও বহু বিবাহ প্রথা চলিত আছে।

ক্ষুধা তৃষ্ণাকে কি জয় করা যায় ?

তেষ্টা পেলেই গলা শুকিয়ে যায়, আর খিদে পেলেই পেট চুঁই চুঁই করতে থাকে। তখনই ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা আমাদের মনে হয়। আর নিবৃত্তি করারও চেষ্টা করি। কিন্তু মজার কথা হলো—গলার ও পেটের অনুভূতির জন্য ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কেউই দায়ী নয়।

মানুষের রক্ত মাত্রেই কিছু জল ও কিছু লবণ থাকে। শরীরের ভেতরের কোষ ও তন্তুগুলোতেও জল ও লবণ থাকে। এই কোষ ও তন্তুগুলো থেকেই রক্ত জল ও লবণ গ্রহণ করে শরীর গঠনের সমতা বজায় রাখে। তন্তু ও কোষের জলও লবণের অভাব হলেই সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে সে খবর চলে যায়। শ্বাসনালী ও খাদ্যনালীর ঠিক সংযোগস্থলে ফ্যারিংস্ নামে যে গ্রন্থি আছে, সেটা কুঁচকে ছোট হয়ে যায়। এই সংকোচনের ফলেই আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের গলা শুকিয়ে গেছে ও তেষ্টা পেয়েছে।

ক্ষুধার অনুভূতিও মস্তিষ্কে অনুভব করা যায়। পাকস্থলী ও অন্ত্রের (নাড়িভুঁড়ির) কার্যপ্রণালী বাধা পেলেই মস্তিষ্কের ক্ষুধার কেন্দ্রটি তা বুঝতে পারে। রক্তের মধ্যে যথেষ্ট খাদ্য থাকলে, পাকস্থলী, অন্ত্র ও ফ্যারিং-সের কাজ স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে। রক্তে খাদ্যের অভাব হলেই, মস্তিষ্কের ক্ষুধা তৃষ্ণার কেন্দ্রটি চঞ্চল হয়ে ওঠে। সাদা কথায়, পাকস্থলী, অন্ত্র ও ফ্যারিংস এই তিনজনে মিলে মস্তিষ্ককে ঘেরাও করে ফেলে এবং দাবী পূরণ

না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে।

যে পরিমাণ খাদ্য আমরা গ্রহণ করে থাকি, সেই পরিমাণটুকু কমিয়ে আমরা ক্ষুধাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

জীব যতো ছোটো ও কর্মঠ হবে তার খাদ্য ভাণ্ডার ততো তাড়াতাড়ি ফুরিয়েও যাবে। ছোটো একটা পাখি না খেয়ে যদি পাঁচ দিনে মারা যায় তাহলে একটা কুকুর কুড়ি দিনে মারা যাবে। ভীত-সন্ত্রস্ত বা উত্তেজিত মানুষের দেহের প্রোটিন শান্ত মানুষের দেহের প্রোটিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

অনেক মানুষ আছে যারা বিনা আহারে বহুদিন না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। অনেক লোক যেমন একাগ্র মনের সাহায্যে নানারকম খেলা বা বাজীর কসরৎ দেখিয়ে থাকে, তেমনি অনেকে আবার ঠিক ঐভাবেই ক্ষুধাতৃষ্ণাকেও জয় করে থাকে। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হয় বটে, পরে এই অভ্যাস হয়ে যায়। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।

সাঁতার কি ভাবে চালু হলো ?

হাঁসের মতোই অনেক জীবজন্তুর কাছে সাঁতার একটা জন্মগত অভ্যাস। মানুষের বেলা কিন্তু তা নয়। মানুষকে কষ্ট করে সাঁতার শিখতে হয়। যেসব জন্তু সহজাত প্রবৃত্তির দরুন সাঁতার কাটে, তাদের দেখেই মানুষ সাঁতার কাটা শেখে। প্রাচীন মানুষেরা বাঁচার তাগিদেই এ কৌশল শিখতে বাধ্য হয়।

প্রথমে কুকুরের সাঁতরানো দেখে, মানুষ তা অনুকরণ করতে শেখে। এতে হাত ও পা দুইই ব্যবহৃত হয়। দু হাজার বছর আগে মানুষ যে সাঁতার শিখেছিল—সেটা ছিল বুকের ওপর ভর করে চলা। যে সব জলের স্রোতের টান খুব বেশী থাকে, সেই সব জলে এখনও এই নিয়ম মেনে চলা হয়।

দ্বিতীয় প্রথাটি হলো—এক পাশে ভর ক'রে চলা। এই প্রথায় পা দুটো কাঁচির মতো জল কাটতে কাটতে এগুতে হয়।

তৃতীয় প্রথাটি হলো—সামনের দিকে একটা লম্বা হাতকে এগিয়ে রেখে, অপর হাত দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে এগুতে থাকা।

চতুর্থ প্রথাটির নাম হলো—ট্রাড্‌জেন। ট্রাড্‌জেন নামে এক ইংরেজ ১৭৮৩ সালে এই প্রথাটির প্রবর্তন করেন। দুটো হাতই এক একবার করে

ব্যবহৃত হবে, আর পা ছু'টো কাঁচির মতো জল কাটতে থাকবে। ট্রাড্জেন এই পদ্ধতির দ্বারা সাঁতারের অনেক রেকর্ড ভঙ্গ করেছিলেন। তা দেখে বহুলোক এই পদ্ধতিটিই অনুকরণ করতে থাকে।

পঞ্চম প্রথাটি হলো হামাগুঁড়ি সাঁতার। রিচার্ড-ক্যাভিন্ নামে এক ইংরাজ ১৯০২ সালে এই প্রথা চালু করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে এটা শিখে আসেন। অন্যান্য সব সাঁতারের চেয়ে এটাই হলো সবচেয়ে দ্রুতগামী সাঁতার। প্রাচীন রোম ও গ্রীসেই সাঁতার প্রথম চালু হয়। তারও হাজার হাজার বছর আগে, সমুদ্র মন্থনের সময়ে ভারতে সাঁতারের প্রথা চালু ছিল।

জীবনটা কি ?

মানুষের জীবনে যেসব রহস্য আছে, সেই সবের মধ্যে এটিও একটি। বিজ্ঞানীদের মতে—প্রোটোপ্ল জাম্ নামক একরকম পদার্থ থেকেই জীবনের উৎপত্তি। এই প্রোটোপ্লাজমে্ যেসব রাসায়নিক পদার্থ আছে, সে সবই গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকরা তৈরি করতে পারেন ও সংমিশ্রণ ঘটিয়ে :ঠিক এই প্রোটোপ্লাজম্ই প্রস্তুত করতে পারেন। কিন্তু এতে প্রাণ বা জীবনে দিতে পারেন না।

সমস্ত জীবজন্তুদের ভালোভাবে নিরীক্ষা ও পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে,—কতকগুলি গুণ সব জীবের মধ্যেই সাধারণভাবে রয়েছে।

প্রথম প্রথাটি হলো বৃদ্ধি পাওয়া। যে কোনও একটা গড়ন ও আকার নিয়ে একটা ছোটো জিনিষ বাড়তে বাড়তে বড়ো হতে থাকে। বীজ থেকে বৃক্ষ হয়, ভ্রূণ থেকে শিশু হয়, শিশু থেকে আবার মানুষ হয়। জীব মাত্রই বাড়তে থাকে।

দ্বিতীয় গুণটি—ক্ষতি-পূরণ করা। গাছের ডাল ভেঙ্গে গেলে, সেখানে নতুন ডাল গজিয়ে উঠবে, মানুষের চামড়া কেটে গেলে, তা আবার ঢাকা পড়ে যাবে। হাড় ভাঙলে, তা জুড়ে যাবে।

তৃতীয় গুণটি হলো—উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্টি করা। এটি না থাকলে জীবের মৃত্যুর পর, নতুন জীবের সৃষ্টি হতো না, এবং জীবও পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যেতো।

জীবজন্তু, পশুপক্ষী, মাছ, পোকামাকড় এবং উদ্ভিদাদি থেকে বংশ বৃদ্ধি অবিরতভাবেই চলতে থাকে।

চতুর্থ হলো—পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে উপযোগী করে নেওয়া। মস্তিষ্কের দরুন, অন্যান্য যে কোনও জীবের চেয়ে মানুষ এই কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে। উদ্ভিদাদির এই গুণটি খুবই সীমাবদ্ধ।

পঞ্চম ও শেষ গুণ হলো—সংবেদনশীলতা বা বোধশক্তি সম্পন্নতা অর্থাৎ বাইরের কোনও শক্তিকে অনুভব ক'রে উপলব্ধি করা ও সেই মতো কাজ করা। বাইরের কোনও শক্তি প্রভাব বিস্তার করলেই, জীবন্ত পদার্থ থেকে তার কিছু প্রতিক্রিয়া হবেই। কিছু গন্ধ নাকে এলেই, তার কিছু প্রতিক্রিয়া হবেই। আলো দেখলেই, ফুল ও পাতা সেই দিকে এগুবেই। এই হলো সজীবতার লক্ষণ।

এই পাঁচটি গুণ থেকেই বলা চলবে না যে জীবটা কি। তবে এইটুকু বলা চলে যে, জীব মাত্রই এই পঞ্চগুণের অধিকারী হয়। কারণ, পঞ্চভূত থেকেই জীবের উৎপত্তি। এই পঞ্চভূত হলো, ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই পঞ্চভূতের অধিকারী হলেন মহাদেব পঞ্চানন। যাঁর পঞ্চমুখ থেকেই পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়ে একত্রিত হয় ও সৃষ্টি সুরু হয়। আবার প্রলয়ের সময়ে এই পঞ্চভূত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এই ভাবেই জীবন ও প্রাণ যাতায়াত করে। কিন্তু সেটা যে কি কেউই বলতে পারে না।

শ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন হয় কেন ?

জীবজন্তু, পশুপক্ষী ও উদ্ভিদ মাত্রেই শ্বাস গ্রহণ করে থাকে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া কোনও জীবই জীবন ধারণ করতে পারে না। প্রশ্বাসের দ্বারা আমরা অক্সিজেন বা অম্লজান বায়ু গ্রহণ করি। আর নিঃশ্বাসের দ্বারা কার্বন ডাই অক্সাইড বা অঙ্গারাম্লজান বায়ু ত্যাগ করি। অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতেই পারবো না।

শরীরের ভেতরে যে অক্সিজেন আছে, সেটা খরচ হয়ে গেলেই নাক ও মুখ দিয়ে বাইরের বায়ু থেকে আমরা আরো অক্সিজেন গ্রহণ করি। অক্সিজেন খরচ হওয়ার সংগে সংগে ভেতরের কার্বন-ডায়-অক্সাইড গ্যাস ও জলের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তাকে বার করে দেওয়ার জন্যই বাইরে থেকে অক্সিজেন নেওয়ার দরকার হয়।

আমাদের শ্বাস গ্রহণের জন্য প্রকৃতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস মজুত থাকে। বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজেন ও কার্বনডায় অক্সাইড গ্যাস থাকে, তার পরিমাণে কিছু কিছু তারতম্য হয়। তার কারণ আমরা যে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস ছাড়ি, উদ্ভিদ সেইটাই বেঁচে থাকার জন্য গ্রহণ করে। তারা ছেড়ে দেয় অক্সিজেন গ্যাস—যেটা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অতীব প্রয়োজন। আমাদের ফুসফুসের মধ্যে এই শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চলতে থাকে।

ফুসফুসের ভেতরে যে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ হয়, সেটা বাইরের শ্বাস প্রশ্বাসের কাজের ঠিক বিপরীত। শরীরের রক্তের লোহিত কণিকাগুলো ফুসফুসের অক্সিজেনকে নিয়ে শরীরের বিভিন্ন কোষে ও তন্তুতে পাঠিয়ে দেয়। অক্সিজেন গ্যাস এইখানেই শরীরের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরী করে। খাদ্য তৈরী হয়ে যাওয়ার পর, রক্ত সেখান থেকে দূষিত পদার্থ, অতিরিক্ত জল ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে ফুসফুসে পাঠিয়ে দেয়। ফুসফুস এই-গুলোকেই নিঃশ্বাসের মাধ্যমে হাওয়ার মধ্যে বার করে দেয়।

বিশ্রামের সময়ে যে অক্সিজেন আমাদের দরকার হয়, কাজের সময়ে তা আট/দশ গুণ বেড়ে যায়। যদি আরো অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা আরো তাড়াতাড়ি ও আরো জোরে শ্বাসগ্রহণ করে থাকি।

বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন পরিমাণে অক্সিজেন নিয়ে থাকে। নবজাত শিশু এক সেকেণ্ডে একবার, ১৫ বছরের মানুষ এক মিনিটে কুড়িবার। হাতী মিনিটে দশ বার, আর কুকুর মিনিটে ২৫ বার শ্বাসগ্রহণ করে থাকে।

শিশু কিভাবে কথা বলতে শেখে ?

প্রসব হবার পরই শিশু কি কথা বলতে পারে? কেউ বলে—"না"। আবার কেউ বলে—"হাঁ।" তবে এটা ঠিক যে, ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশু কাঁদতে থাকে। না কাঁদলে পিঠে চাপড় মেরে কাঁদানো হয়। গলায় আঙুল দিয়ে গলা সাফ করে ফেলা হয়। যাতে তাড়াতাড়ি কাঁদতে পারে। কাঁদলেই বোঝা গেল যে শিশু জীবিত। না কাঁদলে, তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়। কাঁদার সঙ্গে সঙ্গেই, যন্ত্রের কাজ সেই প্রথম চালু হলো এবং যতদিন বেঁচে থাকবে, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যন্ত্রের কাজ অবিরাম গতিতে চলতে থাকে।

মহাপুরুষরা বলেন—শিশু জন্মাবার পরেই কান্নার মাধ্যমে বলতে থাকে—'ওঁয়া' অর্থাৎ 'কাঁহা' মানে 'কোথায়'। তোমরা আমাকে 'কোথায়' আনলে?

'কোথায়' আমাকে যেতে হবে? কান্নার মধ্যে দিয়ে শিশু বলতে থাকে 'কেঁও' মানে 'কেন'? 'কেন' তোমরা আমাকে এখানে আনলে? আমি তো বেশ সুখে শান্তিতে ছিলাম। তোমরা কেন আমার ঘুম ভাঙালে? কী অপরাধ আমার? এই বলেই কাঁদতে থাকে।

উত্তর হলো—ভবিতব্য। যা ঘটবেই। যার উপর কারুর কোনও হাত নেই। কেউ বলে—এসব নিয়তি বা অদৃষ্টের খেলা। ভক্ত বা জ্ঞানীগুণীরা বলেন—এসব ঈশ্বরের লীলাখেলা। কিছুই করবার নেই। বৌদ্ধরা বলেন—শিশুর পূর্বজন্মের কর্মফল। জড়বাদীরা বলেন—এসব জড় প্রকৃতির খেয়াল-খুশী।

অনেকে বলেন—পৃথিবীর আলোতে আসার পরেই শিশুর উচ্চারিত শব্দ হলো 'মা'। বিদেশেও অনেক লোকে একথা স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন—শিশুর প্রথম উচ্চারিত শব্দ হলো—'মাম্ মা'। পৃথিবীর কোনও সজীব পদার্থই এভাবে মানবশিশুর মতো নিজের মাকে ডাকতে পারে না।

জন্মাবার পর শিশুর মস্তিষ্ক থাকে একখানা আনকোরা কাগজের মতো। যেখানে কোনও ছাপ পড়েনি। বাইরের থেকে কোনও অনুভূতি সেখানে কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। কারণ চোখ থাকে বন্ধ। চোখ খোলার পরও মস্তিষ্কের কাজ শুরু হয় না। কারণ মস্তিষ্ক কাজ করার মতো পরিণত অবস্থায় না আসায়, এবং পূর্ণতা লাভ না করায়, চোখের মাধ্যমে যেসব অনু-ভূতি মস্তিষ্কে গিয়ে ধাক্কা মারে, তা কোন সাড়া জাগায় না।

দু'এক মাস পরে মাকে দেখে বুঝতে পারে যে, সে একটা কিছু দেখছে। বার বার একই জিনিস দেখার ফলে, মায়ের প্রতি একটা অনুরাগ আসে। মাথার কাজ তখন শুরু হয়। মা তখন নিজেকে শিশুর কাছে চিনিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করে। মা 'মা—মা' বলে আদর করতে থাকে। শিশুও সেই আওয়াজ শুনে অনুকরণ করে 'মাম্ মা' বলতে শেখে। প্রথম বলে জড়ানো অস্পষ্ট ভাষায়। যতোই বড়ো হতে থাকে ততই স্পষ্ট ভাষায় 'মা' বলে মাকে ডাকতে শেখে।

শিশুর দর্শনশক্তি ও শ্রবণ শক্তি দুটোই তৎপর হয়ে উঠে কাজ করতে থাকে। মাকে আপনার জন বলে চিনতে পারে। মায়ের সব রকম চলা-ফেরা কথাবার্তা হাবভাব অনুকরণ করতে থাকে।

"মা" কথাটা শেখার পর শিশু অন্যান্য কথাও শিখতে আরম্ভ করে। মা তখন গর্বভরে প্রতিবেশীদের বলতে শুরু করে আমার বাচ্চা কথা বলতে শিখেছে।

কোঁকড়ানো চুল কিভাবে হয় ?

স্বাভাবিক চুলকে কোঁকড়ানো চুল করার জন্য, অনেকেই বড়ো বড়ো সেলুনে যান এবং বেশ পয়সাও খরচা করেন। কিন্তু কৃত্রিম কোঁকড়ানো চুল বেশিদিন কোঁকড়ানো থাকে না। তাহলে স্বাভাবিক কোঁকড়ানো চুল কি ভাবে হয় ?

প্রত্যেক চুলের শেকড়ের কোষের মধ্যে পিগ্‌মেন্ট নামক একরকম রঞ্জক পদার্থ থাকে। এই কোষগুলিই বাড়তে থাকে এবং চুলকে উপরের দিকে উঠতে সাহায্য করে। কোনো কোনো কোষের মৃত্যু হ'লে আশ পাশ থেকে অন্যান্য কোষের আবার সৃষ্টি হয়। কোষের ভেতরের রঞ্জক পদার্থের দানাগুলিতে নানা রঙ থাকে। যেমন—লালা, বাদামী, সাদা, কালো ইত্যাদি। চুল যতোই উপরের দিকে ঠেলে উঠতে থাকে, দানাগুলোও এই সব রঙের যে কোনো একটা রঙকে চুলের ভেতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়। চুলও তখন সেই রকম রঙের হয়ে যায়। চুলের শেকড় যার ভেতর গাঁথা থাকে, তার রঙ হল্‌দে। দানাগুলোর রঙ আর হলদে রঙ মিশে যে রঙ হয়, চুলেরও সেই রঙ হয়।

চুলের আকারও বিভিন্ন রকমের হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, চুল নানা গঠনের হয়। গোল, চ্যাপটা, ডিম্বাকৃতি, অর্ধচন্দ্রাকৃতি এবং উপবৃত্তাকৃতি। চুলের আকারের উপরে কোঁকড়ানো চুলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। চুল যতো চ্যাপটা হবে ততোই কোঁকড়ানো হবে। যতো গোল হবে, ততো সোজা ও শক্ত হবে।

উপবৃত্তাকৃতি চুল সাধারণত ছোট ও বাঁকা হয়—ভেড়ার চুলের মতো দেখতে হয়। কৃষ্ণাঙ্গ জাতিদের এই চুল বিশেষত্ব। ডিম্বাকৃতি চুল ঢেউ খেলানো ও খুব মোলায়েম হয়।

চিংড়ি মাছ কিভাবে খায় ?

খোলার ভেতর থেকে চিংড়ি মাছ কিভাবে শ্বাস নেয়, কিভাবে খায়,, কিভাবে আত্মরক্ষা করে—ভাবলে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়।

চিংড়ি অন্যান্য জীবের মতো সাধারণ নয়। চিংড়ির জীবন বড়ই জটিল ও গোলমেলে। চিংড়ির মধ্যে নানা রকম ইন্দ্রিয়, রক্ত ও স্নায়ুর ব্যবস্থাও আছে।

চিংড়ির খাদ্য হলো শৈবাল জাতীয় গাছপালা বা শ্যাওলা এবং ছোট ছোট পোকা মাকড়। এই সব কীট পতঙ্গ এতো ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া সাদা চোখে তাদের দেখা যায় না। খোলা খুললেই জলের সঙ্গে সঙ্গে এই সব অণু পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্য ভেতরে ঢুকে যায়। চিংড়ির ফুলকো থেকে বেরুনো লালার ছোঁয়াচ লেগে জলের মধ্যে মেশানো এই পোকাগুলো আলাদা হয়ে যায়। আলাদা হয়ে যাবার পর, যেসব খাদ্য খুব বড়ো বা চিংড়ির মনের মতো নয়, যেগুলোকে চিংড়ি বাদ দিয়ে দেয়। এটা যে কেমনভাবে হয় তা কিন্তু জানা যায় না।

চিংড়ির খাদ্যনালীর মুখে চারটি প্রবেশ পথ আছে। এই চারটি প্রবেশ পথই খাদ্য বেছে নেয় এবং ভেতর দিকে পাঠিয়ে দেয়। চিংড়ির পাকস্থলী থলের মতো বড়ো, আর এর মুখে আধ ইঞ্চি লম্বা একটা সরু লাঠির মতো দণ্ড আছে। লাঠিটা পাকস্থলীর চারদিকে ঘুরতে থাকে, আর খাবারের ছোট ছোট দানাগুলোকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে থাকে। লাঠিটার মুখ থেকে এক রকম লালা বেরুতে থাকে, যার ছোঁয়াচ লেগে খাবারগুলো হজম হয়ে যায়। এ ছাড়াও পাকস্থলীর চারদিকে একটি হজমী গ্রন্থী আছে—যার মধ্যে আছে রক্ত কোষ। এই গুলোর সাহায্যেই চিংড়ি খেয়ে থাকে। আবার হজমও করতে পারে।

ছাগলে কি না খায় ?

কথায় বলে ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে। পাগলে যেমন যাতা উল্টো পাল্টা বলে, ছাগলেও তেমনি যা খুশি তাই খায়। ছাগলের এমনই জন্মগত স্বভাব যে, যেসব জিনিষ খেলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে, ঠিক সেইগুলো বাদ দিয়েই আর সব জিনিষই খাবে। অন্যান্য জীবের পক্ষে যেগুলি অখাদ্য, ছাগলের কাছে সেগুলিই খাদ্য। এর একমাত্র কারণ হলো —অন্যান্য গৃহপালিত পশুদের যেরকম যত্নের সঙ্গে বাছা বাছা খাবার খেতে দেওয়া হয়, ছাগলের বেলায় সেরকম আদর যত্ন করা হয় না। এই জন্যই ছাগল খুব সহজেই বেঁচে থাকতে পারে, এবং যারা ছাগল পোষে তাদের পক্ষেও ছাগল পোষা খুব সহজ হয়ে পড়ে। মানুষের সঙ্গে ছাগলের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কারণ, মানুষের কাছে ছাগল খুবই প্রয়োজনীয় ও উপকারী জীব। এতো উপকারিতা সত্ত্বেও ছাগলের দুটো দুর্নাম আছে। একটি হলো

ছাগল একটুতেই রেগে যায়। আর একটি হলো পুরুষ ছাগলের গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়।

ছাগল অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর চেয়ে ছোটো হলেও, মানুষকে নানা-ভাবে সেবা করে থাকে। গরুর চেয়ে, ছাগলের দুধ বেশি স্বাস্থ্যপ্রদ। গরুর দুধের চেয়েও ছাগীর দুধ হজম করা সহজ বলে ; শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীদের এই দুধ দেওয়া হয়। অনেক ছাগল গাধার মতো বোঝা বয়। আবার অনেক ছাগলের চামড়াও খুব কাজে লাগে। মরক্কো চামড়া বেশ দামী চামড়া। আবার অ্যাঙ্গোরা ও কাশ্মীরী ছাগলের উল সোয়েটার বোনার কাজে লাগে। প্রথমে পারশ্য দেশেই ছাগল পোষা হতো। এখন পৃথিবীর সর্বত্রই ছাগল পোষা হয়। ইউরোপে প্রায় দশ রকম জাতের ছাগল পাওয়া যায়। আফ্রিকা ও এশিয়ার ছাগলও নানা জাতের হয়।

কচ্ছপ কী খায় ?

কচ্ছপের কতকগুলি অদ্ভুত ও মজার অভ্যাস থাকলেও এদের খাওয়া খুবই সাধারণ ধরনের।

এরা সাধারণত মাছ, ব্যাঙ, এমন কি হাঁস খেয়েও বেঁচে থাকে। এদের বলা হয় দংশন কারী কচ্ছপ। আর এক রকম কচ্ছপ আছে যাদের মাংস খেতে অনেক মানুষের ভালো লাগে—এরা হলো রাক্ষুসে কচ্ছপ। এরা পোকামাকড়, কোলা ব্যাঙ আর মাছ খেয়ে থাকে। খুদে কচ্ছপরা জলেও থাকে, স্থলেও থাকে। তবে বেশির ভাগ ডাঙ্গায় থাকতে ভালোবাসে। গরমকালে জলেতেই থাকে। ডাঙ্গায় থাকার সময়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—শ্যাওলা ও ব্যাঙের ছাতার সন্ধানে। গফার কচ্ছপ ডাঙ্গায় গর্ত করে সারাদিন বাস করে। সন্ধ্যার পরে খাবারের খোঁজে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে—ফলমূল শাকসবজির সন্ধান করতে থাকে।

শীতকালে যখন খাবারের অভাব হয়, তখন এরা কী করে ? অন্যান্য সরীসৃপ জীবের মতো কচ্ছপও সারা শীতকালটা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। এরা কতক্ষণ ঘুমোবে সেটা নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। তবে সাধারণত আশ্বিন মাস বা অক্টোবর থেকে ফাল্গুন মাস বা মার্চ পর্যন্ত—এই ছয় মাস এরা ঘুমিয়ে থাকে। জলচর কচ্ছপ জলের তলাতেই থাকে। স্থলচর কচ্ছপ সারা শীতকালটা ডাঙ্গাতেই কোনো জায়গায় গর্ত করে তার মধ্যে নিজেদের—লুকিয়ে রেখে দেয়।

স্থলচর কচ্ছপ ফুস্‌ফুস দিয়ে শ্বাস নিয়ে থাকে। এদের সারা শরীরটা শক্ত মোটা খোলা দিয়ে ঢাকা থাকে। এই খোলা দু'রকমের হয়। এক রকমের খোলা পিঠটাকে ঢেকে রাখে, আর দ্বিতীয় রকমের খোলা শরীরের নিচের অংশটাকে ঢেকে রাখে। এই দুই অংশের মধ্যে যে ফাঁক থাকে, তার ভেতর দিয়েই স্থলচর কচ্ছপ তার মাথা, গলা, লেজ ও পাগুলো বার করে আবার ঢুকিয়ে নেয়।

কচ্ছপের দর্শনশক্তি, স্বাদশক্তি ও স্পর্শশক্তি খুব প্রখর হয়; কিন্তু এদের শ্রবণ শক্তি খুবই দুর্বল।

স্বর্ণ যুগ কি?

পৃথিবীর কোন কোনও জায়গায় সভ্যতার চরম প্রকাশ হয়েছিল পাঁচশো থেকে হাজার বছর আগে। এই চরম সভ্যতার যুগে, মানুষ অদ্ভুত ও বিচিত্র রকমের কাজ করেছিল—যার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়।

যিশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় পাঁচশো বছর আগে প্রাচীন গ্রীস দেশ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেছিল।

পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য গ্রীককে আক্রমণ করেছিল। গ্রীস সে আক্রমণ প্রতিরোধ করে পারস্যকে অনেক পিছনে হটিয়ে দেয়। গ্রীসেরই একটি রাজ্য এথেন্স এবং সেখানকার লোকেরা এই আক্রমণ প্রতিরোধ করায়, এথেন্স গ্রীসের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী রাজ্য হয়ে ওঠে।

সমগ্র গ্রীসের নৌ-বাহিনীর চেয়ে এথেন্সের নৌ-বাহিনী বিরাট ছিল। নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিশেষ করে রুপোর খনি থেকে এথেন্সের সম্পদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনসংখ্যাও চারগুণ বেড়ে যায়। লোকবল অর্থবল এবং শারীরিক বলের দিক দিয়ে এথেন্স অন্যান্য সব রাজ্যকে ছাড়িয়ে যায়।

এই যুগের এথেন্সের নেতা ছিলেন—পেরিকিল্‌স্‌। পৃথিবীর যে সমস্ত বিখ্যাত সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রাসাদ সে সময় ছিল তার মধ্যে একটি হলো 'পারথিনন্‌'। এই পারথিনন্‌ এই যুগেই তৈরি হয়েছিল। বিখ্যাত ভাস্কর ফিডিয়াস, জগদ্বিখ্যাতে দার্শনিক ও শিক্ষক সক্রেটিস্‌ প্রখ্যাত নাট্যকার সফকল্‌স্‌ এবং ইউরিপিডিস্‌ এই যুগের লোক। এথেন্সকে সাহায্য করার জন্য সকলেই উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসতো। প্রচুর সম্পদ ও শক্তি

থাকার জন্য লোকেরা অবসর পেতোও প্রচুর। শিক্ষা ও জ্ঞানের দিক দিয়েও তারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল।

প্রাচীন গ্রীসের সেই স্বর্ণযুগের প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কি, বর্তমান যুগেও আমরা গ্রীসের অনেক প্রভাব এখনও অনুভব করে থাকি।

পরে পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার যুদ্ধ লাগে। যুদ্ধের পরে এথেন্সের সংস্কৃতি আস্তে আস্তে ধ্বংস হতে থাকে। ইউরোপের স্বর্ণযুগেরও অবলুপ্তি ঘটে।

গ্রীসের স্বর্ণযুগের চেয়েও আগে ভারতেও সভ্যতার চরম নিদর্শন পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার খনন কার্যের মাধ্যমে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায় যে, ভারত তারও আগে অনেক উন্নত ও সভ্য ছিল।

বোবা-কালারা কিভাবে কথা বলতে শেখে ?

ষোড়শ শতাব্দীতেও বোবা-কালা বা মূক-বধিরদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হতো। মূর্খ ও বুদ্ধিহীন বলে তাদের ঘৃণা করা হতো, পৃথক কারাগারে রেখে দেওয়া হতো, এমন কি, হত্যাও করা হতো। যতোদিন বেঁচে থাকতো, লোকে তাদের নিয়ে নানারকম নিষ্ঠুর ঠাট্টা তামাসাও করতো।

জেরোম কার্ডান নামে একজন ইটালিয়ান ডাক্তার এই ষোড়শ শতাব্দীতেই কতকগুলি লিখিত অক্ষরের মাধ্যমে এদের লেখাপড়া শেখানোর কথা চিন্তা করেন।

তাঁরই এই প্রচেষ্টার ফলে, প্রায় একশো বছর পরে আঙুল দিয়ে অক্ষর চেনার পদ্ধতি চালু হয়। বর্তমান যুগে যে পদ্ধতি চালু আছে, অনেকটা তারই অনুরূপ। এই প্রথায় বোবা-কালা সন্তানেরা অক্ষর চিনতে শেখে ও উচ্চারণও করতে শেখে। সংস্পর্শের মাধ্যমেও তারা কিছু কিছু শেখে। যেমন—ঠোঁটের উপর দিয়ে তর্জনী আঙুলটা একবার বুলিয়ে নেওয়া অর্থাৎ 'তুমি আমাকে সত্য কথা বলছো না।' থুতনির উপরে তিনটা আঙুল দিয়ে একবার টোকা মারা অর্থাৎ 'আমার কাকা।' এই ভাবে একটা মূক-বধির শিশু মিনিটে প্রায় ১৩০টা কথা কলতে শেখে।

অনেক শিক্ষক এই প্রণালীটাকে উপযুক্ত বলে মেনে নিতে পারেন নি। এতে বোবা-কালা ছেলেমেয়েদের মধ্যেই কথা বলা চলে। অন্য লোকের

সঙ্গে কথা বলার অসুবিধা হয়। নতুন প্রথা চালু হলো—যার নাম মৌখিক নির্দেশ। শিশুকে কোনোও একটা কথা প্রথমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, পরে যাতে সেটা উচ্চারণ করতে পারে, তার জন্যও তাকে শেখানো চলতে থাকে।

আজকাল অনেক বোবা-কালা ছেলেমেয়ে ঠোঁট নাড়া দেখে ভাষা বলতে শেখে। অন্যলোক কথা বলার সময়ে, কিভাবে ঠোঁটের প্রয়োগ করে তা' খুব নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করে ও শিখতে চেষ্টা করে। ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলার কাঁপুনিও খুব ভালো ভাবে লক্ষ্য করে।

আজ কাল শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। স্কুল, কলেজ ও কোনও সমাবেশে ব্যাপকভাবে এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি কানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। একেই বলে ইয়ারফোন। শিক্ষকমহাশয় বলেন মাইক্রোফোনের সাহায্যে। আর ছাত্ররা ইয়ারফোনের মাধ্যমে তা শিখতে চেষ্টা করে।

ফুল কিভাবে জন্মায় ?

প্রত্যেক জীবেরই উৎপাদন হয়। ফুলেরও বংশবৃদ্ধি হয়।

প্রত্যেক ফুলের চারটি করে অংশ থাকে। সবচেয়ে বাইরে কাপের আকারে সবুজ কতকগুলি পাতা থাকে। এইটি হলো বহিরাবরণ বা বৃত্তি বা সেপাল। একত্রে বলে বৃত্তিদল বা ক্যালিক্স। তার পরের রঙীন অংশটিই হলো পাপড়ি বা পেটাল। এক সঙ্গে বলে পাপড়িদল বা করোলা। এর পরেই থাকে পুঃ কেশর। আর ঠিক মাঝখানে থাকে গর্ভকেশর। গর্ভকেশরের নীচে থাকে গর্ভ। এর মধ্য থেকেই ফলের বীজ সৃষ্টি হয়। পুঃ কেশরের পরাগরেণুগুলো উড়ে এসে গর্ভকেশরের মাথায় পড়ে। গর্ভকেশরের উপরের অংশটাকে বলে গর্ভমুণ্ড। রেণুগুলো উড়ে এসে এই গর্ভমুণ্ডে পড়েই আটকে যায় এবং সরু নলের মতো লম্বা হয়ে গিয়ে গর্ভকেশরের ভেতর দিয়ে গিয়ে মূল গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সরু ও লম্বা নলের মতো রেণুগুলোর মধ্যে থাকে ডিম্বাণু। নলটি ফেটে গিয়ে ডিম্বাণু গর্ভাশয়ের মধ্যে ঢুকে যায় এবং ফলের মূল বীজ তৈরি হয়। একটি নল দিয়ে একটি ডিম্বাণুই ভেতরে যায়। একই গাছের পরাগ-রেণু একই গাছের গর্ভমুণ্ডে পড়লে, তবেই উৎপাদন হবে। এর নাম স্ব-উৎপাদন বা ক্রশ-পলিনেশান। এক গাছের পরাগরেণু, যদি একজাতীয় অন্য এক গাছের গর্ভমুণ্ড গিয়ে পড়ে, তাকে বলে সংকর উৎপাদন বা হাইব্রিড। হাওয়া, পোকামাকড় বা পশুপক্ষীর সাহায্যেই

সংকর উৎপাদন বা মিশ্র জাতীয় ফলের উৎপাদন হয়। এই ফলের বীজ থেকেই আবার শেকড় (মূল) ও কাণ্ড (গুঁড়ি) বেরিয়ে নতুন গাছের সৃষ্টি হয়।

হীরা জ্বলজ্বল করে কেন ?

হীরা যদি এখনকার মতো এতো দুষ্প্রাপ্য না হতো, কিংবা যদি এর এতো মূল্য না হতো, কিংবা সকলেই যদি হীরা ব্যবহার করতে পারতো; তাহলে হীরাকে কেউই এতো আদর যত্ন সম্মান করতো না।

দুইটি গুণের জন্য হীরা বিখ্যাত। প্রথমটি হলো—এর কাঠিন্য। সবচেয়ে কঠিন পদার্থ হলো হীরা। আর দ্বিতীয়টি হলো—এর সৌন্দর্য ভরা জ্যোতি। এর দিকে তাকিয়ে থাকলে মন আনন্দে ভরে যায়। এই দুইটি গুণের জন্যেই হীরা ব্যবসাবাণিজ্য ও অন্যান্য শিল্পের কাজে খুবই প্রয়োজনীয়।

হীরা হলো প্রকৃতিদেবীর দান। লক্ষ কোটি বছর আগে উত্তপ্ত পৃথিবী যখন ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, তখন এরই ভেতরে ছিল গরম গলিত তরল পাথর। অত্যধিক চাপে ও তাপে এই পাথরই ক্রমশ জমাট বাঁধতে থাকে। কার্বন গ্যাসের সংস্পর্শে এসে এইগুলিই স্ফটিক আকারে রূপ নেয়। হীরা হলো শুদ্ধ কার্বন গ্যাসের ক্রিস্টাল বা স্ফটিক মাত্র।

এই অবস্থায় হীরা অসমান, অমসৃণ ও খুব খরখরে থাকে। বেশির ভাগ হীরাকেই করাত দিয়ে কেটে দুখানা করা হয়। পরে প্রত্যেক অংশটিকে ঘষে মেজে গোল উজ্জ্বল হীরায় পরিণত করা হয়। এই হীরার উপরেই ছোট ছোট কোণ বা মুখ করা হয়। এক একটি হীরায় প্রায় ৫৮ টি করে মুখ থাকে। এই সব কোণযুক্ত মুখের সংখ্যা যতো বেশী হয়, হীরার উজ্জ্বলতাও ততো প্রখর হয়।

হীরার তৃতীয় গুণটি হলো এর প্রতিফলন শক্তি। হীরার ভেতর কোনো আলো ঢুকলেই তার চর্তুগুণ উজ্জ্বল আলো বাইরে ঠিকরে চার দিকে ছিটকে পড়ে—যা অন্য কোনও জিনিসে হয় না। এই আলো সোজা বেরিয়ে না এসে বাঁকা বা তির্যক গতিতে বেরুতে থাকে—যার জন্য হীরাকে আরো জাজ্বল্যমান ও দ্যুতিময় দেখতে হয়। কারণ এই দ্যুতি বেরিয়ে এসে আবার হীরার মধ্যে ঢুকে গিয়ে প্রতিফলিত হতে থাকে। তাই আমাদের চোখে হীরার ডবল জ্যোতির ছায়া এসে পড়ে। এই আলো বিভিন্ন রঙের হয়। মনে হয়

হীরা থেকে আগুন বেরুচ্ছে।

আগে হীরা গয় না হিসাবে ব্যবহার করা হতো না। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে অ্যাগনেস সোরেল নামে একজন ফরাসী অলঙ্কার হিসাবে হীরার প্রচলন সুরু করে। তারপর থেকেই এই প্রথা চলে আসছে।

হাতী কি সব ভুলে যায় ?

বহুদিনের কিংবদন্তী আছে যে হাতী কখনও ভোলে না। জনশ্রুতিতে-ও পাওয়া যায় যে হাতীর স্মরণশক্তি খুব প্রখর। প্রাচীন কালের একটি উপাখ্যান আছে। একটি লোক এক হাতীর মাথায় একটা নারকোল ভেঙে তার জল ও শাঁস খায়। হাতী লোকটার নাগাল না পাওয়ায় কিছুই করতে পারে না। কিন্তু লোকটাকে চিনে রাখে। কয়েক বছর পরে লোকটি রাস্তার ধারে এক নারকোলের দোকান খুলে বসে থাকে। হঠাৎ একদিন সেই হাতী তার মালিকের সঙ্গে সেই নারকোলের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। লোক-টাকে দেখেই হাতী তাকে চিনতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা তার শুঁড় দিয়ে একটা নারকোল সেই দোকান থেকে তুলে নিয়ে লোকটার মাথায় ফাটিয়ে নারকোলটা খেয়ে নেয়। মাথায় নারকোল ফাটানোর আঘাত সহ্য করতে না পেরে লোকটি তখুনিই মারা যায়।

আসল কথা হলো, অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের চেয়ে হাতীর স্মৃতিশক্তি একটু বেশি।

হাতী কিন্তু সত্যই সব ভুলে যায়। একটা বুনো হাতীকে পোষ মানাতে কী না করতে হয়। শিকারীর দল অনেক কষ্ট দিয়ে বুনো হাতীকে ফাঁদে ফেলে। তাদের মায়ের কাছে থেকে ছিনিয়ে আনে। পোষ না মানা পর্যন্ত তাদেরকে পেট ভরে খেতেও দেওয়া হয় না। পোষ মানার পর ভারী ভারী বোঝা ও মোটা কাঠের গুঁড়ি বইতে হয়। কাজ করতে অস্বীকার করলে, তাদের মাথায় অঙ্কুশ বা ডাঙ্গস দিয়ে মারা হয়। এসব সহ্য করেও হাতী সব ভুলে যায় আর অন্যান্য গৃহপালিত পশুর মতো চুপচাপ কাজ করে যায়।

এসব অত্যাচার যদি মনে রাখতো তাহলে হাতী সহসায় কি প্রতিহিংসা না নিয়ে ছাড়ত ?

সম্প্রতি কলকাতার চিড়িয়াখানায় এক হাতী তার এক বহু পুরাতন মাহুতকে হঠাৎ শুঁড় দিয়ে আছড়ে মেরে ফেলে। কেউ কেউ বলে হাতীটা

পাগল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাগলের কোনো লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যায় নি। তাই অনেকে বলে—মাহুতটি তাকে পেট ভরে খেতে দিতো না। সরকার থেকে প্রচুর খাদ্য বরাদ্দ করা হতো-ঐ হাতীটার জন্য। কিন্তু অর্থলোভে মাহুত বাইরে কিছু কিছু বিক্রি করে দিয়ে সামান্যই হাতীটাকে খেতে দিত। বহু দিন ধরেই হাতী বেচারী আধপেটা খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল। সঙ্গের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং খিদেয় পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে হাতীটা মাহুতকে এই ভাবে চরম শিক্ষা দিয়ে দেয়।

সাধারণ জলকে কিভাবে পানীয় করা হয় ?

প্রথম প্রশ্ন হলো জলকে পানীয় করার দরকার হয় কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো—সাধারণ জলকে আমরা পানীয় হিসেবে পান করতে পারি না কেন? করলে কি অসুবিধা হতে পারে?

বরফ থেকেই আমরা সবচেয়ে বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জল পেয়ে থাকি। দ্বিতীয় উৎস হলো—বৃষ্টির জল। বৃষ্টির জলে গলিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস, ক্লোরাইড, সালফেট, নাইট্রেট এবং অ্যামোনিয়া থাকে। পাহাড়ে নদী ও হ্রদেও জৈব লবণ থাকে। নিম্ন অঞ্চলের নদী ও হ্রদের জল দূষিত হয়। কিন্তু কূয়ো ও ঝরণার জল মাটির ভেতর দিয়ে আসার জন্য শুদ্ধ ও ফিল্টার হয়ে যায়। তবে এতেও জৈব লবণ থাকতে পারে।

সুতরাং পানীয় জল মাত্রেই শুদ্ধ করে নেওয়া উচিত। শুদ্ধ করার প্রণালী নানা রকম হয়। সহজ ও সরল পদ্ধতি হলো—কোনো এক জায়গায় জমা করে রাখা। ময়লাগুলো তলায় থিতিয়ে যায়। থিতোনো প্রথায় অনেক জীবাণু শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তবুও সে জল নিরাপদ নয়। তাই আরো শুদ্ধি করণের জন্য এবং জলের সুস্বাদ, দুর্গন্ধ ও গ্যাসকে দূরীভূত করার জন্য কিছু কিছু রাসায়াণিক দ্রব্যও এতে মেশানো হয়।

বহু বছর আগে থেকেই বালির ভেতর দিয়ে জলকে নিয়ে গিয়ে শুদ্ধ করার প্রথা চলে আসছে। এতে জীবাণুরা অক্কা পায়। আজকাল ক্লোরিন মিশিয়ে জলকে শুদ্ধ করা হয়। এইটাই সবচেয়ে দ্রুত ও কার্যকরী পন্থা। দশ লক্ষ গ্যালন জলে প্রায় এক সের ক্লোরিন মিশোলেই যথেষ্ট। সমস্ত জলটাই জীবাণু মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হয়ে যায়।

স্তন্যপায়ী জন্তু কাদের বলে ?

কুকুর-বেড়াল, বাদুড়-হাতী, ঘোড়া-তিমিমাছ, মানুষ-বাঁদর—এরা সকলেই স্তন্যপায়ী জীব। স্ত্রী-জীবের স্তন থেকে দুধ পান করে বাচ্ছারা মানুষ হয় বলেই এদের স্তন্যপায়ী জীব বলা হয়।

পাখীদের দুবার জন্ম হয়। একবার ডিম হয়। তারপর ডিমকে তা দিয়ে হয় বাচ্ছা। স্তন্যপায়ীদের আর একটি বিশেষত্ব হলো যে—এদের সারা অঙ্গে বা কোনো কোনো জায়গায় চুল বা লোম হয়। এদের রক্ত হয় খুব গরম। এদের দেহে চারটি প্রকোষ্ঠ বা কক্ষ থাকে। এদের মাঝে মাঝে ঝিল্লীর মতো পর্দা থাকে। বেশীর ভাগ স্তন্যপায়ী জীবই হয় স্থলচর। জলচর স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে হলো তিমি মাছ আর ডলফিন নামক শুশুক। ছুঁচো এবং রোডেন্ট নামক দন্তুর মাটির মধ্যে গর্ত করে বাস করে। বাঁদর ও কাঠবিড়ালী গাছে বাস করে। একমাত্র উড়ন্ত স্তন্যপায়ী জীব হলো বাদুড়।

বিজ্ঞানীরা স্তন্যপায়ীদের তিনভাগে ভাগ করেছেন। সবচেয়ে নিম্নস্তরের হলো যারা ডিম পাড়ে। দ্বিতীয় হলো সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী। আর সব শেষ হলো ক্ষুরযুক্ত স্তন্যপায়ী জীব।

মাংসাশী স্তন্যপায়ী জীব মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে। পতঙ্গভুক স্তন্যপায়ী জীব পোকামাকড় খায়।

সর্বোচ স্তন্যপায়ী জীব হলো—যাদের নখ আছে। ক্ষুরের বদলে এদের নখ থাকে। বাঁদর, শিম্পাজী, ওরাং-ওটাং, বনমানুষ, গরিলা এবং সর্বশেষ উৎকৃষ্ট জীব হলো মানুষ।

প্রজাপতি কি খায় ?

প্রজাপতির জীবনের চারটি ভাগ। প্রথম হলো ডিম। দ্বিতীয় শুঁয়ো-পোকা। তৃতীয় গুটিপোকা। এই অবস্থায় সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। চতুর্থ অবস্থা হলো সুন্দর প্রজাপতি।

দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ শুঁয়াপোকা থাকা অবস্থায় যতোটা পারে খেয়ে নেয়। অনেক প্রজাপতি আছে যারা শুধু এই একবারই খেয়ে থাকে অর্থাৎ এই শুঁয়োপোকা থাকা অবস্থায়। খেতে খেতে ফুলে ফেঁপে উঠে। বাইরের চামড়াটা ফেটে গিয়ে নতুন প্রজাপতি বেরিয়ে পড়ে। এই ফাটার কাজ বার

বার হতে পারে। ফলে ডিম্বাবস্থায় যে আকার থাকে, তার চেয়ে অনেকগুণ বড়ো হয়ে যায়।

কিন্তু প্রজাপতি খাবার জন্যই জন্মায়। প্রজাপতির শরীরের তিনটি প্রধান অংশ হলো—মাথা বুক ও পেট। যে সব প্রজাপতি খালি খেয়েই থাকে, তাদের মুখের বদলে একটা পাইপ থাকে। যখন ব্যবহার হয় না, তখন ঘড়ির স্প্রীংয়ের মতো এই পাইপটা পাকানো থাকে। ফুলের মধু চুষে খাবার জন্য এই নলকে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত পাঠিয়ে দিতে পারে।

মথ জাতীয় প্রজাপতিদের পাইপ ৬ থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক একহাত লম্বা হয়। কারুর উপর করাতের মতো পাইপ হয়। ফলটাকে কেটে তার ভেতর থেকে চুষে নেয়।

এই পাইপকে বলা হয় অ্যান্টেনা। এর সাহায্যে এরা তিনটা কাজ করে। (১) অনুভব করে, (২) গন্ধ শোঁকে এবং, (৩) শ্রবণও করে।

পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী স্তন্যপায়ী জীব কী ?

পৃথিবীর যে কোনো জীবের চেয়ে সব চেয়ে দ্রুতগামী হলো মানুষ। কিন্তু পায়ে হেঁটে নয়। অন্য কোনো যন্ত্রের সাহায্যেই মানুষ সবচেয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। অন্য যে কোনও জীব যতো তাড়াতাড়িই চলুক না কেন, মানুষকে হারাতে পারবে না।

মানুষ পায়ে হেঁটে ঘন্টায় ২২ থেকে ২৫ মাইল চলতে পারে। হাতী বা গণ্ডারও ঘন্টায় এক নাগাড়ে ২৫ মাইল যেতে পারে। রেসের ঘোড়া ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ মাইল যায়। শিকারী কুকুর ঘন্টায় ৩৫ মাইল দৌড়তে পারে। অ্যান্টিলোপ আর গ্যাজেল নামক হরিণ ঘন্টায় ৬০ থেকে ৬৫ মাইল দৌড়াতে পারে। এদের সকলকে হারিয়ে প্রথম হতে পারে চিতাবাঘ বা গুলবাঘ। এরা ঘন্টায় ৭০ মাইল বেগে দৌড়াতে পারে। এই গতি বেগে এরা এক মাইল যেতে পারে। তারপর এদের গতি কমে আসে।